অধ্যাপক গোলাম আযম

জীবনে যা দেখলাম

নবম খন্ড

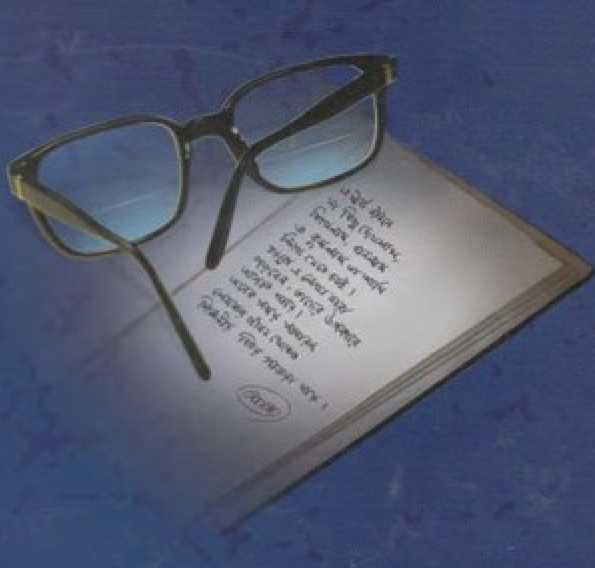

জীবনে যা দেখলাম

নবম খণ্ড

(১৯৯৬-২০০১)

অধ্যাপক গোলাম আযম

জীবনে যা দেখলাম

নবম খণ্ড

(১৯৯৬-২০০১)

(শেষ খণ্ড)

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
www.kamiubprokashon.com

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০১১

জীবনে যা দেখলাম (নবম খণ্ড) ❖ অধ্যাপক গোলাম আযম ❖ প্রকাশক: মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ৫১, ৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা। ফোন ৯৫৬০১২১, ০১৭১১৫২৯২৬৬ ❖ স্বত্ব © লেখক ❖ প্রচ্ছদ: দি ডিজাইনার, বাংলাবাজার ❖ মুদ্রণ: পিএ প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০।

e-mail: info@kamiubprokashon.com, kamiubbd@yahoo.com

বিক্রয়কেন্দ্র

৫১, ৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯০

দৈনিক সংগ্রাম গেইট, মগবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯১

৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড (৩য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯২

কাঁটাবন মসজিদ মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯৩

নির্ধারিত মূল্য : একশত দশ টাকা মাত্র

শুকরিয়া

আত্মজীবনী হিসেবে ৯ খণ্ডে প্রসারিত লেখা সম্পন্ন করার তাওফীক যিনি দিলেন, সে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে সর্বপ্রথম শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

মরহুম জাতীয় অধ্যাপক মনীষী সৈয়দ আলী আহসানসহ অনেক শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রেরণায় আত্মজীবনী লেখার সিদ্ধান্ত নেই। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর আলী আহসান সাহেব যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তাতে এ ব্যাপারে আমার উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই তাঁর প্রতি শুকরিয়া জানানো কর্তব্য মনে করি।

ছাত্রজীবন থেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভাষাবিদ পণ্ডিত প্রফেসর ড. কাজী দীন মুহম্মদ ও এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি আল মাহমুদ তাদের অভিমত প্রকাশ করে আমাকে শুকরিয়া জানাতে বাধ্য করেছেন। এ তিনজনের অমূল্য অভিমত প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে। ২০০১ সালের জানুয়ারি থেকে (কোনো জটিলতা না থাকলে) প্রতি জুমু'আ বারই দৈনিক সংগ্রামে ধারাবাহিকভাবে আমার এ লেখা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক জনাব আবুল আসাদকে এজন্য শুকরিয়া জানাই।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর জনাব মকবুল আহমদ আমার এ লেখা পড়ার জন্য ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

বিভিন্নভাবে আমার এ লেখার পাঠকপ্রিয়তার কথা জানতে পেরে আমার উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। যে পাঠকদের মাধ্যমে তা জানা গেছে তাদের প্রতিও শুকরিয়া জানাই।

আমার লেখার পাঠকদের মধ্যে যারা ফোনে বা চিঠির মাধ্যমে তথ্যগত সংশোধনীতে সাহায্য করেছেন তাদেরকে বিশেষ শুকরিয়া জানাচ্ছি।

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড-এর স্বত্বাধিকারী একান্ত স্নেহভাজন মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন যে যত্ন ও আন্তরিকতার সাথে এ লেখা প্রকাশ করেছেন, তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। শুকরিয়া জানিয়ে তাকে লজ্জা দিতে চাই না। তার জন্য আন্তরিকভাবে দু'আ করি।

সবশেষে, আমার প্রতিটি লেখা প্রকাশককে দেওয়ার পূর্বে তা পড়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনের পরামর্শ দিয়ে এবং পরে অত্যন্ত যত্নের সাথে প্রুফ দেখে আমার একান্ত সচিব অনুজ-প্রতিম নাজমুল হক বিরাট খিদমত করেছেন। তার এ মূল্যবান খিদমতের জন্য অবশ্যই শুকরিয়া পাওয়ার অধিকারী।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ী ভাই-বোনদের নিকট দু'আ চাই, যেন আমার আত্মজীবনীমূলক লেখাটি তাদের জন্য সুখপাঠ্য ও শিক্ষণীয় বিবেচিত হয়।

গোলাম আযম

সেপ্টেম্বর, ২০১০

৯ খণ্ডে সমাপ্ত 'জীবনে যা দেখলাম' গ্রন্থের খণ্ডভিত্তিক বিন্যাস

খণ্ডের নাম	আলোচনার ব্যাপ্তি	কিস্তি সংখ্যা
প্রথম খণ্ড	১৯২২-১৯৫২	১-৪৮
দ্বিতীয় খণ্ড	১৯৫২-১৯৬২	৪৯-৯০
তৃতীয় খণ্ড	১৯৬২-১৯৭২	৯১-১৩০
চতুর্থ খণ্ড	১৯৭২-১৯৭৫	১৩১-১৭৬
পঞ্চম খণ্ড	১৯৭৫-১৯৮৪	১৭৭-২১৮
ষষ্ঠ খণ্ড	১৯৮৪-১৯৯৩	২১৯-২৬০
সপ্তম খণ্ড	১৯৯৩-১৯৯৪	২৬১-৩০০
অষ্টম খণ্ড	১৯৯৪-১৯৯৬	৩০১-৩৩৭
নবম খণ্ড (শেষ খণ্ড)	১৯৯৬-২০০১	৩৩৮-৩৬৪

সূচিপত্র

পাকিস্তানে গণতন্ত্রের বিজয়	১৭
গণতন্ত্রই বাংলাদেশের ভিত্তি	১৭
বাংলাদেশে প্রথম গণতন্ত্র হত্যা	১৮
গণতান্ত্রিক পন্থা রুদ্ধ হয়ে গেল	১৮
জাতীয় সংসদে এমন স্বৈরশাসন কেমন করে অনুমোদন পেল?	১৯
স্বৈরশাসনের অনিবার্য পরিণাম	১৯
মুজিব হত্যাকারীদের অদ্ভুত আন্তরিকতা	২০
মুজিব হত্যার প্রতিক্রিয়া	২১
১৫ আগস্ট কি শোক দিবস?	২২
জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি	২৩
জাতীয় ঐক্যের প্রচেষ্টা	২৫
স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষের ধুয়া	২৬
ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে আওয়ামীকরণ প্রচেষ্টা	২৭
ইসলামি ফাউন্ডেশনে সংস্কার সাধন	২৮
সিরাতুন্নবী পরিভাষা চালু করার ইতিহাস	২৮
কারাগারে চার নেতার হত্যা	৩০
মুজিব হত্যা কি এ জাতীয় অপরাধ?	৩০
বাকশালী শাসনব্যবস্থা	৩১
এ ব্যবস্থা চালু হলে	৩২
'৭৫-এর ১৫ আগস্ট কি শোক দিবস?	৩২
আগস্ট বিপ্লবের সুফল	৩৩
শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হওয়ার পূর্বে মুজিব হত্যার বিচার দাবি কেন করেননি?	৩৩
মুজিব হত্যার বিচারব্যবস্থা	৩৪
হাইকোর্টে আপিল হলো	৩৫
সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে মামলার হাল	৩৫
বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট	৩৬
বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ষোলো বছর	৩৭
গণতন্ত্রে পুনরায় সংকট	৩৭
২০০৭ সালে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন ব্যর্থ হলো কেন?	৩৮

তিনি যথার্থ হিসাবই কষেছেন ৩৯
নির্বাচন বানচালের বাহানা ৩৯
দ্বিতীয় বাহানা ৪০
অন্তহীন দাবি ৪০
শেখ হাসিনার মহাজোট ৪০
কূটনীতিকদের লাফালাফি ৪১
সেক্যুলার বিশ্বের জামায়াতাতঙ্ক ৪২
নির্বাচন বানচালে শেখ হাসিনার কৃতিত্ব ৪৩
এ সরকার গঠনকারী কারা? ৪৩
সেনা কর্মকর্তাদের আন্তরিকতা ৪৪
ফখরুদ্দীন সরকার ও আওয়ামী লীগ ৪৫
শাসনতন্ত্র ও ফখরুদ্দীন সরকার ৪৫
শাসনতন্ত্র সংরক্ষণে উচ্চ আদালতের ভূমিকা ৪৬
হাইকোর্টে পাইকারি হারে জামিন ৪৬
সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে হাইকোর্ট ৪৭
সরকারের রাজনৈতিক পলিসিতে নাটকীয় পরিবর্তন ৪৭
সশস্ত্র বাহিনী জাতীয় ঐক্যের প্রতীক ৪৮
বিএনপি ও আওয়ামী লীগের প্রধান রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ৪৯
সশস্ত্র বাহিনী ঐ ইস্যুতে কোন্ পক্ষ? ৫০
ড. ফখরুদ্দীন সরকারের অযোগ্যতা ও অদক্ষতা ৫১
ড. ফখরুদ্দীন সরকারের চরম ধৃষ্টতা ৫১
গণতন্ত্র শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া ৫২
আসল সমস্যা অন্যত্র ৫৩
সরকার ও নির্বাচন কমিশন ডিসেম্বরে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সক্ষম হবেন কি? ৫৩
ড. ফখরুদ্দীনের রাজনৈতিক অভিভাবকত্ব দাবি ৫৪
গণপ্রতিনিধিত্ব অর্ডিন্যান্স ৫৫
সরকারের সামনে একমাত্র পথ ৫৫
যুদ্ধাপরাধী ইস্যু ৫৫
গরজ বড় বালাই ৫৬
আসল গরজটি কী? ৫৭
যুদ্ধাপরাধীর সংজ্ঞা ৫৮
১৯৭১ সালে যা ঘটেছে ৫৮
ভারতের বিরাট সাফল্য ৫৯

আওয়ামী লীগের হাতে দেশের সার্বভৌমত্ব কি নিরাপদ? ৬০
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষায় ভারতকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে ৬১
ট্রানজিটের জন্য আর বেশিদিন অপেক্ষা করব না ৬১
১৯৭১ ও ২০০৪-এর পরিস্থিতি কি এক ৬২
বাংলাদেশের স্বাধীনতা কাদের হাতে নিরাপদ? ৬৩
জনগণ কি '৭২-এর শাসনতন্ত্র ফিরে পেতে চায়? ৬৪
১৯৭২ সালের শাসনতন্ত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ৬৪
১৯৭৭ সালে শাসনতন্ত্রের পঞ্চম সংশোধনী ৬৫
পঞ্চম সংশোধনীর সুফল ৬৫
ঐসব সাক্ষাৎকারের বিবরণ ৬৬
আওয়ামী লীগ কী করতে চায়? ৬৬
আগামী নির্বাচনে এটা অন্যতম প্রধান নির্বাচনী ইস্যু হতে পারে ৬৭
বর্তমান সরকার ও এর পেছনের শক্তির সমস্যা ৬৭
এর সমাধান কী ৬৮
শাসনতন্ত্রের অভিভাবকের ভূমিকায় সুপ্রিম কোর্ট ৬৯
আদালতের এ ভূমিকা সরকার ও আওয়ামী লীগকে মহাবিপদে ফেলল ৬৯
সরকারের দরকষাকষি ৭০
আওয়ামী লীগ কি আবার নির্বাচন বাচনাল করতে চাইবে? ৭০
শেখ হাসিনা বনাম বেগম জিয়া ৭১
নির্বাচন কি অনিশ্চিত? ৭১
গণতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক ঐক্য ৭২
ঐ দুটো আন্দোলনের সাফল্যের আসল কারণ ৭২
বর্তমান সরকার কি স্বৈরশাসক? ৭৩
এ স্বৈরসরকারের বিরুদ্ধে কেন রাজনৈতিক দলের ঐক্য হচ্ছে না? ৭৩
বর্তমান সংকট থেকে উদ্ধারের উপায় কী? ৭৪
নির্বাচনে পক্ষপাতিত্ব কি সম্ভব? ৭৫
বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির দুর্বলতা ৭৬
জরুরি আইন বহাল রাখার ইস্যু ৭৬
উপজেলা নির্বাচন অনুবিধনে অযৌক্তিক জিদ কেন? ৭৭
রাজনৈতিক দলের রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধন জরুরি কেন? ৭৭
চার্টার অব ন্যাশনাল ইউনিটির ইস্যু ৭৮
সৌদি আরব সফর ৭৯

মক্কা-মদীনায় অবস্থান ৮০
একা কোথাও যেতে পারি না ৮১
আমাদের বংশে সবারই প্রমোশন হয়ে গেল ৮২
সুলাইমানকে লেখা আমার চিঠি ৮৩
চিঠির অনুবাদ ৮৪
একান্ত আপনজনকে হারালাম ৮৪
আমার সাথে সম্পর্ক ৮৫
আমার ছাত্র ভায়রা হয়ে গেল ৮৬
জামায়াত নেতা হিসেবে ৮৭
মানুষ হিসেবে ৮৮
তাঁর জনপ্রিয়তা ৮৮
ঢাকায় জানাযা ৮৮
বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংকটের মূলে ৮৯
এ দেশে ইংরেজ শাসন ৯০
ইংরেজ শাসন কেমন করে এত দীর্ঘায়িত হলো? ৯০
ভারতবর্ষে স্বায়ত্তশাসন ৯১
স্বাধীনতা দাবি ৯১
১৯৪৬ সালের নির্বাচন ৯২
পাকিস্তান আন্দোলনে দু প্রধান নেতা ৯২
বঙ্গদেশে মুসলিম লীগে দুটো উপদল ৯৩
১৯৫৪ সালের নির্বাচন ৯৩
আওয়ামী মুসলিম লীগের আদর্শিক অধঃপতন ৯৪
ইসলামী আদর্শের প্রতি মুসলিম লীগের বিশ্বাসঘাতকতা ৯৫
১৯৭০-এর নির্বাচন ৯৫
বাংলাদেশে ভারতের আধিপত্য ৯৬
স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রশ্ন ৯৬
ফিল্ড মার্শাল মানেক শ'র বস্তুনিষ্ঠ মন্তব্য ৯৭
সরকার আওয়ামী লীগের এজেন্ডাই বাস্তবায়ন করছে ৯৭
আওয়ামী লীগের আদর্শিক অধঃপতনই রাজনৈতিক সংকটের মূল ৯৯
রাজনৈতিক সংকট থেকে মুক্তির উপায় ৯৯
গণতন্ত্র পুনর্বহাল করার একমাত্র উপায় নির্বাচন ১০০
সংকট উত্তরণের একমাত্র পথ ১০০

আওয়ামী লীগের আদর্শিক সংশোধন ১০১
আওয়ামী লীগের আদর্শিক সংশোধন কি সম্ভব? ১০২
বাংলাদেশে আদর্শিক সংঘাত অনিবার্য ১০৩
গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে চলুন ১০৩
অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক দাবি করা বন্ধ করুন ১০৪
যুদ্ধাপরাধী স্লোগান ১০৪
এক ভাইকে হারালাম ১০৫
আওয়ামী লীগের কি দেশগড়ার যোগ্যতা আছে? ১০৭
জনগণকে বিভক্ত করে শাসন করাই তাদের উদ্দেশ্য ১০৯
আওয়ামী লীগের বিভাজন নীতি সর্বমহলে ব্যাপ্ত ১১০
মুক্তির একই পথ ১১০
দেশগড়ার রাজনীতির উদাহরণ ১১১
একজন আদর্শ মুজাহিদের তিরোধা ১১২
পরাশক্তির ইসলামাতঙ্ক ১১৪
পাশ্চাত্য সভ্যতার চিন্তাবিদদের আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়া ১১৪
ইসলামের পুনরুত্থানকে প্রতিরোধ করার মার্কিন পরিকল্পনা ১১৫
পরাশক্তির খপ্পরে বাংলাদেশ ১১৬
পরাশক্তি কাদেরকে দালাল নিযুক্ত করল? ১১৬
প্রবন্ধটির লেখকদের পরিচয় ১১৭
প্রবন্ধটির ভূমিকা ১১৭
বাংলাদেশের ব্যাপারে ইসলামাতঙ্কের কারণ ১১৮
ক্ষমতাসীন হলে আওয়ামী লীগের প্রধান করণীয় ১১৯
পরাশক্তি একমাত্র জামায়াতে ইসলামীকেই আপদ মনে করে ১২০
শেখ হাসিনার শাসনকাল ১২০
দুর্ভাগ্যের পাঁচ বছর ১২১
১. বাংলাদেশকে পৈতৃক সম্পত্তির মতো ব্যবহার করা ১২১
প্রথম কর্মসূচি : জাতির পিতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা ১২২
দ্বিতীয় কর্মসূচি : সব প্রতিষ্ঠানের সাথে নামযুক্ত করা ১২৩
তৃতীয় কর্মসূচি : পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে দেশের সব কিছুতে দখলিস্বত্ব চাই ১২৪
২. গণতন্ত্র হত্যার অপচেষ্টা ১২৬
বাকশালী সংসদ ১২৮
বিচার বিভাগের উপর জঘন্য হামলা ১২৮

সরকারি কর্মকর্তাদের মর্যাদা ১২৯
গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচিত সরকারের সাথে স্থায়ী সরকারের সম্পর্ক ১২৯
রাজনৈতিক দলের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ ১৩০
গড়ার নয়, ধ্বংসের যোগ্যতা ১৩১
ঘনিষ্ঠতম দীনী ভাই চলে গেলেন ১৩১
৩. ইসলামকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র ১৩৩
তাহলে তার হজ্জ ও ওমরাহ কি রাজনৈতিক অভিনয়? ১৩৪
শেখ হাসিনা মাদরাসা ও আলেমসমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলেন কেন? ১৩৫
তথাকথিত মৌলবাদী গালি ১৩৫
ফতোয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ ১৩৬
৪. আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ধ্বংস করা ১৩৬
এক দীনী ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হারালাম ১৩৯
শেখ হাসিনার শাসনামলে রাজনৈতিক বড় ঘটনা ১৪১
ঐক্যপ্রচেষ্টার সূচনা ১৪১
ইসলামী ঐক্যজোটের সাথে যোগাযোগ-প্রচেষ্টা ১৪২
শায়খুল হাদীসের সাথে প্রতীক্ষিত সাক্ষাৎ ১৪২
যুগপৎ আন্দোলনের প্রস্তাব ১৪৩
শায়খুল হাদীসের সাথে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ১৪৪
পরিকল্পনা সফল হলো না ১৪৫
মজলিসে শূরার জরুরি অধিবেশন ১৪৬
অক্টোবরে আবার মজলিসে শূরার জরুরি অধিবেশন ১৪৬
প্রধান আলোচ্য বিষয় ১৪৭
তথাকথিত পার্বত্য শান্তি চুক্তি ১৪৭
এ চুক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ঐক্য ১৪৮
চার দলীয় জোট গঠন ১৪৮
ট্রানজিট ষড়যন্ত্র ১৪৯
চার দলীয় জোটের ঐতিহাসিক ঘোষণা ১৫০
চার দলীয় ঐক্যজোটের ঐতিহাসিক ঘোষণা ১৫০
শেখ হাসিনার শাসনামলে দ্বিতীয় বড় ঘটনা ১৫৫
জাতীয় শরী'আ কাউন্সিল গঠনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৫৫
জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের আহ্বায়ক কমিটি ১৫৬
লিয়াজোঁ কমিটির সদস্যবৃন্দ ১৫৬

নতুন ঐক্যপ্রচেষ্টায় ফুরফুরার পীর সাহেবের অব্যাহত অবদান ১৫৭
জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের ২০০৩ সালের বার্ষিক সম্মেলন ১৫৭
জাতীয় ওলামা-মাশায়েখ সম্মেলন ১৫৯
চেয়ারম্যানের আকস্মিক ইন্তিকাল ১৫৯
নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়ে গেল ১৬০
কেমন নির্বাচন হলো? ১৬১
অবিশ্বাস্য নির্বাচনী ফলাফলের রহস্য ১৬১
রহস্য উদ্ঘাটন ১৬২
ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং ১৬৩
বিরোধী দলের গণতান্ত্রিক আচরণ ১৬৪
শেখ হাসিনা কি অবাস্তব নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারবেন? ১৬৪
২০০৮-এর নির্বাচনে ভৌতিক কারবার ১৬৫
ময়দানে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি সুবিধাজনক অবস্থানে ১৬৬
চারদলীয় জোট চরম সংকটময় অবস্থানে ১৬৮
নির্বাচনী ফলাফলে জামায়াতের অবস্থান ১৭০
নির্বাচনে অনিয়মের বিবরণ ১৭১
এ নির্বাচনে অন্যান্য ইসলামী দলের অবস্থান ১৭২
শেখ হাসিনা কত বছরের জন্য ক্ষমতাসীন হলেন? ১৭৩
পাঁচ বছরের বেশি ক্ষমতায় থাকার পরিকল্পনা ১৭৩
কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির দাবিতে আবারও আন্দোলন হবে? ১৭৩
কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির আবশ্যকতা ১৭৪
কেয়ারটেকার পদ্ধতির বিরুদ্ধে আপত্তি কী? ১৭৪
এ পদ্ধতির মধ্যে কোনো ত্রুটি প্রমাণিত হয়নি ১৭৪
ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সরকার কি কেয়ারটেকার সরকার ছিল? ১৭৫
জাতীয় নির্বাচন ও উপজেলা নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ১৭৫
নবম জাতীয় সংসদে প্রেসিডেন্টের ভাষণ ১৭৬
বিশ্বের সংসদীয় দেশে রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা ১৭৬
রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশের উপযোগী পদ্ধতি ১৭৭
দক্ষিণ এশীয় সন্ত্রাসবিরোধী টাস্কফোর্স ১৭৮
আমীরে জামায়াতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির ইস্যু ১৭৯
আমার অব্যাহতি চিন্তা ১৮০
ব্যালট বিতরণ ও ফলাফল ঘোষণা ১৮০
কর্মপরিষদ বৈঠক ১৮১

মজলিসে শূরার জরুরি অধিবেশন ১৮১
আমীরে জামায়াত নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ ১৮২
মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন ১৮২
দায়িত্ব গ্রহণ উপলক্ষে নবনির্বাচিত আমীরের ভাষণ ১৮৩
বিদায়ী আমীর হিসেবে মজলিসে শূরার অধিবেশনে আমার বক্তব্য ১৮৩
পত্র-পত্রিকায় আমার সাক্ষাৎকার ১৮৪
সাক্ষাৎকারে একটি কমন প্রশ্ন ১৮৪
যে কারণে অব্যাহতি পাওয়া জরুরি ছিল ১৮৫
আরো যা লেখা হয়েছে ১৮৬
তৃতীয় বেহাই সাহেবের ইন্তিকাল ১৮৬
আমার রচনা পরিচিতি ১৮৭
তাফহীমুল কুরআনের আলোকে রচিত ১৮৮
দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির পর
তাফহীমুল কুরআন থেকে বিষয় সংগ্রহ ও পুস্তক রচনা ১৮৯
আরো কতক বই ১৯১
কতক বইয়ের শুধু নাম উল্লেখ করছি ১৯২
দুটো গুরুত্বপূর্ণ বই ১৯৩
মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে রচিত বই ১৯৪
কয়েকটি রাজনৈতিক বই ১৯৫
কতক বড় বই ১৯৫
"যে আশঙ্কায় স্বাধীনতা সংগ্রামে শরীক হতে পারলাম না
দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা-ই সত্যে পরিণত হলো" ১৯৬
স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি ১৯৬
শেখ মুজিবের বিদ্রোহ ১৯৬
স্বাধীনতার স্লোগান ১৯৭
ইয়াহিয়া-মুজিব সংলাপ ১৯৭
সংলাপ ব্যর্থ হয়ে গেল ১৯৭
ভারত সরকারের সাহায্যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল ১৯৭
আমাদের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হলো ১৯৮
বাংলাদেশের স্বার্থের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ নীরব ১৯৯
কারা আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনল? ২০০
ইউরোপ ও আমেরিকার আতঙ্কের দুটো প্রমাণ ২০১
দ্বিতীয় প্রমাণ ২০১

পাঁচ-দফা কর্মসূচি ২০৩
দুর্ভাগা বাংলাদেশ ২০৩
আমাদের আশঙ্কা যদি সত্যে পরিণত না হতো ২০৪
সরকারের হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ২০৫
৩৮ বছর পর্যন্ত কেন বিচার হয়নি? ২০৫
দেশবাসীর নিকট আকুল আবেদন ২০৭
দু বছর বাংলাদেশের কর্তৃত্ব কার হাতে ছিল? ২০৮
দু বছরের স্বৈরশাসন ২০৮
সেনাপ্রধান নিরপেক্ষ ছিলেন না ২০৯
সেনাবাহিনীর অপব্যবহার ২০৯
ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বের আস্থাভাজন সরকার ২১০
আধিপত্যের পথে বাধা ২১০
বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী ২১১
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান হাল ২১২
বিদ্রোহের তদন্ত ২১২
নিরপেক্ষ তদন্ত হয়নি ২১৩
সেনাকর্মকর্তাদের চরম বিক্ষোভ ২১৩
সেনাকুঞ্জে বিক্ষোভ প্রদর্শন ২১৪
বিডিআর পুনর্গঠন ২১৪
শেখ হাসিনার দ্বিতীয় দুঃশাসন ২১৫
কিভাবে ক্ষমতায় এলেন? ২১৫
ক্ষমতাসীন শেখ হাসিনার ভূমিকা ২১৬
আওয়ামী লীগ দেশ গড়ার নয়, ভাঙারই যোগ্য ২১৬
প্রশাসনে মেধা ও যোগ্যতা মূল্যহীন ২১৭
সর্বোচ্চ আদালতে পর্যন্ত দলীয়করণ ২১৮
জাতীয় সংসদ মল্লযুদ্ধের আখড়া ২২০
শেখ হাসিনার দুঃশাসনে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ২২০
'জীবনে যা দেখলাম'-এর সমাপনী বক্তব্য ২২১
আমার লেখা অব্যাহত নেই ২২১
দেশের জন্য শুধু দু'আ করছি ২২২

৩৩৮.

পাকিস্তানে গণতন্ত্রের বিজয়

দক্ষিণ এশিয়ায় একমাত্র ভারত ছাড়া সব কয়টি দেশেই সশস্ত্রবাহিনী বারবার গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে সামরিক স্বৈরশাসন জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। মায়ানমারে (বার্মা) তো একটানাই সামরিকজান্তা ক্ষমতাসীন রয়েছে। পাকিস্তানের ৬০ বছর বয়সে তিন দশকেরও বেশি সময় সামরিক স্বৈরশাসন চলেছে। জেনারেল আইয়ূব খান, ইয়াহিয়া খান, জিয়াউল হক ও পারভেজ মুশাররফ নায়কের ভূমিকা পালন করেছেন।

আইয়ুব খান গণ-আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করলেও পারভেজ মুশাররফের মতো এত লাঞ্ছিত হননি। ইয়াহিয়া খান ১৯৭০-এর নির্বাচনের পর ব্যালটের ফলাফলকে বুলেটের সাহায্যে দাবিয়ে রাখার ষড়যন্ত্রের পরিণামে পাকিস্তানকে বিভক্ত করার অপবাদ নিয়ে অসম্মানজনকভাবেই বিদায় হন। জিয়াউল হক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত না হলে হয়তো ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তোর মতোই দীর্ঘকাল স্বৈরশাসন চালিয়ে যেতেন। পারভেজ মুশাররফকে যেভাবে বিদায় নিতে হয়েছে তাতে আশা করা যায় যে, সে দেশে সেনাবাহিনী অদূর ভবিষ্যতে ক্ষমতা দখলের অপচেষ্টা চালাবে না।

রাজনৈতিক দলগুলো যদি গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সক্ষম হয়, তাহলে আর কোনো সময় হয়তো সামরিক শাসন চেপে বসতে পারবে না। গণতন্ত্রের এ বিজয়কে স্থায়িত্ব দান করা সম্ভব হবে, যদি রাজনৈতিক দলসমূহ অতীত থেকে যথার্থ শিক্ষাগ্রহণ করতে সক্ষম হয়। আর যদি রাজনৈতিক কোন্দল লেগেই থাকে এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জনগণের আস্থা হারান, তাহলে অতীতের মতো আবার সামরিক শাসন আসতে পারে।

গণতন্ত্রই বাংলাদেশের ভিত্তি

১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রী বানানোর উদ্দেশ্যে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে তাঁর দলকে একমাত্র বিজয়ী দলের গৌরব দান করে। নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াও স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দেন যে, শেখ মুজিবই প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। মি. ভুট্টোর সাথে আঁতাত করে ইয়াহিয়া খান ব্যালটের সিদ্ধান্তকে বুলেট দিয়ে দাবিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র না করলে পাকিস্তান থেকে এ দেশকে আলাদা করার প্রয়োজন হতো না।

জনগণের সিদ্ধান্তকে বানচাল করার ষড়যন্ত্র করার ফলেই জনগণকে বাধ্য হয়ে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

১৯৭০-এর নির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিগণই রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করে এ নতুন রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন। শাসনতন্ত্রে বিভিন্ন দিক দিয়ে যত ত্রুটিই থাকুক সরকার-কাঠামো পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিকই ছিল। জাতীয় সংসদে শাসনতন্ত্র সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইতঃপূর্বে তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এভাবে বাংলাদেশের প্রথম সরকার একটি বিশুদ্ধ গণতান্ত্রিক সরকার বলেই গণ্য হতে পারে।

বাংলাদেশে প্রথম গণতন্ত্র হত্যা

বাংলাদেশে প্রথম গণতন্ত্র হত্যাকারী কোনো সামরিক ব্যক্তি নয়। কলঙ্কের কথা হলো, এমন এক ব্যক্তি এ কর্মটি সম্পন্ন করেন, যিনি ক্ষমতাসীন হওয়ার পূর্বে সারা জীবন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছেন, যিনি জননেতা হিসেবে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের আনুগত্য ও হেফাযতের শপথ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

তার মতো জনপ্রিয়তার কিংবদন্তি পুরুষ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের মাত্র দু' বছর পরই যে শাসনতন্ত্রের হেফাযতের শপথ নিলেন সে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রকেই বিকৃত করে একদলীয় বাকশালী শাসন চালু করেন। তিনি কেন তার ভক্ত জনগণের উপর এত অল্প সময়ের মধ্যে আস্থা হারালেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। তাহলে কি বাস্তবে তার জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছিল?

তিনি আক্ষেপ করে তাঁর তৈরি দলীয় বাহিনী সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'সবাই পায় সোনার খনি, আমি পেলাম চোরের খনি।'

তিনি নিঃসন্দেহে একজন যোগ্য সংগঠক ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ নেতৃত্বে যে বিশাল ও শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলেন তা যদি চোরের খনিতে পরিণত হয়ে থাকে তাহলে এর জন্য তিনি ছাড়া আর কেউ তো দায়ী হতে পারে না।

গণতান্ত্রিক পন্থা রুদ্ধ হয়ে গেল

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠা করাই গণতন্ত্রের প্রধান দাবি। বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাই বিশ্বে গণতান্ত্রিক রাজনীতি হিসেবে গণ্য। নির্বাচিত দলীয় সরকার তার মেয়াদকালে জনগণকে সন্তুষ্ট করতে অক্ষম হলে পরবর্তী নির্বাচনে জনগণ অন্য দলকে নির্বাচিত করে। এটাই প্রচলিত গণতান্ত্রিক নীতি।

একদলীয় বাকশালী ব্যবস্থায় নির্বাচন হলে জনগণ বাধ্য হয়ে বাকশালকেই ভোট দেবে। এটাকে নির্বাচন বলা হাস্যকর। বাকশাল যাদেরকে মনোনয়ন দেবে তারাই নির্বাচিত হবে। তাহলে ভোটের কোনো দরকারই নেই। নির্বাচনী প্রহসন করেই মেয়াদ শেষে আবার বাকশালী শাসনই চালু হবে।

বাকশালী ব্যবস্থায় ৪টি দৈনিক পত্রিকা সরকারি মালিকানায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়। আর সব পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সরকারি পত্রিকায় সবসময় সরকারের সব কাজের প্রশংসাই করা হবে। সরকারের সমালোচনা করার জন্য কোনো পত্রিকা না থাকলে জনগণ সরকারি স্বেচ্ছাচারিতা সম্পর্কে কিছুই জানতে পারবে না।

এ জাতীয় ব্যবস্থায় গোটা দেশ কারাগারে পরিণত হবে। জনগণ সরকারের গোলাম হয়ে নীরবে সবকিছু সহ্য করতে বাধ্য হবে। এ থেকে নিস্তার পাওয়ার কোনো গণতান্ত্রিক পথই থাকবে না।

জাতীয় সংসদে এমন স্বৈরশাসন কেমন করে অনুমোদন পেল?

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি শাসনতন্ত্রের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বাকশালী স্বৈরশাসনের পক্ষে নির্বাচিত ৩০০ সংসদ সদস্য কেমন করে সম্মতি দিলেন তা বিশ্বের মহাবিস্ময়। সংগ্রামী আওয়ামী লীগের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ সহ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কেমন করে এমন চরম গণবিরোধী সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন?

জানা যায় যে, ৩০০ এমপি'র মধ্যে মাত্র দু'জন গণতন্ত্র হত্যার প্রতিবাদে সংসদ সদস্য পদ পরিত্যাগ করেন। তাঁরা হলেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এজি ওসমানী ও ব্যারিস্টার মুইনুল হোসেন। তাঁরাও অবশ্য আওয়ামী লীগেরই দলীয় এমপি ছিলেন। তবে এ দুজনই মাত্র গণতন্ত্রে আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী ছিলেন।

বর্তমানে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী ড. কামাল হোসেন এবং ১৯৭৫ সালে কারাগারে নিহত চার জাতীয় নেতাসহ আওয়ামী লীগের সকল এমপি অন্ধভাবে গণতন্ত্র হত্যায় নেতার আনুগত্য করলেন।

উক্ত সংসদের নির্বাচন ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের মধ্যে মাত্র ৭টি আসন দয়া করে দখল করেনি। সে নির্বাচন কতটুকু 'নিরপেক্ষ' ছিল তা কারো অজানা নেই।

আওয়ামী লীগ যদি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হতো তাহলে এভাবে সংসদের আসনগুলো দখল করতে চাইত না এবং বাকশালী এক দলীয় স্বৈরশাসন অনুমোদন করতে সম্মত হতো না। গণতন্ত্রের স্লোগান তাদের রাজনৈতিক কৌশল মাত্র। ক্ষমতাসীন অবস্থায় কোনো কালেই এ দলটি গণতান্ত্রিক আচরণ প্রদর্শন করতে পারেনি।

স্বৈরশাসনের অনিবার্য পরিণাম

একটি গণতান্ত্রিক দেশে যদি এমন স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা হয়, যে শাসন থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অবশিষ্ট থাকে না, তাহলে এর ঐতিহাসিক পরিণাম অনিবার্য হয়ে পড়ে। তখন শক্তি প্রয়োগ করে স্বৈরশাসনের অবসান করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প থাকে না।

বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার বহাল করার জন্য শক্তি প্রয়োগ ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না। জনগণের পক্ষে শক্তি প্রয়োগের কোনো সুযোগ ছিল না। সরকারবিরোধী আন্দোলন করে গণ-অভ্যুত্থানের উপায়ও ছিল না। অসহায় ও নিরুপায় জনগণকে স্বৈরশাসন থেকে মুক্ত করার জন্য সামরিক বিপ্লব ছাড়া আর কোনো পথই খোলা ছিল না।

এমন পরিস্থিতিতে দেশে দেশে সশস্ত্র বাহিনীই সাধারণত এ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন মি. ভুট্টোর স্বৈরশাসন থেকে ১৯৭৭ সালে সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউল হক ক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু সামরিক শাসক নিজেই আবার স্বৈরশাসকে পরিণত হয়।

বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালে যিনি সেনাপ্রধান ছিলেন তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা নীরবে বাকশালী স্বৈরশাসনকে মেনে নেন। কিন্তু ট্যাংক বাহিনীর কয়েকজন জুনিয়র সেনাকর্মকর্তা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। স্বৈরশাসন থেকে জনগণকে মুক্তি দেওয়ার জন্য শেখ মুজিবকে হত্যা করা অপরিহার্য মনে করেন।

এটা অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার যে, গোটা সশস্ত্র বাহিনী ও 'রক্ষী বাহিনী' নামক শেখ মুজিবের গদি-রক্ষাকারী সশস্ত্র বাহিনী থাকা সত্ত্বেও কয়েকজন জুনিয়র সেনাকর্মকর্তা এত বড় দুঃসাহস কেমন করে করলেন? যদি তারা এ প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হতেন তাহলে তাদের সবাইকে কোর্ট মার্শালে জীবন দিতে হতো।

মুজিব সরকারের সামরিক ও বেসামরিক গোয়েন্দা বিভাগ, শেখ মুজিবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ভারত সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এবং মুজিব সরকারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাশিয়ার গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান কেজিবি সদা তৎপর থাকা সত্ত্বেও মুজিব হত্যার মতো এতো বিরাট ঘটনা সত্যিই অলৌকিক ব্যাপার।

মুজিব হত্যাকারীদের অদ্ভুত আন্তরিকতা

মুজিব হত্যার পরিকল্পনাকারী সেনা কর্মকর্তারা লিবিয়ার কর্নেল গাদ্দাফীর মতো সামরিক শাসন কায়েম করেননি। তারা শাসনতন্ত্রকে মুলতবি করেননি এবং জাতীয় সংসদকে বাতিল ঘোষণা করেননি। শেখ মুজিব সরকারের সিনিয়র মন্ত্রী খোন্দকার মুশতাক আহমদকে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত করান। তিন সশস্ত্রবাহিনীর প্রধানগণ নতুন রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করায় জুনিয়র অফিসারদের সশস্ত্র বিপ্লব সফল হয়। দেশ ও জনগণ স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি পায় এবং গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত হয়।

বিপ্লবী জুনিয়র অফিসারগণ যদি ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে এ দুঃসাহস করতেন, তাহলে তারা সামরিক শাসন জারি করে ক্ষমতা দখল করতেন, শাসনতন্ত্র

বাতিল বা মুলতবি করতেন, জাতীয় সংসদ ভেঙে দিতেন এবং সশস্ত্রবাহিনী প্রধানদেরকে অপসারণ করতেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, দেশ ও জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তাঁরা জীবনের এত বড় ঝুঁকি নিয়ে এ অসাধ্য কাজ সমাধা করার হিম্মত দেখিয়েছেন।

মুজিব হত্যার প্রতিক্রিয়া

১৯৭১ ও '৭২ সালে শেখ মুজিবের যে আকাশ ছোঁয়া জনপ্রিয়তা ছিল এবং তিনি জনগণের যে আবেগপূর্ণ ভালোবাসার অধিকারী ছিলেন, যদি এর সামান্য পরিমাণও অবশিষ্ট থাকত তাহলে সপরিবারে এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরূপ প্রতিক্রিয়া কিছুটা হলেও প্রকাশ পেতো। জনগণের সামান্য সাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও বাকশাল নেতৃবৃন্দ অন্তত প্রতিবাদ মিছিল বের করতেন।

জনগণ যদি সত্যিই শেখ মুজিবকে জাতির পিতা হিসেবে শ্রদ্ধা করত তাহলে অবশ্যই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করত।

শেখ মুজিবের গদিরক্ষা বাহিনী (রক্ষীবাহিনী) যদি জনগণের সাড়া পাওয়া যাবে বলে মনে করত তাহলে অবশ্যই হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করত। হত্যাকারী ট্যাংক বাহিনীর চেয়ে অনেক বিরাট রক্ষীবাহিনী বঙ্গভবন দখল করতে চেষ্টা করত এবং হত্যাকারীদেরকে সেখান থেকে অপসারণ করত। তারা অন্তত রেডিও স্টেশন দখল করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারত।

রেডিওতে মেজর ডালিমের কণ্ঠে মুজিব হত্যার সংবাদ জেনে সারা দেশে জনগণের মধ্যে কেমন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল, এর জ্বলন্ত সাক্ষী ১৫ আগস্ট থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকাসমূহ। দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সংবাদ সে সময় প্রধান পত্রিকা ছিল। ঐ পত্রিকা দুটোতে ১৫ আগস্ট থেকে ক্রমাগত যত সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে সঠিক তথ্য জানা যাবে।

বাংলাদেশে বর্তমানে যাদের বয়স ৪৫-এর উর্ধ্বে তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের নিকট যদি দাবি জানানো হয় যে, আপনাদের পরিচালনায়ই জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করুন যে, মুজিব হত্যার প্রতিক্রিয়ায় জনগণ শোক প্রকাশ করেছিল কি না, তাহলে কি তারা এ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন?

আমি তখন লন্ডনে ছিলাম। আমি ইস্ট লন্ডন এলাকায় অবস্থান করতাম যেখানে বাংলাদেশি প্রবাসীরা সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় বসবাস করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তারা দেশের জনগণের চেয়েও বেশি উৎসাহের সাথে সক্রিয় ছিলেন। দেশে তো পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কারণে প্রকাশ্যে তৎপরতা চালানো সহজ ছিল না। লন্ডনে তো পরিবেশ ভিন্ন ছিল। মুজিব হত্যার পর দেশে তো কেউ সামান্য প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি। কিন্তু লন্ডনের পরিবেশে আওয়ামী লীগ সমর্থকরাও কেন

সামান্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারলেন না তা সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার। কেউ ব্যক্তিগতভাবেও শোক প্রকাশ করেছে বলে জানা যায়নি।

লন্ডনের পত্রিকায় ১৫ আগস্টের খবর যে ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল এর বিশুদ্ধ অনুবাদ থেকে জনগণের মধ্যে মুজিব হত্যার প্রতিক্রিয়া জানা যায়। নিম্নে অনুবাদ পেশ করা হলো :

'১৫ আগস্ট। ঢাকায় কারফিউ জারি করা হয়। শুক্রবারের নামাযের সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে দু' ঘণ্টার জন্য কারফিউ তুলে নেওয়া হয়। ঐ সময় সংগঠিত মিছিলের আকারে জনগণকে মসজিদের দিকে যেতে দেখা যায়। তাদের চোখ-মুখ, হাবভাব ও আচরণ দেখে মনে হয় যে, তারা কোনো জাতীয় উৎসব পালন করছে। রাজধানীর প্রধান প্রধান সড়কে একই দৃশ্য দেখা গেল।'

লন্ডনের পত্রিকায় প্রকাশিত এ রিপোর্ট সঠিক কি না এর সাক্ষ্য তারাই দিতে পারেন, যারা তখন ঢাকায় ছিলেন। আওয়ামী লীগের ৪৫ উর্ধ্ব সকলেই এর সাক্ষী। তাদের সাহস থাকলে কেউ বলুন যে এ রিপোর্ট সঠিক নয়।

১৫ আগস্ট কি শোক দিবস?

বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারের উপদেষ্টাগণের মধ্যে একজনও কি লন্ডনের পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট মিথ্যা বলে দাবি করতে পারবেন? তারা তো জাতীয় শোক দিবস পালন করলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যদি গোটা জাতি উল্লাস করে থাকে এবং ঐ দিনটিকে মুক্তি দিবস মনে করে থাকে তাহলে ঐ দিনটিকে জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করা দ্বারা কি জাতিকে অপমান করা হলো না?

মুজিব হত্যাকারীরা যদি ফাঁসির যোগ্য অপরাধ করে থাকেন তাহলে গোটা জাতিকেই অপরাধী সাব্যস্ত করতে হয়। '৭৫ সালে যদি জাতি শেখ মুজিবকে জাতির পিতা হিসেবে শ্রদ্ধা করতো তাহলে জিয়াউর রহমানের জানাযার সময় সশস্ত্রবাহিনীর লোক ও জনগণ যেরকম শোক প্রকাশ করেছে এর চেয়ে অনেক বেশি মুজিব হত্যার কারণে শোকাভিভূত হতো।

সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুর রউফ এ বছর (২০০৮) ১৫ আগস্টে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে দাবি করেন যে, মুজিব হত্যার জন্য যদি ফাঁসি দিতে হয় তাহলে তখনকার সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউল্লাহকেই প্রথমে ফাঁসি দেওয়া উচিত। পত্রিকায় এটুকুই পড়েছি। কোন্ যুক্তিতে তিনি এ দাবি করলেন তা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি।

আমার ধারণা, এ দাবির পেছনে যুক্তি হলো যে, সেনাপ্রধান হিসেবে দেশের প্রেসিডেন্টকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালনে সেনাপ্রধান ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁরই অধীনস্ত

কতক সেনা কর্মকর্তা কেমন করে এ হত্যাকাণ্ড চালানোর পরিকল্পনা করল যে, তা তিনি টেরই পেলেন না। এরপর আরো বড় অপরাধ হলো যে, সেনাপ্রধান হয়ে হত্যাকারীদের অপরাধকে অনুমোদন দিয়ে তাদের মনোনীত রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করলেন।

আওয়ামী লীগের বর্তমান নেতৃবৃন্দ মুজিব হত্যার সময়ও দলীয় নেতৃত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৯৬ সালে তারা ক্ষমতাসীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুজিব হত্যার পর ৩০ বছর পর্যন্ত হত্যাকারীদের বিচারের দাবি জানালেন না কেন? তারা ১৯৭৯ সালে নির্বাচিত ২য় জাতীয় সংসদ, ১৯৮৬ সালে নির্বাচিত তৃতীয় জাতীয় সংসদ এবং ১৯৯১ সালে নির্বাচিত ৫ম জাতীয় সংসদে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করেন। এ দীর্ঘ সময়ে কি তারা ১৫ আগস্টকে শোক দিবস হিসেবে পালন করার দাবিতে সোচ্চার ছিলেন? ১৯৯৬-এর নির্বাচনী প্রচারাভিযানেও তারা এ দাবিকে ইস্যু হিসেবে গ্রহণ করেননি। তাহলে তারা ক্ষমতাসীন হওয়ার পর হঠাৎ এ বিষয়ে কেন এত সিরিয়াস হলেন? ৩০ বছরে নতুন প্রজন্ম যুবকে পরিণত হওয়ার পর তারা এ ইস্যুটি আবিষ্কার করেন।

৩৩৯.

জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি

শেখ হাসিনার দুঃশাসনামলে জাতীয় পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি মারাত্মক কুকর্মটি হলো 'জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি'। কোনো জাতীয় নেতাই এ জাতীয় কুকর্ম করেন না।

মজবুত আইন-শৃঙ্খলা বহাল রেখে জনগণের জান-মাল-ইজ্জতের হেফাজত করা যেমন সরকারের প্রধান দায়িত্ব, তেমনি সমাজে শান্তিময় পরিবেশ কায়েম করে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি নির্মাণ করা সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। শেখ হাসিনা আইন-শৃঙ্খলা ধ্বংস করার সাথে সাথে জাতীয় ঐক্যকেও চরমভাবে বিনষ্ট করেছেন। উৎপাদনের গতি অব্যাহত রাখা এবং সকল দিক দিয়ে দেশকে গড়ে তোলার জন্য জনগণের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরি। দেশ গড়ার কাজে জনগণের সর্বমহলের সহযোগিতা সরকারের বিশেষ প্রয়োজন। জনগণের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি ছাড়া এ প্রয়োজন কিছুতেই পূর্ণ হতে পারে না।

এ কারণেই দেখা যায়, সব দেশে, সব কালেই যেসব জাতীয় নেতা সত্যিকার আন্তরিকতা নিয়ে দেশ গড়ার চেষ্টা করেছেন, তারা ক্ষমতা গ্রহণের পর অতীতের

সকল ভেদাভেদ, বিদ্বেষ, লড়াই ইত্যাদি ভুলে সবাইকে আপন করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে জাতীয় ঐক্যের ডাক দিয়েছেন। নিম্নে এ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো–

১. হিজরী অষ্টম সালের রমযান মাসে রাসূল (স) বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করার পর দীর্ঘ ২১ বছর যারা চরম দুশমনি করেছে তাদেরকেও ক্ষমা করে দিলেন। দুশমনদের প্রধান নেতা আবূ সুফিয়ানও রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান এনে ক্ষমার প্রতিদান দিলেন। জনগণও দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করল। বিরোধীদের শাস্তি দিতে চাইলে তিনি তাতে সক্ষম হতেন। তাদের হৃদয় জয় করে যে মহা সাফল্য অর্জন করলেন তা শাস্তির মাধ্যমে কখনও সম্ভব হতো না। তিনি এমন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন, যা চিরকাল বিজয়ীদেরকে পথ দেখাচ্ছে।

২. ১৯৪০-এর দশকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রাজনৈতিক সংঘাতময় বিরোধের ফলে গোটা উপমহাদেশে জনগণের মধ্যে চরম উত্তেজনা ও বিভেদ সৃষ্টি হলো। '৪৭-এর ১৪ আগস্ট ইংরেজ ও কংগ্রেসের সম্মতির ফলে ১০ কোটি মুসলমানের প্রাণের দাবি স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার পর রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১১ সেপ্টেম্বর হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব অনুভব করে ঐতিহাসিক ঘোষণা দিলেন। তিনি বললেন যে, পাকিস্তানের হিন্দু-মুসলিম ও অন্য সবাই এখন এক জাতিতে পরিণত হয়েছে। আমরা সবাই পাকিস্তানি জাতি।

কংগ্রেস নেতা কামিনী কুমার দত্ত মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার আইনমন্ত্রী হলেন এবং পূর্ব পাকিস্তানে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত অর্থমন্ত্রী হয়ে অতীতের বিভেদ ভুলে গেলেন। বিভক্ত ভারতে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ বন্ধ করার জন্য মিঃ গান্ধী বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের অপরাধে নাথুরাম গডশে নামক এক উগ্র হিন্দুবাদী তাকে হত্যা করে। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু যদি কায়েদে আযমের মতো হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ডাক দিতে সক্ষম হতেন তাহলে মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা এভাবে অব্যাহত থাকত না। ভারতে মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা অবিরাম চলতে থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানে তেমন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি। শেরে বাংলা ফজলুল হক ১৯৪০ সালের পাকিস্তান প্রস্তাবের উত্থাপক হয়েও শেষ পর্যন্ত ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নির্বাচন করলেন। মুসলিম লীগ থেকে ১৯৪৩ সালেই তিনি বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। এ সত্ত্বেও তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে শেরে বাংলা এর চরম বিরোধিতা করা সত্ত্বেও তাঁকে পাকিস্তানের স্থায়ী দুশমন মনে করা হয়নি।

৩. দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের বর্ণবাদী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আদিবাসী কৃষ্ণাঙ্গদের স্বাধিকার আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা ড. নেলসন ম্যান্ডেলা ২৯ বছর শ্বেতাঙ্গদের কারাগারে নির্যাতিত হন। বিরাট জনসমর্থন নিয়ে তিনি আন্দোলনে বিজয়ী হন। শ্বেতাঙ্গ নেতারা বাধ্য হয়ে ড. ম্যান্ডেলার বিজয়কে মেনে নেয়। ড. ম্যান্ডেলা যদি তার প্রিয় দেশকে গড়ে তোলার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ না হয়ে দেশ থেকে শ্বেতাঙ্গদের তাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতেন তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গদের পূর্ণ সমর্থন তিনি পেতেন। যদি তিনি সে পথে যেতেন তাহলে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে পারতেন। তাঁর খাঁটি দেশপ্রেম তাঁকে সে পথে যেতে দেয়নি। দেশ গড়ার মহান উদ্দেশ্যে তিনি শাসনক্ষমতায় শ্বেতাঙ্গদের শরীক করে নোবেল পুরস্কারের গৌরব অর্জন করলেন।

৪. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে পাক বাহিনীর পরাজয়ের ফলে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটল। যাদের মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী বলে ধারণা করা হলো তাদের বিচার করার জন্য নতুন আইন তৈরি করে হাজার হাজার লোককে গ্রেফতার করা হলো। কিছুদিন পর শেখ মুজিব অনুভব করলেন যে, দেশকে গড়ে তোলার জন্য এ আইন সহায়ক হচ্ছে না। তাই তিনি ঐ আইন বাতিল করে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন এবং গ্রেফতারকৃতদেরকে জেল থেকে মুক্ত করে দিলেন। কিন্তু তাঁর ডিক্টেটরি মনোভাবের কারণে এবং তাঁর দলীয় লোকদের অগণতান্ত্রিক ভূমিকার দরুন তিনি জাতীয় ঐক্য নির্মাণ করতে পারেননি।

জাতীয় ঐক্যের প্রচেষ্টা

এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধার ধুয়া তুলে জনগণকে বিভক্ত করার যে চর্চা '৭২ সাল থেকে চলছিল তা দেশ গড়ার পথে বিরাট বাধা ছিল।

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবের বাকশালী শাসনের অবসানের পর প্রেসিডেন্ট খন্দকার মুশতাক আহমদ দেশবাসীর মুসলিম চেতনা জাগ্রত করে পরিস্থিতি শান্ত রাখার চেষ্টা করেন। তাঁর তিন মাসেরও কম সময়ের শাসনকালে জনগণের মধ্যে ঐক্যবোধ গড়ে তোলার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। একটি সফল সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খন্দকার মুশতাক প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে আরেকটি অভ্যুত্থানের ফলে মুশতাক সরকারের পতন হয়; কিন্তু দ্বিতীয় অভ্যুত্থানটি সফল না হওয়ায় এক চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

মুসলিম চেতনায় উদ্বুদ্ধ সৈনিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি না হওয়ায় আল্লাহর রহমতে দেশ গৃহযুদ্ধ থেকে রক্ষা পায়। ৭ নভেম্বর এক অলৌকিক ঘটনার মতো সিপাহী-

জনতার এক অদ্ভুত বিপ্লবের মাধ্যমে জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হন।

তিনি অত্যন্ত সাবধানে ও ধীরগতিতে ক্ষমতায় স্থিতিশীল হওয়ার পর '৭৭ সালে শাসনতন্ত্রের পঞ্চম সংশোধনীর ব্যবস্থা করেন এবং গণভোটের মাধ্যমে তা চূড়ান্ত করেন। '৭৯-র ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধার বিভাজন পরিত্যাগ করে তাঁর দলীয় নীতির ভিত্তিতে দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন দেন; তাঁর মন্ত্রিসভায় উভয় রকমের লোকই অন্তর্ভুক্ত করেন। এমনকি তিনি এমন একজনকে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদীয় দলের নেতা মনোনীত করেন, যিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ইয়াহইয়া সরকারের পক্ষে জাতিসংঘ প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন। তিনি শাহ আজিজুর রহমান। জিয়াউর রহমান দেশ গড়ার ব্যাপারে যেটুকু অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন এর অন্যতম কারণ জাতীয় ঐক্য গঠনে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা।

স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষের ধুয়া

শেখ হাসিনা জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে দেশবাসীকে এ ধারণা দিতে চেষ্টা করেছেন যে, যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তারা স্বাধীনতাবিরোধী।

মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করে তিনি সারা দেশে এ অপপ্রচারে তাদের নিয়োগ করেন। শেখ হাসিনা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী। আর এ দেশের সকল ইসলামী মহল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে চরম কুফরী মতবাদ বলে বিশ্বাস করে। তাই ইসলামপন্থিদের মধ্যে যারা রাজনীতিতে সক্রিয় তাদেরকেও স্বাধীনতাবিরোধী বলে তিনি অপপ্রচার চালাচ্ছেন।

অথচ জনগণ স্বাধীনতার পক্ষে ও বিপক্ষে কারা, সে কথা মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তিতে বিচার-বিবেচনা করে না। ভারতের পৃষ্ঠপোষকতা ও নেতৃত্বে পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধের পর ভারতের আধিপত্যের নিশ্চিত আশঙ্কায় যারা মুক্তিযুদ্ধে শরীক হতে পারেননি তাদেরকে জনগণ স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি বলে মোটেই মনে করে না। ভারত যে আমাদেরকে সত্যিকার স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে ঐ কাজ করেনি, এ কথা শেখ হাসিনার দলেরও অনেকেই উপলব্ধি করেন।

জনগণ ভারতকে বাংলাদেশের বন্ধু মনে করে না। কারণ, এ দেশের উপর হামলা হলে একমাত্র ভারত থেকেই হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ১৯৪৭ থেকে বর্তমান পর্যন্ত এ ভূ-খণ্ডের প্রতি ভারতের আচরণ এ কথাই প্রমাণ করে যে, এ দেশের অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ও সংস্কৃতির উপর আধিপত্য কায়েম রাখতে তারা বদ্ধপরিকর। এ দেশে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' কত ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে এ আধিপত্যকে সম্প্রসারণ করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত তা এ দেশের সামরিক ও বেসামরিক গোয়েন্দা বিভাগের ৭ জন কর্মকর্তার বক্তব্য দৈনিক ইনকিলাবে বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এ কথা কে

না জানে যে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয়দের বিদ্রোহ করার সামগ্রিক ব্যবস্থা ভারতই করেছে। শেখ হাসিনা ভারতের নির্দেশেই পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের তৈরী সন্ত্রাসীদের হাতে তুলে দিয়েছেন। এ সত্ত্বেও শেখ হাসিনা ভারতকে বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু বলে দাবি করতে দ্বিধা করেন না। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারতের সাথে সুসম্পর্ক দেশের সবাই চায়।

বাংলাদেশের সীমান্তে শেখ হাসিনার শাসনামলেই ভারত সবচেয়ে বেশি দুশমনির পরিচয় দিয়েছে। এ অবস্থায় জনগণ কেমন করে ভারতকে বন্ধু বলে মনে করতে পারে? তাই শেখ হাসিনাকেও জনগণ ভারতের বন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি মনে করতে বাধ্য।

জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার বিপরীতে বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা করে শেখ হাসিনা এ দেশের যে সর্বনাশের চেষ্টা করেছেন তা থেকে জনগণকে রক্ষার মহান উদ্দেশ্যেই চারদলীয় ঐক্য গঠিত হয়েছে। শেখ হাসিনার এত বড় ধৃষ্টতা যে, এ জোটকে পর্যন্ত স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি বলতে দ্বিধাবোধ করেন না। তাদের ভারত-বন্ধু এ দেশ আক্রমণ করলে তারা স্বাধীনতার জন্য জীবন দেবে বলে কি জনগণ বিশ্বাস করে? ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের সীমান্ত বাহিনী কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারীর বড়াই বাড়ীর উপর হামলা করলে বিডিআর-এর দেশপ্রেমিক বাহিনী আক্রমণকারীদের বীরবিক্রমে হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়। দেশের সর্বস্তরের জনগণ বিডিআর-এর বীরত্বে গর্ববোধ করেছে। আর শেখ হাসিনা তার বন্ধু দেশের বাহিনীর ১৬ জনকে হত্যা করার অপরাধের! জন্য বাজপেয়ীর কাছে ক্ষমা চেয়ে বাংলাদেশের কপালে কলঙ্ক লেপন করলেন। শেখ হাসিনা ক্ষমতা হারানোর শেষ পর্যায়ে বিডিআরপ্রধানকে রৌমারীর ধৃষ্টতার! শাস্তিস্বরূপ ঐ পদ থেকে অপসারণ করে বন্ধু দেশকে (প্রভু?) সন্তুষ্ট করলেন। তিনি কি তাহলে বলতে চান যে, তিনি এবং তার দল ছাড়া দেশের অন্য সব মানুষ স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি?

ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে আওয়ামীকরণ প্রচেষ্টা

শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালের জুনে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডাইরেক্টর জেনারেল ইসলামী চিন্তাবিদ সৈয়দ আশরাফ আলীকে তাঁর চুক্তির মেয়াদ দু বছর অবশিষ্ট থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ৩১ আগস্ট (১৯৯৬) অপসারণ করা হয়। তাঁর অফিসে শেখ মুজিবের ছবি না থাকার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করলে তিনি কৈফিয়ত দেন যে, ওখানে জামায়াতে নামায আদায় করা হয় বলে ফটো রাখা রাখা যায়নি। এ কৈফিয়ত গ্রহণযোগ্য হয়নি।

আসলে আওয়ামীপন্থি মাওলানা আবদুল আউয়ালকে ঐ পদে নিয়োগ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই একটা অজুহাত আবিষ্কার করা হয়। মাওলানা আবদুল আওয়াল মাওলানা হলেও দেশের আলেম সমাজের ফেরকার নিকটই তিনি আলেম হিসেবে গণ্য নন।

তিনি চিন্তা-চেতনায় আওয়ামীপন্থি বলেই তাকে ঐ পদে বসানো হয়। তিনি ডিজি হওয়ার পর অফিসারদের মধ্যে যাদেরকে তিনি আওয়ামীপন্থি হিসেবে গড়ে তুলতে পারবেন না বলে ধারণা করেছেন তাদেরকে ঢাকার বাইরে বদলি করে দিয়েছেন।

ইসলামি ফাউন্ডেশনে সংস্কার সাধন

সকল ক্ষেত্রেই সংস্কারের উদ্দেশ্য থাকে অগ্রগতি ও উন্নয়ন। মাওলানা আবদুল আওয়াল ইসলামি ফাউন্ডেশনে বিপরীতধর্মী সংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালান। ইসলামি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রতি বছর রবিউল আউয়াল মাসে ১৫ দিনব্যাপী সিরাতুন্নবী সম্মেলনের আয়োজন করা হতো। দীর্ঘদিন থেকে এটা চলে এসেছে। এসব সম্মেলনে দেশের প্রখ্যাত ওলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ রাসূল (স)-এর জীবনী ও শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করতেন। বিপুলসংখ্যক শ্রোতা প্রতিদিন এ সম্মেলনে শরীক হওয়ায় সম্মেলন অত্যন্ত প্রাণবন্ত হতো।

আওয়ামীপন্থি ডিজি সাহেবের 'সিরাতুন্নবী' পরিভাষাটি মোটেই পছন্দ হলো না। সিরাতুন্নবী শব্দটির অর্থ নবী-চরিত। নবী (স) সম্পর্কেই সেসব অনুষ্ঠানে আলোচনা করা হয় সেখানে এ পরিভাষাটিই নিঃসন্দেহে সবচেয়ে উপযোগী। কিন্তু এ চমৎকার পরিভাষাটির মধ্যে তিনি ইসলামী আন্দোলনের গন্ধ খুঁজে পেলেন। তাই তিনি গদিনশীন হওয়ার পরবর্তী রবিউল আউয়ালে সম্মেলনের নাম বদলিয়ে দিলেন। তিনি নাম দিলেন 'মিলাদুন্নবী' সম্মেলন। আলেম হওয়া সত্ত্বেও তিনি সবচেয়ে উপযোগী পরিভাষাটি পরিত্যাগ করে পশ্চাৎমুখী সংস্কার সাধন করলেন।

সিরাতুন্নবী পরিভাষা চালু করার ইতিহাস

১৯৫৮ সালের অক্টোবরে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করার পর সকল রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি কোনো ধর্মীয় মাহফিলও সরকারি অনুমতি ছাড়া করা যেত না। ১৯৫৯ সালের শেষদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে তিন দিনব্যাপী এক বর্ণাঢ্য সিরাতুন্নবী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্বন্ধে আমার লেখা বিস্তারিত বিবরণ 'জীবনে যা দেখলাম' দ্বিতীয় খণ্ডের ২৩৮ পৃষ্ঠা থেকে ২৪০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। এর পটভূমি আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি।

বাংলাদেশে একটি ধর্মীয় প্রথা হিসেবে সকল ব্যাপারেই দোআর অনুষ্ঠান করা হয়। নতুন বাড়ি, দোকান ইত্যাদি উদ্বোধন উপলক্ষে দোআর মাহফিল করা হয়। এমনকি সিনেমা হল উদ্বোধনেও তা করতে দেখা যায়। জন্মদিবস, মৃত্যুদিবস, বিবাহবার্ষিকী ইত্যাদি পালন করার জন্যও দোআর মাহফিলের আয়োজন করা হয়। প্রথা হিসেবে এটা প্রশংসনীয়। কারণ, সব ব্যাপারেই আল্লাহর নিকট ধরনা দেওয়া ঈমানেরই পরিচায়ক।

কিন্তু এ সুন্দর প্রথাটি এমন এক নামে চালু আছে, যা অত্যন্ত অযৌক্তিক। উপরিউক্ত সকল দোআর অনুষ্ঠানের নাম বলা হয় 'মিলাদ'। আরবী মিলাদ শব্দের বাংলা হলো

জন্মদিবস। কারো জন্মদিবস পালন উপলক্ষে 'মিলাদ' শব্দটি ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু মৃত্যু বার্ষিকী পালন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানকেও যখন 'মিলাদ' বলা হয় তখন এটা কতটা হাস্যাস্পদ হয়ে দাঁড়ায় তা লক্ষণীয়।

ছোট বয়স থেকেই দেখে এসেছি যে, মিলাদ মাহফিলে মৌলভী সাহেব আরবীতে গৎবাঁধা কিছু বলে নিজে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সবাই তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে যেত। তিনি 'ইয়া নাবী সালামু আলাইকা' বলতেন এবং তাঁর সাথে সবাই সুরের সাথে উচ্চারণ করতেন। আব্বার কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, আরবী গৎবাঁধা কথাগুলোতে রাসূল (স)-এর আম্মার প্রসব বেদনার সময় হযরত ঈসা (আ)-এর মাতা মারইয়াম ও ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়। এরপর রাসূল (স) জন্মগ্রহণ করেন বলেই মৌলভী সাহেব তাঁর সম্মানে সবাইকে দাঁড়ানোর দাওয়াত দেন।

এ থেকে বোঝা গেল যে, রাসূল (স)-এর জন্মগ্রহণকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যেই এ মিলাদ এ দেশে চালু হয়েছে। আরব দেশে, বিশেষ করে মক্কা-মদীনায় এ প্রথা নেই। গ্রামাঞ্চলে এখনো ঐ ধরনের মিলাদই প্রচলিত আছে। শহরাঞ্চলে আলেমগণ অবশ্য ঐ গৎবাঁধা কথা উচ্চারণ করেন না। তারা রাসূল (স)-এর জীবন থেকে শিক্ষণীয় বিষয় এবং কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে ওয়ায করেন। তবে সকল দোআর অনুষ্ঠানই মিলাদ নামেই সর্বত্র চালু রয়েছে।

১৯৫৯ সালে হাজী বশীরুদ্দীন আহমদ নামে একজন অবাঙালি ব্যবসায়ী (যিনি এখনো ঢাকায় আছেন) বড় আকারে একটি দীনী অনুষ্ঠান করার উদ্যোগ নেন। সরকারি অনুমতি নেওয়া হলো। শিক্ষিত সমাজের উপস্থিতি যাতে সন্তোষজনক হয় সেজন্য কার্জন হলে অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত হয়।

'রাসূল (স)-এর জীবন-চরিত' আলোচনার বিষয় হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়। অনুষ্ঠানটির নাম রাখা হয় 'সিরাতুন্নবী সম্মেলন'। সামজে যখন কোনো বিষয় প্রথা হিসেবে চালু হয়ে যায় তখন এর পরিবর্তনের জন্য সরাসরি বিরোধিতা করা মোটেই সমীচীন নয়। পরিবর্তনের জন্য বিকল্প কিছু চালু করার চেষ্টা করলে ক্রমে পরিবর্তন সম্ভব হয়।

উক্ত সম্মেলনের প্রচারপত্র হিসেবে ঢাকা শহরে বিরাট আকারের পোস্টার লাগানো হয়। বিভিন্ন জেলা শহরেও সিরাতুন্নবী নামে অনুষ্ঠান করা হয়। ফলে এ সুন্দর পরিভাষাটি সমাজে বেশ পরিচিতি লাভ করে। ইসলামি ফাউন্ডেশন দীর্ঘদিন এ নামে প্রতি বছর সম্মেলন করায় পরিভাষাটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

এ প্রেক্ষিতে আওয়ামীপন্থি ডিজি যখন 'মিলাদুন্নবী' নামে সম্মেলনের আয়োজন করেন তখন তাঁর বদ মতলব বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সমাজে প্রচলিত কুপ্রথা নিজস্ব শক্তিতেই বহাল থাকে। আওয়ামী শাসনের পর বিএনপি শাসনামলেও মিলাদুন্নবীই বহাল ছিল। সিরাতুন্নবী পরিভাষা পুনর্বহাল ভবিষ্যতে হবে কি না কে জানে?

৩৪০.

কারাগারে চার নেতার হত্যা

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মুশাররফ ক্ষমতা দখলের দিবাগত রাতে কারা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ঢুকে আওয়ামী লীগের শীর্ষ চার নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করল সে রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়নি। এত বছর পর মামলার রায়ে আদালতে ১৩ জনকে ফাঁসি সহ বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু ২৮.০৮.২০০৮ তারিখে হাই কোর্ট একজন ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামির সাজা বহাল রেখে সকল আসামি খালাস দেয়। এতে ঐ আজব হত্যাকাণ্ডের রহস্য আরো ঘনীভূত হয়।

এত উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতাদের কারাগারে আটক থাকা অবস্থায় কারা কর্তৃপক্ষকে কাবু করে যারা এ হত্যাকাণ্ড ঘটাল তাদেরকে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হওয়া অস্বাভাবিক। বাইরে থেকে কারাগারের লৌহকপাট না ভেঙে যারা ভেতরে ঢুকতে পারল তারা নিশ্চয়ই এমন সরকারি ক্ষমতাশালী হয়ে থাকবে, যাদের নির্দেশ অমান্য করার সাধ্য কারা কর্তৃপক্ষের ছিল না। যদি তা-ই হয়ে থাকে তাহলে কারা কর্তৃপক্ষ থেকে তাদের পরিচয় সংগ্রহ করা অসম্ভব হওয়ার কথা নয়। আর যদি তারা এমন উন্নত মারণাস্ত্রের অধিকারী হওয়ায় কারা কর্তৃপক্ষ প্রতিরোধ করতে অক্ষম হয়ে থাকে তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। তবে তারা যদি সামরিক পোশাক পরিহিত হয়ে থাকে তাহলে তো তাদের ছবি নিয়ে রাখতে পারত।

যা-ই হোক, কারাগারে নেতাদের এ হত্যাকাণ্ড দেশের জন্য সত্যিই কলঙ্কজনক। এর সুবিচার দাবি করা অত্যন্ত সঙ্গত এবং ঘাতকদেরকে চিহ্নিত করতে অক্ষমতা সরকারের চরম ব্যর্থতার পরিচায়ক।

চার নেতা কারাগারে অসহায় অবস্থায় বন্দী। তাদের কোনো অপরাধ থাকলে আদালতে বিচার করা যেত। তাদেরকে বিনা বিচারে এভাবে হত্যা করা জঘন্যতম অপরাধ।

মুজিব হত্যা কি এ জাতীয় অপরাধ?

মুজিব হত্যার আসামিদের শাস্তি কার্যকর করার জন্য আওয়ামী লীগ অব্যাহতভাবে এ সরকারের নিকট সোচ্চার দাবি জানাচ্ছে। যে বিচারপতিগণ এ মামলার বিচারের দায়িত্ব পালনে বিব্রতবোধ করছেন তাদের বিরুদ্ধে অশালীন মন্তব্য করতেও তারা কার্পণ্য করছেন না।

তারাই আবার বিভিন্ন সময় বলেন যে, জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানই এ সরকারের প্রধান দায়িত্ব। অথচ মুজিব হত্যার আসামিদের ফাঁসি কার্যকর করার জন্য

বার বার চাপপ্রয়োগ করে চলেছেন। তারা তো বর্তমান সরকারের সাথে আঁতাত করে ক্ষমতায় যাবার জন্য অধীর অপেক্ষায় আছেন। আঁতাত অনুযায়ী আংশিক স্থানীয় নির্বাচনে 'টেস্ট কেস' হিসেবে অংশগ্রহণ করে বিরাট সাফল্য অর্জনের কারণে জাতীয় সংসদে বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েই আছেন। আর কয়টা মাস ধৈর্য ধরে থাকলে তারাই তো ক্ষমতায় গিয়ে তাদের এ দাবি নিজেরাই পূরণ করতে পারবেন।

যা হোক, আমি প্রশ্ন তুলেছি যে, মুজিব হত্যা কি জেল হত্যার মতোই জঘন্য অপরাধ? এ প্রশ্নের সঠিক জওয়াব উপলব্ধি করতে হলে জানতে হবে যে, শেখ মুজিব শাসনতন্ত্রের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে যে স্বৈরশাসন চালু করার ব্যবস্থা করেছিলেন তা বাস্তবায়িত হলে দেশের হাল কী দাঁড়াত? যদি মুজিব হত্যা না হতো তাহলে জনগণের দশা কী হতো?

বাকশালী শাসনব্যবস্থা

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে বাকশালী শাসনব্যবস্থা সরকারিভাবে চালু করার ঘোষণা দেবার কথা ছিল। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানই সে ঘোষণা দিতেন।

ঐ শাসনব্যবস্থার কাঠামো ছিল নিম্নরূপ :

১. শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হবেন। 'এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'– শ্লোগান চালু হয়।

২. বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (BAKSHAL) একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে শাসনক্ষমতায় থাকবে।

৩. শেখ মুজিব বাকশালের আজীবন সভাপতি থাকবেন।

৪. বাংলাদেশকে ৬১টি প্রদেশে ভাগ করা হবে। প্রত্যেক প্রদেশের শাসক হিসেবে একজন করে গভর্নর থাকবেন।

৫. প্রদেশের প্রশাসন, পুলিশ ও সেনাবাহিনী গভর্নরের কর্তৃত্বাধীন থাকবে। গভর্নর বাকশালের প্রাদেশিক সভাপতির দায়িত্বও পালন করবেন।

৬. গভর্নরগণ একমাত্র রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকবেন। তাদেরকে আর কোথাও জবাবদিহি করতে হবে না।

৭. হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণকে নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতেই থাকবে।

এ শাসনব্যবস্থার ঘোষণা ১৫ আগস্ট (১৯৭৫) হয়ে যাওয়ার পরই গভর্নরগণের দায়িত্ব গ্রহণ করার কথা ছিল। ৬১ জন আওয়ামী লীগ নেতাই গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। পত্রিকায় তাদের তালিকা প্রকাশিতও হয়েছিল।

এ ব্যবস্থা চালু হলে

যদি এ ব্যবস্থা চালু হয়ে যেত তাহলে শেখ মুজিব বিশ্বের সেরা ক্ষমতাশালী একনায়কের সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতেন। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট তাকে জবাবদিহি করার প্রয়োজন হতো না। জাতীয় সংসদের সদস্যগণ তারই মনোনীত ব্যক্তি হতেন। বাকশাল সভাপতি হিসেবে তিনি দলের সকল প্রার্থীকে নমিনেশন দিতেন। আর কোনো রাজনৈতিক দল না থাকায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোনো দরকার থাকত না। জনগণ একমাত্র বাকশাল প্রার্থীদেরকেই ভোট দিতে বাধ্য হতো।

এ শাসনব্যবস্থায় গোটা বাংলাদেশই এক বিশাল কারাগারে পরিণত হতো। জনগণ গভর্নরদের গোলামে পরিণত হতো। প্রতিটি প্রদেশেই গভর্নর রাজার পজিশন ভোগ করতেন। আর শেখ মুজিব মহারাজার গৌরব অর্জন করতেন।

১৯৭২ থেকে '৭৫ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও রক্ষী বাহিনীর যে দাপট ছিল, এর চেয়ে অনেক বেশি হিংস্রতা নিয়ে বাকশালীরা শাসন ও শোষণ চালাতে সক্ষম হতো। জেলের কয়েদিরা যেমন জেলপুলিশের মর্জিমতো চলতে বাধ্য, স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণ তেমনি বাকশালী প্রশাসন ও পুলিশের গোলামে পরিণত হতো।

সরকারি পত্রিকা ছাড়া কোনো পত্রিকা না থাকায় সরকারি দলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো খবরই প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ থাকত না। গভর্নর পর্যন্ত কোনো রকমে অভিযোগ পৌঁছাতে পারলে একমাত্র তার দয়ায় প্রশাসন, পুলিশ ও বাকশালী জুলুম থেকে হয়তো কেউ রক্ষা পাওয়ার আশা করতে পারত।

ঐ সময় জোসেফ স্ট্যালিমের সোভিয়েত-রাশিয়া ছাড়া এ জাতীয় স্বৈরশাসন দুনিয়ার কোথাও ছিল না বলে মনে হয়।

'৭৫-এর ১৫ আগস্ট কি শোক দিবস?

১৫ আগস্ট বাকশালী শাসনব্যবস্থা চালু হয়ে গেলেও দেশ ও জনগণের যে দশা হতো তা থেকে হয়তো আজো মুক্তি পাওয়া সহজে সম্ভব হতো না। ঐ শাসনের যাঁতাকল থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনো উপায়ই ছিল না। জনগণ চরম আতঙ্কের মধ্যে ছিল। তাই বাকশাল চালু হওয়ার আগের রাতে শেখ মুজিবকে হত্যা করার খবর জানার সাথে সাথে গোটা দেশবাসী এত বেশি উল্লসিত হয়ে পড়ে।

কোনো দেশের জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের এভাবে নারী ও শিশু সহ সপরিবারে নিহত হওয়ার ঘটনা গৌরবজনক হতে পারে না। কিন্তু যখন কোনো স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে বিপ্লব সংঘটিত হয় তখন এ জাতীয় নির্মম ঘটনা ইতিহাসে বিরল নয়। বিপ্লবীরা সফল

হওয়ার উদ্দেশ্যে যাদেরকে হত্যা করা প্রয়োজন বোধ করে তাদের হত্যা করা কর্তব্যও মনে করে।

বিপ্লব তখনই সফল হয়, যখন জনগণের ব্যাপক সমর্থন বিপ্লবীদের পক্ষে আছে বলে বোঝা যায়। সফল বিপ্লব তাকেই বলে, যখন কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। বিপ্লব বিফল হলে তো বিপ্লবীদেরকে মৃত্যুদণ্ডই ভোগ করতে হয়। আর বিপ্লব সফল হলে বিপ্লবী সরকারকে সব রাষ্ট্রই স্বীকৃতি দেয়।

বাকশালী শাসন প্রতিষ্ঠা হলে দেশ ও জনগণের যে সর্বনাশ হতো তা থেকে নিস্তার পেয়ে জনগণ যে মুক্তির স্বাদ উপভোগ করেছে তা তো ঐতিহাসিক সত্য। বিপ্লবের পর নতুন সরকারকে যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র বিপ্লবের পূর্বে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি, সেই চীন এবং সৌদি আরবও বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। বিশ্বের ইতিহাসে কোনো নজির নেই যে, বিপ্লব সফল হওয়ার পর বিপ্লবীদেরকে পরে কোনো সরকার অপরাধী হিসেবে গণ্য করে।

আগস্ট বিপ্লবের সুফল

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যে বিপ্লব সংঘটিত হয় তার ফলে :

১. দেশ এক চরম স্থায়ী একনায়কত্ব থেকে মুক্তি পায়।
২. জনগণ একদলীয় স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি লাভ করে।
৩. আওয়ামী লীগসহ সকল রাজনৈতিক দলের পুনরুজ্জীবনের সুযোগ ঘটে।
৪. গণতন্ত্রের পুনর্জন্মের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।
৫. সংবাদপত্র স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করে এবং জনগণ প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

আগস্ট বিপ্লবের ৩৩ বছর পর আজো (২০০৮) জনগণ উপরিউক্ত সুফল ভোগ করছে।

এটা ইতিহাসের এক বিস্ময়কর ঘটনা যে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আজীবন সংগ্রামী নেতা শেখ মুজিবুর রহমান স্বয়ং গণতন্ত্রকে নির্মমভাবে হত্যা করলেন। আর সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনর্বহাল করলেন। আগস্ট বিপ্লব না ঘটলে আজো এ দেশে গণতন্ত্র বহাল করা সম্ভব হতো কি না কে জানে?

শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হওয়ার পূর্বে মুজিব হত্যার বিচার দাবি কেন করেননি?

১৯৯৬ সালের জুনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে নিরঙ্কুশ না হলেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেত্রী হন এবং জাতীয় পার্টির সমর্থনে ক্ষমতাসীন হন।

মুজিব হত্যার বিশ বছর পর উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শেখ হাসিনা নির্বাচনী প্রচারাভিযানের পূর্বে ওমরাহ করতে যান এবং ইহরামের পোশাক পরিহিত অবস্থায়ই

হাতে তাসবীহ্ নিয়ে ঢাকায় বিমান থেকে অবরতণ করেন। এ পোশাক পরে এবং হাতে তাসবীহ নিয়েই তিনি গোটা নির্বাচনী অভিযান চালান।

প্রচারাভিযানকালে তিনি তাসবীহ্ হাতে নিয়ে দু'হাত জোড় করে জনগণের নিকট কাতরভাবে আবদার জানান যে, একটি বারের জন্য পরীক্ষামূলকভাবেই এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন হওয়ার সুযোগদান করুন। তার দলের পূর্বে কৃত ভুল-ক্রটি ক্ষমা করার জন্যও বিনীতভাবে আবেদন জানান।

তার সমগ্র প্রচারাভিযানে একটিবারও তিনি তার পিতার হত্যার বিচার করার সুযোগ দেওয়ার জন্য ভোট প্রার্থনা করেননি। ঐ সময়কার পত্রিকায় এ বিষয়ে তিনি সামান্য ইঙ্গিত দিয়েছেন বলেও কোনো সংবাদ পাওয়া যাবে না। কিন্তু ২৩ জুন প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা লাভের কিছু দিন পরই তার পিতার হত্যার বিচারের জন্য আবেগ প্রকাশ করতে শুরু করেন। নিহত পিতামাতা ও ভাইদের জন্য আবেগ প্রকাশ তো অত্যন্ত স্বাভাবিকই।

তার পিতার হত্যার সময় থেকে প্রায় ৬ বছর তিনি দিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধির আশ্রয়ে ছিলেন। ঐ ৬ বছরের মধ্যে তার দলের নেতারা (আজ যারা মুজিব হত্যাকারীদের ফাঁসি কার্যকর করার ব্যাপারে সাংঘাতিক সোচ্চার) কি ঐ নির্মম হত্যার সামান্য প্রতিবাদও করতে পারতেন না? হত্যার বিচার দাবি করার সাহস না থাকলেও সামান্য বিলাপও কি করা সম্ভব ছিল না?

জনগণের মধ্যে মুজিব হত্যার পক্ষে যে সুস্পষ্ট ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ লক্ষ করেছেন, তাতে এ হত্যার সামান্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করাও যে সম্ভব ছিল না তা সহজেই বোধগম্য।

ঘটনার ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ নেতারা ক্ষমতা লাভ করার পরই এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা সম্ভব বলে উপলব্ধি করলেন। ইতোমধ্যে জনগণের মধ্যে নতুন প্রজন্মের যুবক ও কিশোরদের সংখ্যা বিরাট হয়ে গেল, যারা শেখ মুজিবের কু-শাসন ও বাকশালী কাণ্ডকারখানা সম্পর্কে কিছুই জানে না।

মুজিব হত্যার বিচারব্যবস্থা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার পিতার হত্যাকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবেই গণ্য করে এর বিচারের ব্যবস্থা করেন। যদি এটা বিপ্লবী হত্যা না হয়ে ফৌজদারি হত্যা হয়ে থাকে তাহলে প্রকাশ্য ফৌজদারি আদালতেই এ হত্যার শুনানি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি এ হত্যাকে ফৌজদারি অপরাধ বলে দাবি করলেও তিনি উপলব্ধি করলেন যে, এ মামলার বিরুদ্ধে জনগণ বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের আশঙ্কা রয়েছে। এমন নিরাপদ স্থানে বিশেষ আদালতে নিজের বাছাই করা বিচারকের নেতৃত্বে এ মামলার শুনানি গ্রহণের ব্যবস্থা না করে উপায় নেই। তাই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সুউচ্চ দেয়ালের অভ্যন্তরে বিশেষ আদালতেই শুনানির ব্যবস্থা করেন। উক্ত আদালত মামলার রায়ে ১৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।

হাইকোর্টে আপিল হলো

শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন থাকাকালেই সাজাপ্রাপ্ত আসামিগণ হাইকোর্টে আপিল করেন। বিশেষ আদালতে সাজাপ্রাপ্তদের আপিলের কারণে যে শুনানি হবে, তাতে বিচারপতির দায়িত্ব পালনে কয়েকজন বিচারপতি বিব্রতবোধ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে দায়ের করা মামলায় বিশেষ আদালত যে রায় দিয়েছেন, তা বহাল রাখার দায়িত্ব পালন তো দূরের কথা, মামলার শুনানি গ্রহণ করতেও বিব্রতবোধ করার মতো ধৃষ্টতা প্রদর্শনের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক। এর তীব্র প্রতিক্রিয়াস্বরূপ স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিমের নেতৃত্বে বিব্রতবোধকারী বিচারকদের বিরুদ্ধে লাঠি-মিছিল বের করা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিছিলেই ঘোষণা করেন যে, 'সুবিচার আদায় করতে কোথায় লাঠি মারতে হয় তা আওয়ামী লীগ জানে।' যা হোক, শেষ পর্যন্ত বিশেষ আদালতের রায় সামান্য পরিবর্তন করে বহাল করা হয়।

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে মামলার হাল

দেশের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অনুমোদন অপরিহার্য। এ মামলার বিচারকার্য সমাধা হওয়ার পূর্বেই ২০০১ সালের জুন মাসে শেখ হাসিনার শাসনকালের মেয়াদ শেষ হয়।

চারদলীয় জোট সরকার ২০০১ সালের অক্টোবরে শুরু হয় এবং ২০০৬ সালের অক্টোবরে ঐ সরকারের মেয়াদ শেষ হয়। জোট সরকারের আমলে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে এ মামলার শুনানি হয়নি।

এখনো মামলা আপিল বিভাগেই ঝুলে আছে। ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়া বিলম্বিত হয়ে গেল।

এ মামলার সমাপ্তি কতদিনে হবে তা অনিশ্চিত। আওয়ামী লীগ বর্তমান সরকারের নিকট অব্যাহতভাবে দাবি জানাচ্ছে, যাতে এ সরকারের আমলেই মামলাটি চূড়ান্ত হয়।

দেশবাসী অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সাথে এ মামলার চূড়ান্ত রায় জানার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে। যারা আগস্ট বিপ্লবে উল্লসিত হয়েছিল তারা দু'আ করছে, যেন স্বৈরশাসন থেকে মুক্তিদাতারা মুক্তি পান এবং পূর্বমর্যাদায় জনগণের নিকট ফিরে আসেন।

[**দৃষ্টি আকর্ষণ** : জীবনে যা দেখলাম-এর ৭৫ সালের ধারাবাহিক আলোচনায় মুজিব হত্যা সম্পর্কে লেখা হয়েছিল, তবে বিষয় এক হলেও এখানে নতুন আঙ্গিকে পেশ করা হলো।]

৩৪১.

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট

গণতন্ত্র বাংলাদেশের ভিত্তি হওয়া সত্ত্বেও বারবার দেশটি এ সংকটে পড়েছে। পূর্বে যতবারই সংকট দেখা দিয়েছে, অল্প সময়ের মধ্যেই তা কেটে গেছে। কিন্তু ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি (ওয়ান ইলেভেন নামে খ্যাত) যে সংকট শুরু হয়েছে তা দু বছরেও নিরসন হবে কি না সন্দেহ।

প্রথম সংকট দেখা দেয় ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে যখন বাকশাল কায়েম করা হয়। ঐ বছরই আগস্ট মাসের ১৫ তারিখে তিন সশস্ত্র বাহিনীপ্রধান খন্দকার মুশতাককে প্রেসিডেন্ট হিসেবে মেনে নেওয়ায় সংকট কেটে যাওয়ার সূচনা হয়। ঐ বছরই ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মুশাররফ সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বন্দী করে বঙ্গভবন দখল করায় আবার সংকট সৃষ্টি হয়। কয়েকদিন পরই সিপাহিদের বিদ্রোহ, খালেদ হত্যা, জিয়া মুক্তি ও সিপাহী-জনতার সংহতির মাধ্যমে ৭ নভেম্বর সংকট মোটামুটি কেটে উঠে। ১৯৭৬ সালে বহুদলীয় রাজনীতি শুরু এবং ১৯৭৯ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এভাবেই গণতন্ত্রের নবযাত্রা শুরু হয়।

১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের জিওসি জেনারেল মঞ্জুর প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং তাঁর অনুগত সেনা কর্মকর্তারা চট্টগ্রামের সার্কিট হাউজে প্রেসিডেন্টকে নির্মমভাবে হত্যা করায় গণতন্ত্র আবার বিপন্ন হয় এবং সকল মহলে অস্থিরতা দেখা দেয়। সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদ ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করায় অনিশ্চয়তা কেটে যায় এবং গোটা দেশে স্বস্তি ফিরে আসে।

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদ মাত্র ৪ মাস আগে জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করে সামরিক শাসন জারি করলে গণতন্ত্র মহাসংকটে পড়ে যায়। এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসের ৬ তারিখ গণ-অভ্যুত্থানে বাধ্য হয়ে এরশাদ পদত্যাগ করলে স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে।

সুপ্রিম কোর্টের কর্মরত প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের পরিচালনায় নির্দলীয় অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনর্বহাল হয়।

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ষোলো বছর

১৯৯১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের তিনটি নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় এবং প্রধান দুটো রাজনৈতিক দল পরপর ক্ষমতাসীন হয়। নির্দলীয় অরাজনৈক কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় ঐ তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং দেশি ও বিদেশি পর্যবেক্ষকগণ ঐ কয়টি নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হিসেবে স্বীকার করেছেন।

১৯৮০ সালে জামায়াতে ইসলামীর উদ্ভাবিত এবং ১৯৮৩ সালের ২০ নভেম্বর ঢাকাস্থ বাইতুল মুকাররমের দক্ষিণ চত্বরে জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান কর্তৃক জনসভায় প্রস্তাবিত ও ১৯৮৪ সালের ১০ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট এরশাদের সাথে সংলাপে পেশকৃত কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতিতে নির্বাচন হওয়ায় ঐ কয়টি নির্বাচন গণতন্ত্রকে সংহত করার উপযোগী প্রমাণিত হয়।

১৯৯০ সালে সকল রাজনৈতিক দল কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির ব্যাপারে একমত হওয়ার ফলে দেশে ১৯৯১ সালে প্রথম একটি সফল নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং বিএনপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বিজয়ী হয়ে জামায়াতে ইসলামীর সমর্থনে সরকার গঠন করে। সরকার গঠনে গণতন্ত্রের স্বার্থে সমর্থন দিলেও জামায়াত সরকারে যোগদান না করে সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকাই পালন করে।

১৯৯১ সালের নির্বাচন এরশাদ সরকারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হলে কোনোক্রমেই বিএনপি বিজয়ী হতে পারত না; এরশাদই ক্ষমতায় থাকতেন। নিরপেক্ষ নির্বাচনের ফলেই বিএনপি ক্ষমতাসীন হয়।

গণতন্ত্রে পুনরায় সংকট

কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচনে বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও বিএনপি সরকার কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতিকে আইন হিসেবে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকার করায় ১৯৯০ সালের মতো এ দাবিতে আবার আন্দোলন করতে হয়। '৯০ সালে যেসব দল আন্দোলনে শরীক ছিল, একমাত্র বিএনপি ছাড়া আর সব দল সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিএনপি সরকারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে আন্দোলনে শরীক সকল দল অংশগ্রহণ না করায় নির্বাচন এক প্রহসনে পরিণত হয় এবং একদলীয় একটি সংসদ নির্বাচিত হয়। এ নির্বাচনে বিজয়ী বিএনপি সরকার গঠন করার পর সচিবালয় বিদ্রোহ করে এবং আন্দোলনকারী সকল দল মিলে নবগঠিত সরকারের পদত্যাগ দাবি করে। বিএনপি সরকার সংসদে কেয়ারটেকার সরকার বিল পাস করে সরকার গঠনের ১১ দিন পর পদত্যাগ করে।

১৯৯৬ সালের জুন মাসে কেয়ারটেকার সরকার প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমানের পরিচালনায় যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজয়ী দল হিসেবে জাতীয় পার্টির সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে।

প্রমাণিত হলো যে, কোনো দলীয় সরকারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত নির্বাচন নিরপেক্ষ হয় না। বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক দেশে কেয়ারটেকার পদ্ধতির সরকার না থাকলেও বাংলাদেশে এর প্রয়োজন অবশ্য রয়েছে। ভবিষ্যতে যদি গণতন্ত্র সংহত হয় তাহলে এক সময় হয়তো আর এ পদ্ধতির প্রয়োজন থাকবে না।

১৯৯১ সালের নির্বাচনের পূর্বে প্রতিটি নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলই বিজয়ী হয়েছে। কেয়ারটেকার পদ্ধতিতে যে কয়টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে প্রত্যেকবারই বিরোধী দল বিজয়ী হয়েছে। তাই এ পদ্ধতি বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রয়োজন রয়েছে বলে বৃহৎ দলগুলো মনে করে। কেয়ারটেকার পদ্ধতি কখনো ব্যর্থ হয়নি।

২০০৭ সালে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন ব্যর্থ হলো কেন?

২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হতে ব্যর্থ হয়েছে। এ ব্যর্থতার জন্য কেয়ারটেকার পদ্ধতিকে বিএনপি বা আওয়ামী লীগ দায়ী করেনি। এ প্রধান দু'টো দল এ দাবি করেনি যে, ভবিষ্যতে এ পদ্ধতিতে নির্বাচন চাই না। কারণ, তাদের এ অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, এ পদ্ধতি ছাড়া বিরোধী দলে থাকা অবস্থায় নির্বাচনে সরকারি দলকে পরাজিত করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনসমূহ কেয়ারটেকার পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে পরাজিত হওয়ায় শেখ হাসিনা নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে বলে যে মন্তব্য করেন তা রাজনৈতিক অঙ্গনে সমর্থন পায়নি। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে শেখ হাসিনা বিজয়ী হওয়ায় তিনি কোনো বিরূপ মন্তব্য করেননি। কিন্তু ২০০১ সালের নির্বাচনের দিনে সাংবাদিকদের নিকট নির্বাচন নিরপেক্ষ হয়েছে বলে সন্তোষ প্রকাশ করা সত্ত্বেও নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে স্থূল কারচুপি হয়েছে বলে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। কিন্তু কোথায় কীভাবে কারচুপি হয়েছে তা প্রমাণ করার মতো কোনো তথ্য না পেয়ে তিনি তারই নিযুক্ত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ ও চিফ ইলেকশন কমিশনার এমএ সাঈদ... এবং কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমানের বিরুদ্ধে জঘন্য ভাষায় বিশ্বাসঘাতকতা ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেন।

গণতন্ত্রের প্রতি তার আস্থা না থাকায় নির্বাচনে পরাজয়কে মেনে নেওয়ার মনোবৃত্তি থেকে তিনি বঞ্চিত। এ মনোবৃত্তির কারণেই ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য তিনি জঘন্য হিংস্র রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন।

তিনি হিসাব কষে দেখেছেন, যে কোনো প্রকারেই তিনি বিজয়ী হতে সক্ষম হবেন না। বিজয়ী হওয়ার নিশ্চয়তাবোধ না করে তিনি কেমন করে নিশ্চিত পরাজয়ের জন্য নির্বাচনে অংশ নেবেন?

তিনি যথার্থ হিসাবই কষেছেন

২০০১ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ প্রায় সমানসংখ্যক ভোট পেয়েছে। প্রত্যেক দলই প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪০ ভাগ ভোট পেয়েছে। বিএনপি শতকরা একভাগও বেশি পায়নি। মাত্র .৪৭ (পয়েন্ট ৪৭) ভোট বেশি পেয়েছে। অথচ বিএনপি সংসদের ১৯৩ আসনে বিজয়ী, আর আওয়ামী লীগ মাত্র ৬২ আসনে জয়ী– এমনটা কেমন করে ঘটল?

চার দলীয় জোটে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট, বিএনপি'র সাথে শরীক থাকায় ইসলামপন্থীদের ভোট একটিও আওয়ামী লীগ পায়নি। এসব ভোট একচেটিয়াভাবে বিএনপিই পেয়েছে। এভাবেই ঐ নির্বাচনে ব্যালেন্স অব পাওয়ার এর ভূমিকা পালনের মাধ্যমে ইসলামের পক্ষের ভোটগুলো বিএনপিকে বিজয়ী হতে সাহায্য করেছে। ফলে আওয়ামী লীগ মাত্র ৫ হাজার থেকে ২০ হাজার ভোটের ব্যবধানে কমপক্ষে শতাধিক আসনে পরাজিত হতে বাধ্য হয়েছে।

আওয়ামী লীগ ও আওয়ামীপন্থি মিডিয়ার হাজারো অপপ্রচার ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিএনপিকে জামায়াতে ইসলামী থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়নি। বিএনপি জামায়াতের সাথে জোটবদ্ধ অবস্থায়ই ২০০৭-এ অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়ায় আওয়ামী লীগ ঐ নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য একের পর এক বাহানা আবিষ্কার করেছে এবং শেষ পর্যন্ত সন্ত্রাসী পন্থা অবলম্বন করে নির্বাচন বন্ধ করতে সক্ষম হয়।

নির্বাচন বানচালের বাহানা

শাসনতন্ত্রের কেয়ারটেকার সরকার সম্পর্কিত ধারা [৫৮(৩)] অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কেএম হাসানকেই প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ দিয়ে কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠা করার কথা। শেখ হাসিনা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলেন যে, ১৫ বছর বিচারপতি থাকার পূর্বে আইনজীবী থাকা অবস্থায় তিনি বিএনপি'র সাথে জড়িত ছিলেন। তাই তার পরিচালনায় নির্বাচন নিরপেক্ষ হতে পারে না। বিচারপতি হওয়ার পূর্বে কেউ যে কোনো দলের সদস্য হতে পারে। কিন্তু দীর্ঘদিন বিচারপতি থাকাকালে যে 'জুডিশিয়াল মাইন্ড' তৈরি হয় তাতে দলীয় পক্ষপাতিত্বের মনোভাব না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ যুক্তি শেখ হাসিনা মেনে নিলেন না।

১৯৯৬ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যখন বিচারপতি হাবিবুর রহমানকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়, তখন কিন্তু বিএনপি এ অভিযোগ তুলেনি যে, তিনি

ছাত্রজীবনে বামপন্থি ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ছিলেন এবং আওয়ামী ও বামপন্থি মহলের সুধী হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

দ্বিতীয় বাহানা

সুবিচারক হিসেবে খ্যাত বিচারপতি এমএ আজিজ প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবেই নতুন ভোটার তালিকা তৈরি করার কাজ শুরু করেন। শেখ হাসিনার শাসনামলে ২০০১ সালের নির্বাচনের জন্য যে ভোটার তালিকা তৈরি হয় সে তালিকাকে হালনাগাদ করার দাবিতে শেখ হাসিনা সোচ্চার হন।

প্রত্যেক নির্বাচনের পূর্বেই নতুন ভোটার তালিকা তৈরি করা হয়। কারণ, পাঁচ বছরে বহু ভোটার মারা যায় এবং নতুন বহু লোক ভোটার হওয়ার বয়সে পৌঁছে যায়। সেদিক থেকে নতুন ভোটার তালিকা করায় আপত্তির বিষয় ছিল না। কিন্তু জালভোট প্রয়োগ করায় সিদ্ধহস্ত আওয়ামী লীগ তাদের রচিত তালিকা অনুযায়ী নির্বাচন করা অত্যাবশ্যক মনে করে। ঐ তালিকায় ১ কোটি ভুঁয়া ভোটার রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

সুপ্রিমকোর্ট বার এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগপন্থি এবং সিনিয়র আইনজীবী হিসেবে আদালতে অত্যন্ত প্রভাবশালী। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় হাইকোর্ট থেকে নতুন ভোটার তালিকা না করার নির্দেশ পেয়ে যায়।

এ বিষয়টাকে কেন্দ্র করে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বিচারপতি এমএ আজিজের বিরুদ্ধে আরো কতক অভিযোগ আবিষ্কার করে অত্যন্ত অশালীন ভাষায় তাঁকে পদত্যাগ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। তিনি পদত্যাগ না করলে আওয়ামী লীগ নির্বাচন বর্জন করার ঘোষণা দেয়। আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট স্বয়ং উদ্যোগ নিয়ে বিচারপতি এমএ আজিজকে পদত্যাগ করতে সম্মত করান।

অন্তহীন দাবি

যেহেতু নির্বাচন বানচাল করাই আসল লক্ষ সেহেতু নতুন নতুন দাবি উত্থাপন করা হয়। কয়েকজন উপদেষ্টা আওয়ামী লীগকে তোয়াজ করার জন্য হাসিনার দরবারে বারবার ধরনা দিতে থাকেন। কিন্তু তারা তাদের এক দাবি পূরণের ব্যবস্থা করার পর আবার নতুন দাবি উত্থাপন করতে থাকলেন। ফলে শেখ হাসিনাকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে সম্মত করা যায়নি।

শেখ হাসিনার মহাজোট

শেখ হাসিনা প্রথমে বাম দলগুলোকে নিয়ে ১৪ দলীয় জোট গঠন করে নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়ার উদ্যোগ নিলেন। ১৩টা বাম দল মিলে এমন কোনো শক্তি বলে গণ্য হয় না, যা নির্বাচনে সুফল বয়ে আনতে পারে। তাই চারদলীয় জোটের বাইরে যত

দল আছে সবকে জোটবদ্ধ করে তিনি মহাজোট গঠন করেন। বিশেষ করে এরশাদের জাতীয় পার্টিকে মহাজোটে শামিল করতে পেরে নির্বাচনে বিজয়ের আশায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেন। মহাজোটের সকল দলের মধ্যেই তিনি সংসদের আসন বন্টন করলেন এবং যথাসময় সবাই নমিনেশন পেপার জমা দিলেন। আশার সঞ্চার হলো যে, সকল দল অংশগ্রহণ করায় সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন শেখ হাসিনার দাবিতে বারবার নির্বাচনের তারিখ পুনর্নির্ধারণ করে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দিলেন।

নমিনেশন পেপার প্রত্যাহার করার শেষ দিনের পূর্বে এক মামলায় জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এরশাদের বিরুদ্ধে এমন রায় বের হয়, যার ফলে তিনি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার অযোগ্য হয়ে যান। জাতীয় পার্টি ঘোষণা করে যে, এরশাদ ছাড়া তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। এ পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনা ২০০৭ সালের ৩ জানুয়ারি নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেন। মহাজোটের সকল প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন। ফলে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সংকট সৃষ্টি হয়।

কূটনীতিকদের লাফালাফি

সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী দেশগুলো তো ২০০১ সালের নির্বাচনের পর থেকেই সেক্যুলার শক্তির পরাজয়ে বাংলাদেশে তথাকথিত ইসলামী মৌলবাদের উত্থানের আতঙ্কে ভুগছিল। ২০০৭ সালের নির্বাচনে সেক্যুলার শক্তির বিজয়ের উদ্দেশ্যে ঐসব দেশের কূটনীতিকগণ সর্বাত্মক তৎপরতায় লিপ্ত ছিলেন।

কোনো গণতান্ত্রিক দেশেই রাজনৈতিক বিষয়ে কূটনীতিকরা মতামত প্রকাশ করে না। কোনো সরকারই এর অনুমতি দেয় না। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দই অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদেরকে নাক গলানোর ব্যবস্থা করেছে। তারা 'টিউজডে ক্লাব' নামে রাজনীতি চর্চা করতে লাগলেন। জোট সরকার এ জাতীয় তৎপরতা রোধ করা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রদূতদের দুয়ারে ধরনা দিতেই থাকে। তারা শেখ হাসিনার রাজনীতিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বিচারপতি কেএম হাসানকে দায়িত্ব না নেওয়ার পরামর্শ দেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সাথেও বারবার দেখা করেন।

শেখ হাসিনার মহাজোট নির্বাচন বর্জন করার পর কূটনীতিকগণ নির্বাচন প্রক্রিয়া বন্ধ করার জন্য প্রকাশ্যে ভূমিকা রাখেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত বিউটিনেস ও ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনওয়ার চৌধুরীর নর্তন-কুর্দন দেশবাসী টেলিভিশনে দেখেছে। শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল সরাসরি বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীর উপর চাপ সৃষ্টি করে নির্বাচনের মাত্র ১০ দিন আগে ১১ জানুয়ারি নির্বাচন প্রক্রিয়া বন্ধ করতে সক্ষম হয়।

২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে মাত্র ১৭টি আসনে জামায়াত বিজয়ী হয়। চার দলীয় জোটের চুক্তি অনুযায়ী একসাথে আন্দোলন নির্বাচন ও সরকার গঠনের সিদ্ধান্তের ফলে ৬০ জন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে জামায়াতের মাত্র দুজন মন্ত্রী হয়ে সরকারে যোগদান করে।

২০০৫ সালের ১৬ এপ্রিল 'ইন্টারন্যাশনাল হেরালড্ ট্রিবিউন' নামক প্রভাবশালী পত্রিকায় বাংলাদেশ সম্পর্কে ফিলিপ ব্রাউনিং-এর রচিত রিপোর্টে নিম্নরূপ মন্তব্য করা হয় :

While the main parties are firmly secularist, the Jamaat is using its swing position effectively to acquire more influence in government than its numbers suggest. The Jamaat has not pressed an Islamic agenda too overtly, but its ministers have acquired a reputation for being competent and uncorrupt, which could serve it well if dilusion with the major parties spreads. It is all too easy, however, to over emphasize the dangers of radical Islam here.

অনুবাদ : 'অবশ্য প্রধান দলগুলো মযবুতভাবেই ধর্মনিরপেক্ষ। জামায়াতের সুবিধাজনক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে তাদের সংখ্যার তুলনায় সরকারে অধিকতর প্রভাববলয় সৃষ্টির জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। জামায়াত প্রকাশ্যভাবে কোনো ইসলামী কার্যক্রম চাপানোর চেষ্টা করছে না। কিন্তু তাদের মন্ত্রীগণ সুযোগ্য ও দুর্নীতিমুক্ত হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছে। যদি প্রধান দলগুলো সম্পর্কে জনগণের মোহ কেটে যায় তাহলে এ সুনাম তাদের যথেষ্ট কাজে আসতে পারে। সহজেই জোর দিয়ে বলা যায় যে, এখানে বিপ্লবী ইসলামের প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।'

সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তি এ আতঙ্কে ভুগছে যে, বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী জনসমর্থন অর্জন করতে সক্ষম হতে পারে। তাই এ দেশের সেক্যুলার শক্তিকে প্রকাশ্য পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে, যাতে ইসলামী শক্তি অগ্রসর হতে না পারে।

বিশ্বের সকল ইসলামবিরোধী ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি সর্বতোভাবে এ দেশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। তাই ২০০৭ সালে শেখ হাসিনা যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন তা তারা অত্যন্ত কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে।

৩৪২.

নির্বাচন বানচালে শেখ হাসিনার কৃতিত্ব

২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচালের কৃতিত্ব শেখ হাসিনা তো দাবি করেনই; আমরাও তার এ মহাকৃতিত্ব অকপটে স্বীকার করি। তার নির্বাচনবিরোধী অপতৎপরতা না থাকলে বিদেশি কূটনীতিকরা কোনো বিরূপ ভূমিকা পালন করার সুযোগই পেতেন না। যেমন সেনাপতি মীর জাফর আলী বিশ্বাসঘাতকতা না করলে ইংরেজ ক্লাইভ কিছুতেই বাংলার স্বাধীনতা হরণ করতে সক্ষম হতেন না।

শেখ হাসিনা যে কর্মটি করলেন তা তার পিতার গণতন্ত্র হত্যার চেয়েও মারাত্মক। তার পিতার বেলায় গণতন্ত্র হত্যায় বিদেশি শক্তির সরাসরি হাত ছিল না। কিন্তু তিনি যা করলেন তাতে বাংলাদেশে বিদেশি শক্তি সকল ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করার ধৃষ্টতা দেখাতে সক্ষম হচ্ছে।

নির্বাচন বানচালের পর যে সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছে তাদেরকে তিনি মনোনয়ন না দিলেও তাদেরকে তার আন্দোলনের ফসল হিসেবে উল্লাস প্রকাশ করে তাদের সকল কর্মকে বৈধতা দেওয়ার ঘোষণা দিলেন।

ক্লাইভ বিজয়ী হওয়ার জন্য মীর জাফরের সহযোগিতা পেলেও তিনি মীর জাফরকে বিশ্বাস করেননি। তেমনি এ সরকার তার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে বিরূপ আচরণ করতে দ্বিধা করেনি। কারণ এ সরকার নিজস্ব এজেন্ডা বাস্তবায়নের দায়িত্বই পালন করছেন।

এ সরকার গঠনকারী কারা?

সারা দুনিয়া জানে যে, জরুরি অবস্থা জারি করে নির্বাচন প্রক্রিয়া বন্ধ করার জন্য জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল বানকি মুন বাংলাদেশ সেনাপ্রধানকে হুমকি দেন যে, যদি সেনাবাহিনী নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে ভূমিকা পালন করেন তাহলে বিশ্বে জাতিসংঘ শান্তিবাহিনীর দায়িত্ব থেকে বাংলাদেশকে বঞ্চিত করা হবে।

সেনাবাহিনী প্রধানের পক্ষে এত বড় হুমকিকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। জাতিসংঘের শান্তিবাহিনীর দায়িত্ব পালন করে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী দেশের জন্য বিরাট সুনাম অর্জন করেছে। যারা শান্তিবাহিনীর সদস্য হন তারা আর্থিক দিক দিয়ে এত বেশি উপকৃত হন যে, এ সুযোগ বিনষ্ট করলে গোটা সশস্ত্র বাহিনী বিক্ষুব্ধ হওয়ারই কথা।

তাই বাধ্য হয়ে আমাদের সেনাবাহিনীর প্রধান দায়িত্বশীলগণ প্রেসিডেন্ট ড. ইয়াজুদ্দীন আহম্মেদকে জরুরি অবস্থা জারি ও নির্বাচন প্রক্রিয়া বাতিল করতে বাধ্য করেন।

আমার ধারণা যে, বর্তমান সরকারের প্রধান উপদেষ্টাগণ ও অন্যান্য উপদেষ্টাগণ, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারগণ, দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে তারাই বাছাই করেছেন, যারা জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার জন্য প্রেসিডেন্টকে বাধ্য করেছেন। প্রেসিডেন্ট নিশ্চয়ই নিজের উদ্যোগে নির্বাচন বন্ধ করেননি। জোট সরকারের নিযুক্ত প্রেসিডেন্টের পক্ষে এমন বিপ্লবী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা স্বাভাবিক নয়। ড. ইয়াজুদ্দীন আহম্মেদ প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং অত্যন্ত নম্র ও ভদ্র মানুষ। রাষ্ট্র পরিচালনার সামান্য অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল না। তাই প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি যত বিষয়ে স্বাক্ষর করেন এর সিদ্ধান্ত তারাই গ্রহণ করেন, যাদের হাতে আসল ক্ষমতা।

এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, উপদেষ্টা পরিষদ, দুর্নীতি দমন কমিশন ও নির্বাচন কমিশন যাদেরকে নিয়ে গঠিত হয়েছে, তাদেরকে যারা বাছাই করেছেন, তারা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত নন, এমনকি নির্বাচিত কোনো সংস্থার প্রতিনিধিও নন। হঠাৎ করে যারা ক্ষমতাসীন হয়েছেন তারাই এসব ব্যক্তিকে বাছাই করে প্রেসিডেন্টকে নিয়োগ দিতে পরামর্শ বা বাধ্য করেছেন।

সেনা কর্মকর্তাদের আন্তরিকতা

জাতিসংঘের চাপে সেনা কর্মকর্তাগণ জরুরি অবস্থা জারি করে নির্বাচন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিলেও তারা সামরিক শাসন জারি করেননি এবং সরকারি ক্ষমতা সরাসরি দখল করেননি। সামরিক আইন চালু করলে সংবিধান মুলতবী করতে হতো এবং রাজনীতি চর্চা নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন হতো।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সহিংস তাণ্ডব সৃষ্টি করে, বিশেষ করে গণবিরোধী অবরোধের মাধ্যমে গোটা দেশকে অচল করে জনগণকে জিম্মি করে ফেলেছিল। এর মুকাবিলা করা ঐ সময়কার দুর্বল সরকারের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব ছিল না। বাংলাদেশের ইতিহাসে ঐ সরকার সর্বদিক দিয়ে দুর্বলতম ছিল। সরকার সম্পূর্ণ সেনানির্ভর হয়ে পড়ে। সেনা কর্মকর্তাগণ যদি ক্ষমতা দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন তাহলে জনগণ তখনকার মতো খুশিই হতো। কিন্তু সামরিক শাসন বেশিদিন পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্ষম হতো কি না সন্দেহ।

সরাসরি ক্ষমতা হাতে না নিয়ে সশস্ত্র বাহিনী পরম আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছে। জেনারেল এরশাদ ও পারভেজ মুশাররফের পরিণতি থেকে তারা রক্ষা পেয়েছেন।

ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সরকার কতটুকু সেনাসমর্থিত আর কতটুকু সেনা পরিচালিত তা নিশ্চিতভাবে জানার উপায় নেই। তবে এ কথা জোর দিয়েই বলা যায় যে, সশস্ত্র বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতাই এ সরকারের একমাত্র ভিত্তি।

ফখরুদ্দীন সরকার ও আওয়ামী লীগ

বর্তমান সরকার যে শেখ হাসিনার আন্দোলনের ফসল সে কথা তো তিনি গর্বের সাথেই দাবি করেছেন। এ সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে তারই নেতৃত্বে মহাজোটের নেতৃবৃন্দের উল্লাস তো দেশবাসী সবাই দেখেছেন। আর এ সরকারের আদর্শ যে আওয়ামী লীগের আদর্শ, তা শুরু থেকেই সরকারি কার্যক্রম থেকে স্পষ্টই বোঝা গেছে।

গত ১১ জুন (২০০৮) সরকারি নির্দেশে যেভাবে শেখ হাসিনা প্যারোলের নামে আসলে মুক্তিই পেয়ে গেলেন এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কারাগার থেকে নিজের বাড়িতে পৌঁছলেন এবং সরকারি প্রটোকলেই বিদেশে গেলেন এবং বিদেশেও রাষ্ট্রীয় প্রটোকল ভোগ করছেন, তাতে সরকারের সাথে শেখ হাসিনার আঁতাত সম্পর্কে কোনো অস্পষ্টতা রইল না। চার দলীয় জোটকে নির্বাচন বর্জন করতে বাধ্য করে ৪টি সিটি কর্পোরেশন ও ৮টি পৌরসভা নির্বাচন আওয়ামী লীগকে একচেটিয়া বিজয়ী হওয়ার সুযোগ দিয়ে সরকার আঁতাতের ব্যাপারে বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতার পরিচয়ই দিলেন। আগামী সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যে ক্ষমতায় যাচ্ছে বলে নিশ্চিতবোধ করেছে তা বোঝা গেল। আওয়ামী লীগ সরকারকে নির্দেশ দিল যে, প্রত্যেক বিষয়ে তাদের সাথে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। শেখ হাসিনাকে বিদেশে রেখেই আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে গেল। তারা ক্ষমতায় গিয়ে শেখ হাসিনাকে পূর্ণরূপে মুক্তি দিয়ে দেশে ফিরিয়ে আনার আশ্বাস পেয়েই হয়তো তিনি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের অপেক্ষা করছিলেন। তিনি কর্পোরেশন ও পৌরসভার বিজয়ে উল্লাসিত হয়ে এ বিজয়ের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য তার দলকে উদ্বুদ্ধ করলেন।

শাসনতন্ত্র ও ফখরুদ্দীন সরকার

সরকারের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতার উৎস হলো দেশের শাসনতন্ত্র। এ শাসনতন্ত্রের ৫৮ ধারা অনুযায়ী এ সরকারের মেয়াদ মাত্র ৯০ দিন এবং এর একমাত্র দায়িত্ব হলো জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

ফটোসহ ভোটার তালিকা ও আইডি কার্ড (জাতীয় পরিচয়পত্র) তৈরি করতে সেনাপ্রধানের বক্তব্য অনুযায়ী আট মাস লেগেছে। ২০০৮ সালের অক্টোবরে এ কাজ সমাধা হওয়ার কথা।

এ সরকারের আমলে এ কাজটিই একমাত্র বিরাট ও স্থায়ী সার্বিক জাতীয় কল্যাণকর বলে স্বীকৃত। কিন্তু এর কৃতিত্ব শতকরা একশত ভাগ সেনাবাহিনীর প্রাপ্য। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি এ সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ১৩/১৪ মাস বিলম্বে এ কাজটি শুরু হলো কেন? এ বিলম্বের জন্য কি এ সরকার ও নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ

দায়ী নন? ভোটার তালিকা ও আইডি কার্ডের জন্য ব্যয়িত সময় ছাড়া অন্যান্য যেসব কাজে এ সরকার ও নির্বাচন কমিশন মূল্যবান সময় অপচয় করেছেন এর কোনোটার ইখতিয়ারই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী বৈধ নয়। সরকার কর্তৃক শাসনতন্ত্র লঙ্ঘিত হচ্ছে কি না তা বিচার করার দায়িত্ব হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের।

শাসনতন্ত্র সংরক্ষণে উচ্চ আদালতের ভূমিকা

জাতীয় সংসদেরই আইন রচনার ইখতিয়ার সংসদের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালে সরকার বিশেষ প্রয়োজনে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অর্ডিন্যান্স জারি করে আইন রচনা করতে পারে। কিন্তু এ অর্ডিনান্স পরবর্তী সংসদ অধিবেশনে বৈধ বলে গৃহীত না হলে বাতিল হয়ে যেতে পারে।

বর্তমান সরকারের আমলে জাতীয় সংসদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ২০ মাসে প্রায় ৯০টি অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়েছে। একটি নির্বাচিত সরকার দেশ শাসনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন রচনা করে থাকে। ড. ফখরুদ্দীন সরকারের নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ছাড়া অন্য কোনো আইন রচনার কোনো ইখতিয়ার না থাকা সত্ত্বেও দাপটের সাথে দেশ শাসনের অপচেষ্টা করতে গিয়ে এত অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়েছে।

এসবের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে বিচার প্রার্থনা না করা পর্যন্ত ক্ষমতার অপব্যবহার চলতে থাকে। শাসনতন্ত্র অনুয়াযী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান না করায় শাসনতন্ত্র লঙ্ঘিত হয়েছে কি না এ বিষয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হলে হাইকোর্ট ২০০৮ সালের ২২ মে তারিখে সুস্পষ্ট ভাষায় রায় দেন যে, নির্বাচন কমিশন শাসনতন্ত্র লঙ্ঘন করেছে।

অর্ডিন্যান্সের পর অর্ডিন্যান্স জারি করে স্বৈরশাসকের মতো সরকার ও নির্বাচন কমিশনের যোগসাজশের মাধ্যমে দেশবাসীর উপর কর্তৃত্ব করার উদ্দেশ্যে তাদের যাবতীয় খামখেয়ালি চাপানো হতে থাকে। একটি অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলে হাইকোর্ট ২০০৮ সালে ১৩ জুলাই তারিখে রায় দেন যে, শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া এ ধরনের কোনো অর্ডিন্যান্স জারি করার কোনো ইখতিয়ার এ সরকারের নেই।

হাইকোর্টে পাইকারি হারে জামিন

২০০৮ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতারকৃত রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীগণ বিরাট সংখ্যায় জামিনে মুক্তি পান। কোর্ট লক্ষ্য করেছে যে, এক বছরেরও বেশি সময় এসব সম্মানিত ব্যক্তি বিনা বিচারে কারাযন্ত্রণা ভোগ করছেন। সরকার তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করে আদালতে দোষী সাব্যস্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। এসব লোককে জেলের বাইরে রেখেও বিচারকার্য পরিচালনা করা সম্ভব। জামিন পেলে তারা পালিয়ে বিদেশে চলে যাওয়ার মতো আশঙ্কা নেই। বেগম জিয়ার

মতো ব্যক্তিকেও সরকার এক বছরের বেশি সময় কারাগারে আটক রেখেছে। সরকার তাকে বিদেশে পাঠাতে চেষ্টা করেছে। তিনি কিছুতেই চিকিৎসার জন্যও বিদেশে যেতে সম্মত হননি। এমন ব্যক্তিকেও বিনাবিচারে জেলে আটক রাখার কোনো অধিকার সরকারের নেই।

সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে হাইকোর্ট

মহামান্য হাইকোর্ট শাসনতন্ত্রের সংরক্ষণ ও নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বহাল রাখার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বর্তমান সরকারের অবৈধ অর্ডিন্যান্স জারি ও বিনাবিচারে গণ্যমান্য ব্যক্তিকে বে-আইনিভাবে আটক রাখা থেকে সরকারকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে উপরিউক্ত মামলার রায় ও জামিনের ব্যবস্থা করেন।

এতে সরকারের টনক নড়েছে বলে মনে হয়। শাসনতন্ত্রের অভিভাবক হিসেবে উচ্চ আদালত 'হবুচন্দ্র রাজা ও গবুচন্দ্র মন্ত্রীদের' মতো স্বেচ্ছাচার চালিয়ে যেতে দেবে না বলে সরকার উপলব্ধি করেছে বলে মনে হয়।

সরকারের রাজনৈতিক পলিসিতে নাটকীয় পরিবর্তন

সেপ্টেম্বর (২০০৮) মাসের শুরু থেকে হঠাৎ সরকারের রাজনৈতিক পলিসিতে নাটকীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। এতদিন মনে হচ্ছিল যে, সরকার চার দলীয় জোটকে নির্বাচনের বাইরে রেখে আওয়ামী জোটকে খালি মাঠে গোল করার সুযোগ করে দেবে। আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে কে প্রধানমন্ত্রী হবেন সে বিষয়েও চর্চা শুরু হয়ে গেল।

হঠাৎ করে সরকার উপলব্ধি করলেন যে, সকল বৃহৎ দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলে জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। এ সরকার বিএনপিকে ভেঙে চার দলীয় জোটকে নির্বাচন বর্জন করতে বাধ্য করার পরিকল্পনা করেছিল। ইলেকশন কমিশন এ প্রচেষ্টায় প্রকাশ্যভাবে জঘন্য ভূমিকা পালন করে। সেদিন হঠাৎ করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিএনপি'র বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা (দুঃখ প্রকাশ) করেন এবং নির্বাচনে বিএনপি'র অংশগ্রহণ অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেন।

হাইকোর্টের সংবিধান রক্ষার উপরিউক্ত বিরাট ভূমিকা সরকারের রাজনৈতিক পলিসিতে নাটকীয় পরিবর্তন ও বলিষ্ঠ অবদান রেখেছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ নাটকীয় পরিবর্তনে সেনাবাহিনীরও প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। এ সরকারের গত ২০ মাসের ভূমিকা, বিশেষ করে প্রধান নির্বাচন কমিশনের আওয়ামী লীগ ভক্তি (যা আওয়ামী লীগের সাথে প্রথম সংলাপে দেশবাসী লক্ষ্য করেছে) এবং উভয়ের এ পর্যন্তকার ভূমিকার পর এমন নাটকীয় পরিবর্তন সত্যিই বিস্ময়কর।

সশস্ত্র বাহিনী জাতীয় ঐক্যের প্রতীক

দেশে যে প্রচণ্ড রাজনৈতিক বিভাজন রয়েছে, তা দেশবাসীর মধ্যে দুটো সুস্পষ্ট পক্ষ সৃষ্টি করেছে। এক পক্ষ বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী, বিদেশি হস্তক্ষেপ ও আধিপত্যের বিরোধী এবং ইসলামী জীবনাদর্শের সমর্থক। আরেক পক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ (ইসলামবিরোধী) ও আধিপত্যবাদের সমর্থক।

২০০১ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রায় সমানসংখ্যক ভোট পেয়েছে। ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ ভোটারদের সমর্থন বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদীদের প্রথম পক্ষ জাতীয় সংসদে দু-তৃতীয়াংশের অধিক আসন লাভ করে। বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে এ রাজনৈতিক বিভক্তি সুস্পষ্ট।

কিন্তু বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে কোনো বিভক্তি নেই। তারা গোটা দেশবাসীর অত্যন্ত আস্থাভাজন বন্ধু। দেশরক্ষার দায়িত্ব পালনের কারণে জনগণ তাদেরকে স্বাধীনতার প্রতীক মনে করে। যে কোনো দুর্যোগে যখন তারা দুর্গত জনগণের খিদমতে আত্মনিয়োগ করে তখন কোনো রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব করেন না। তারা সকল পক্ষের বন্ধু ও সকলের আস্থাভাজন।

শেখ হাসিনার প্রতি গত জুন মাস থেকে সরকারের পক্ষপাতিত্ব ও রাজনৈতিক আঁতাত এবং বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব এতটা নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, দেশবাসীর মনে বিরাট প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে– সেনাবাহিনী এ সরকারকে কেমন করে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে? সেনাবাহিনী তো কোনো একটি রাজনৈতিক পক্ষের সমর্থক হতে পারে না। তারা সমগ্র দেশ ও দেশের জনগণের; কোনো একটি রাজনৈতিক পক্ষের নয়।

সেনাবাহিনীর সরাসরি উদ্যোগে যে ভোটার তালিকা তৈরি হয়েছে এর প্রতি সকল রাজনৈতিক পক্ষের পূর্ণ আস্থা থাকায় কোনো পক্ষ থেকেই এ বিষয়ে সামান্য আপত্তিও উত্থাপিত হয়নি। নির্বাচন কমিশন বিদেশি কোনো সংস্থাকে দিয়ে ভোটার তালিকা তৈরির ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল; কিন্তু সেনাবাহিনী তা হতে দেয়নি।

২০০১ সালের নির্বাচনের জন্য শেখ হাসিনার শাসনামলে যে ভোটার তালিকা তৈরি হয়, এর প্রতি সকলের আস্থা না থাকায়ই ২০০৭ সালের নির্বাচনের জন্য নতুন ভোটার তালিকা তৈরি করার প্রচেষ্টা চলে।

দল নিরপেক্ষ ও রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সশস্ত্র বাহিনীর সমর্থনেই ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সরকার টিকে আছে। এ সরকারের পেছনে দেশের অভ্যন্তরে আওয়ামীপন্থি ছাড়া আর কোনো শক্তি আছে বলে মনে হয় না। সরকার যদি নিরপেক্ষ ভূমিকা নিষ্ঠার সাথে পালন করে তাহলে সকল রাজনৈতিক শক্তিই সরকারকে সমর্থন করবে। কারণ দেশতো সরকারবিহীন থাকতে পারে না। আগামী নির্বাচন পর্যন্ত এ সরকারকে সকলেরই সমর্থন করা প্রয়োজন।

আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন না হলে দেশ চরম সংকটে পড়বে। এ সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে দিয়েই নির্বাচন করিয়ে নির্বাচিত সরকার কায়েম করতে হবে। সরকার একমুখী না থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে সংসদ নির্বাচনে আত্মনিয়োগ করলে সকল মহলেরই সহযোগিতা পাবেন। তবে বিজয়ের নিশ্চয়তা না পেলে শেখ হাসিনা আবারও নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করতে পারেন। শিগগিরই বোঝা যাবে যে, নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন হবে কি না।

৩৪৩.

বিএনপি ও আওয়ামী লীগের প্রধান রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব

বিএনপি ও আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল। তাদের মধ্যে অনেক ইস্যুতেই মতপার্থক্য ও দ্বন্দ্ব রয়েছে। তবে প্রধান দ্বন্দ্ব হলো জিয়াউর রহমান ও শেখ মুজিবকে কেন্দ্র করে :

১. বিএনপি শেখ মুজিবকে বাংলাদেশি জাতির জনক মনে করে না। আর আওয়ামী লীগ জোর দাবি করে যে, শেখ মুজিব অবশ্যই জাতির পিতা।

২. বিএনপি মনে করে যে, শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতার ডাক দেননি। দিলে স্বেচ্ছায় পাকিস্তান সরকারের নিকট গ্রেফতার হতেন না। যুদ্ধ ঘোষণা করে কোনো সেনাপতি নিজের ইচ্ছায় শত্রুপক্ষের নিকট ধরা দেয় না।

   আওয়ামী লীগ দাবি করে যে, ২৫ মার্চ (১৯৭১) গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। অবশ্য এর কোনো সামান্য প্রমাণও তারা এ পর্যন্ত প্রদর্শন করতে পারেননি।

৩. বিএনপি দাবি করে যে, ২৫ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান পাক সেনাবাহিনী থেকে বিদ্রোহ করে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাই তিনিই স্বাধীনতার প্রথম ঘোষক। অবশ্য ১৯৭০ সালের নির্বাচনে শেখ মুজিব জনগণের অবিসংবাদিত নেতার মর্যাদা পাওয়ার কারণে ২৬ মার্চ (১৯৭১) মেজর জিয়া শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে আবার স্বাধীনতা ঘোষণা করা প্রয়োজন মনে করেন। তাই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে শেখ মুজিব স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা হিসেবে স্বীকৃত হন।

৪. ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিব নিহত হন। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ১৫ আগস্টকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করা শুরু করে এবং এ দিবসটিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করে।

   ২০০১ সালে চার দলীয় জোট ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ১৫ আগস্টের সরকারি ছুটি বাতিল করে এবং সরকারিভাবে জাতীয় শোক দিবস পালন করা থেকে বিরত থাকে।

৫. ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার বিপ্লবের ফলে জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হন। ১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরকে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস হিসেবে পালন করে এবং এ দিবসটিকে সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করে।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়ে এ দিবসটির ছুটি বাতিল করে এবং বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন থেকে বিরত থাকে।

এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, দেশের বৃহৎ দুটো দল ১৫ আগস্ট এবং ৭ নভেম্বর ইস্যুতে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। ২০০১ সালের নির্বাচনের ফলাফল থেকে দেখা যায়, এ দুটো দল শতকরা ৮০ জন ভোটারের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রত্যেক দল শতকরা ৪০ জনের ভোট পেয়েছে। ভোটারদের অবশিষ্ট শতকরা ২০ ভাগ উপরিউক্ত ইস্যুতে বিএনপির পক্ষেই রয়েছে। তাহলে প্রমাণিত হলো যে, উক্ত ইস্যুতে ভোটারদের শতকরা ৬০ ভাগ একদিকে এবং মাত্র ৪০ ভাগ অপর দিকে।

সশস্ত্র বাহিনী ঐ ইস্যুতে কোন্ পক্ষ?

দেশবাসীর বিশ্বাস যে, সশস্ত্র বাহিনী কোনো রাজনৈতিক পক্ষের সমর্থক নয়। তারা রাজনীতি নিরপেক্ষ। তারা দেশবাসীর আস্থাভাজন। এ বিশ্বাসের কারণেই জনগণের মধ্যে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে যে, ২০০৭ সালের ২৭ মার্চ বিজয় দিবস পালন উপলক্ষে সেনাপ্রধান শেখ মুজিবকে জাতির জনক হিসেবে জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি না দেওয়ায় যে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, তা কি তার ব্যক্তিগত মত? সেনাবাহিনী তো রাজনৈতিক কোনো পক্ষ নয়। তিনি অবসরপ্রাপ্ত হওয়ার পর এ মত প্রকাশ করলে কোনো প্রশ্নের সৃষ্টি হতো না। সেনাপ্রধানের পদে বহাল থাকা অবস্থায় তিনি কোন্ অধিকার বলে এভাবে একটি রাজনৈতিক পক্ষ অবলম্বন করলেন?

ড. ফখরুদ্দীন সরকার এবার সরকরিভাবে ১৫ আগস্টকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করার ব্যবস্থা করেছেন এবং রাষ্ট্রপতিকেও শেখ মুজিবের মাজার যিয়ারতে নিয়ে গেলেন। এমনকি স্বয়ং সেনাপ্রধানও গেলেন। এতে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে যে, বর্তমান সরকার কি সেনাপ্রধানের সমর্থক না পরিচালক?

এ প্রশ্ন সৃষ্টির আরো একটি কারণ আছে। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে শেখ মুজিবকে জাতির পিতা হিসেবে উল্লেখ করার কোনো সিদ্ধান্ত ফখরুদ্দীন সরকার করেছেন বলে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। অথচ বাস্তবে তা করা হয়েছে। দেশের জনগণের শতকরা ৬০ ভাগ ভোটার এর সাথে একমত না হওয়া সত্ত্বেও তাদের সন্তানদের একথা বিশ্বাস করতে বাধ্য করার অধিকার কোথায় পাওয়া গেল?

এটা ক্ষমতার অপব্যবহার ছাড়া আর কোন্ অবিধায় উল্লেখ করা যায়? ক্ষমতার অপব্যবহার দুর্নীতি বলে গণ্য কি না?

ড. ফখরুদ্দীন সরকারের অযোগ্যতা ও অদক্ষতা

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টাগণ সরকারি আমলা হিসেবে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ও যোগ্য হতে পারেন। কিন্তু দেশ শাসনের মতো বিশাল দায়িত্ব পালনের যে কোনো যোগ্যতাই নেই তা প্রমাণিত সত্য। তারা সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। নির্বাচিত সরকার জনগণের সমস্যা যথাযথভাবে উপলব্ধি করে দেশ পরিচালনার যে সিদ্ধান্ত পার্লামেন্টে গ্রহণ করে, সেসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তারা যোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকবেন। কিন্তু দেশ পরিচালনার উদ্দেশ্যে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তাদের কোনো পার্লামেন্ট নেই এবং এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগও তারা পাননি। তারা সরকারের নির্দেশ পালনে অভিজ্ঞ ও যোগ্য। কিন্তু নির্দেশ দেওয়ার যে যোগ্য নন, তা প্রমাণিত হয়ে গেল।

তারা অনেক ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, অনেক ক্ষেত্রেই চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। আমি তাদের দেশপ্রেম ও সদুদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে চাই না। দেশের কল্যাণের জন্য যা করা প্রয়োজন মনে করেছেন তা হয়তো করেছেন; কিন্তু ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নিলে সদুদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। তাদের সকল সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমি আলোচনা করছি না। তাদের ভুল সিদ্ধান্তসমূহের মূলে রয়েছে, দায়িত্ব গ্রহণের শপথের সময় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী করণীয় সম্পর্কে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। শাসনতন্ত্র এ সরকারকে শুধু নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সার্বিক সহযোগিতা করার দায়িত্ব দিয়েছে। তারা এ দায়িত্ব ভুলে গিয়ে দেশ শাসন করার ইখতিয়ার নিলেন কেন? এটাই তাদের সকল ভ্রান্তির মূল। তারা শাসনতন্ত্র লঙ্ঘন করেছেন বলে হাইকোর্টও রায় দিয়েছেন।

ড. ফখরুদ্দীন সরকারের চরম ধৃষ্টতা

১৯৯১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত যারা ১৬ বছর দেশ পরিচালনা করলেন তাদেরকে শায়েস্তা করা ও রাজনীতি শিক্ষাদান করার অপচেষ্টা করে এ সরকার চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। সকল দল মান অনুযায়ী গণতান্ত্রিক আচরণ করতে সক্ষম হয়নি, এ কথা ঠিক। কিন্তু সেনাপ্রধান ও সাবেক আমলারা তাদেরকে রাজনীতি শেখানোর ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলেন কেন?

ইংল্যান্ডে বর্তমানে যে নতান্ত্রিক ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত, তা কি ৩০/৪০ বছরে সম্ভব হয়েছে? বরং তা দেড় শতাব্দীর দীর্ঘ প্রচেষ্টার সুফল।

পাকিস্তানে গণতন্ত্রের উপর সামরিক বাহিনী বারবার হস্তক্ষেপ করায় ৬১ বছর পর ২০০৮ সালে গণতন্ত্র পুনর্বহাল হলো। সামরিক হস্তক্ষেপ না হলে গণতন্ত্র সংহত হতে এত বছর দরকার হতো না।

বাংলাদেশে অবশ্য জননেতা শেখ মুজিব নিজেই ১৯৭৫ সালে গণতন্ত্র হত্যা করেন। সেনাপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও জেনারেল জিয়াউর রহমানই গণতন্ত্র বহাল করার উদ্যোগ

নেন। কিন্তু ১৯৮২ সালে সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদ গণতন্ত্র হত্যা না করলে গণতন্ত্র আরো এগিয়ে যেত।

২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর থেকে ড. ইয়াজুদ্দীনের দুর্বল সরকার আওয়ামী লীগকে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা থেকে বিরত রাখতে ব্যর্থ না হলে ওয়ান ইলেভেনের দুর্ঘটনা ঘটত না।

সেনা সমর্থিত ড. ফখরুদ্দীন সরকার রাজনীতি শেখানোর অপচেষ্টা না করে অল্প সময়ের মধ্যে সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করলে গণতন্ত্র এতটা বিপন্ন হতো না।

গণতন্ত্র শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া

১. প্রথমে সরকার বৃহৎ দু দলের নেত্রীদ্বয়কে বিদেশে তাড়ানোর উদ্যোগ নেয়, যার নাম দেওয়া হয় 'মাইনাস টু ফর্মুলা'। ২০০১ সালের নির্বাচন অনুযায়ী এ দু নেত্রী শতকরা ৮০ জন ভোটারের জোর সমর্থক। জনগণ যাদেরকে নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছে তাদেরকে জোর করে মাইনাস করার অপচিন্তা কেমন করে মগজে ঢুকল? নিজ নিজ দল তাদেরকে দলীয় প্রধানের মর্যাদা দিয়েছে। এ মর্যাদা ছিনিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব কি সরকারের? স্বাভাবিক কারণেই সরকারের এ অস্বাভাবিক অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

২. এরপর রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র সংস্কার করার ধুয়া তুলে বৃহৎ দু দলকে রক্ষণশীল ও সংস্কারপন্থি হিসেবে বিভক্ত করার চেষ্টা করা হয়। উভয় দলেই সিনিয়র নেতাদের মধ্যে সংস্কারপন্থি পাওয়া গেল। কিন্তু শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করার পর আওয়ামী লীগ ঐক্যবদ্ধ রয়ে গেল। বিএনপির সংস্কারপন্থিদেরকে সরকার ও নির্বাচন কমিশন প্রত্যক্ষ সহযোগিতা দিয়ে আসল বিএনপিকে মাইনাস করে নকল বিএনপিকেই স্বীকৃতি দিল। কারাগারে অবস্থানরত বেগম জিয়ার দৃঢ়তায় ও ময়দানে দলের নেতাকর্মীদের দাপটে সরকারি বিএনপি দমে গেল। বেগম জিয়ার মুক্তির পর সকল সংস্কারপন্থিই নেত্রীর নিকট আত্মসমর্পণ করলেন। সরকারের এ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হলো।

৩. সরকারি উপদেষ্টারা এবং সিইসি মন্তব্য করতে লাগলেন–

ক. একই ব্যক্তি বছরের পর বছর দলের নেতা থাকবেন– এটা কেমন গণতন্ত্র?

খ. একই লোক বারবার প্রধানমন্ত্রী হওয়া কি উচিত?

গ. দলে পরিবারতন্ত্র চালু থাকা গণতন্ত্রবিরোধী।

ঘ. দলের দীর্ঘদিনের জেনারেল সেক্রেটারিকে হুট করে দল থেকে বহিষ্কার করা মেনে নেওয়া যায় না।

ঙ. দলের গঠনতন্ত্রকে গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী সংশোধন করা অত্যাবশ্যক।

এসব কথা নীতিগতভাগে সঠিক হতে পারে; কিন্তু এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলকে বাধ্য করার কি কোনো ক্ষমতা সরকারের আছে? দেশে গণতন্ত্র চালু থাকলে ক্রমান্বয়ে দলের ভেতর থেকেই সংশোধন হতে থাকবে। বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা কি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি?

মালয়েশিয়ায় ড. মাহাথির মুহাম্মদ ২২ বছর একটানা প্রধানমন্ত্রী থেকে দেশকে উন্নত করেছেন। ব্রিটেনে মার্গারেট থেচার একটানা ১২ বছর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। কেউ কি এ দুটো ঘটনাকে গণতন্ত্রবিরোধী বলে মন্তব্য করেছেন?

ভারতীয় বৃহত্তম পার্টি ন্যাশনাল কংগ্রেস নেহেরু পরিবারের গৃহবধূ সোনিয়া গান্ধিকে দলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করাকে পরিবারতন্ত্র বলবেন? বেগম জিয়া ও শেখ হাসিনা কি গায়ের জোরে দলের জাঁদরেল পুরুষদেরকে বাধ্য করেছেন, তাদেরকে নেত্রী বলে স্বীকার করার জন্য? দল যাকে নেতা মানে সেইতো নেতা। এতে অন্য কারো আপত্তি করার অধিকার নেই।

আসল সমস্যা অন্যত্র

বর্তমান সরকার ও নির্বাচন কমিশন উপরিউক্ত যেসব বিষয়কে সমস্যা মনে করে সংস্কার চিন্তা করেছেন সেসব আসল সমস্যা নয়; আসল সমস্যা কোনো কোনো দলের ক্ষমতালিপ্সা। কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলে দেশি ও বিদেশি সকল পর্যবেক্ষক বলিষ্ঠ সার্টিফিকেট দেওয়া সত্ত্বেও যে দলটি পরাজিত হলে নির্বাচনী ফলাফলকে মেনে নিতে সম্মত হয় না, সে দলটির এ চরম অগণতান্ত্রিক মনোভাবই প্রধান সমস্যা। এ সমস্যার কারণেই ২০০৭ সালের নির্বাচন বানচাল হয়ে গেল। বিজয়ের নিশ্চয়তা ছাড়া নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করলে ওয়ান ইলেভেন বারবারই আসবে।

সরকার ও নির্বাচন কমিশন ডিসেম্বরে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সক্ষম হবেন কি?

বাংলাদেশে গণতন্ত্র বারবার বিপন্ন হলেও ওয়ান ইলেভেনের পর দেশ যে চরম অনিশ্চিত অবস্থায় পড়ে গেছে, এত দীর্ঘ সময় এমন অবস্থা ইতঃপূর্বে কখনো সৃষ্টি হয়নি। সরকার ও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা প্রকাশ্য রাজনৈতিক পক্ষপাতমূলক হওয়াই অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত মহাজোটের আন্দোলনের ফসল বলে তিনি যেমন দাবি করলেন, সরকার ও নির্বাচন কমিশনের আচরণও ঐ দাবির সমর্থক বলে দৃশ্যমান হলো। তারা বিএনপিকে বিভক্ত করে এবং চার দলীয় জোটকে দুর্বল করে নির্বাচনী ময়দান আওয়ামী লীগকে একচেটিয়া দখল করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আঁতাত করে ফেলেন।

কিন্তু দায়ে ঠেকে সরকার ও নির্বাচন কমিশন যখন বিএনপিকে ময়দানে আসতে দিতে বাধ্য হলো তখন আওয়ামী লীগ ২০০৭ সালের নির্বাচনে পূর্বকার ভূমিকায় অবতীর্ণ

হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল। শেখ হাসিনা বিএনপিকে নির্বাচন বানচালের জন্য ষড়যন্ত্র করার আজব অভিযোগ করলেন। বেগম জিয়া আইনি প্রক্রিয়ায় মুক্ত হওয়ার পর সরকারের সাথে শেখ হাসিনার আঁতাত অর্থহীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল। নির্বাচনে বিজয়ের যে নিশ্চিয়তাবোধ নিয়ে আওয়ামী লীগ উল্লাসের সাথে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে যোগদান করল এবং সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতাসীন হওয়ার যে সুখস্বপ্ন দেখেছিল তা ভেঙে যাওয়ায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ভারসাম্য হারিয়ে এমন আবল-তাবল বকে চলেছেন, যা রীতিমতো কৌতুকের উদ্রেক করে।

ড. ফখরুদ্দীনের রাজনৈতিক অভিভাবকত্ব দাবি

২০০৮ সালের ১২ মে প্রধান উপদেষ্টা বর্তমান সরকারপ্রধান ড. ফখরুদ্দীন আহমদ চমৎকার শালীন ও গোছানো ভাষায় দেশবাসীর উদ্দেশ্যে রেডিও-টিভির মাধ্যমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন। এ ভাষণে বিভিন্ন বিষয়ে অনেক কথাই বলেছেন। এখানে একটি বিষয় সম্পর্কেই আলোচনা করতে চাই।

তিনি সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে 'ঐকমত্যের জাতীয় সনদ' নামক (Charter of National Unity) একটা দলিলে দস্তখত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

রাজনৈতিক তৎপরতাকে সহিংসতা থেকে মুক্ত রাখা, নির্বাচনে গণতান্ত্রিক রীতি অনুসরণ, সংসদে সরকারি ও বিরোধী দলের আচরণ, দেশের জাতীয় ইস্যুগুলোর ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সর্বসম্মত অভিমতের ভিত্তিতে প্রণীত একটি দলিলে তিনি তাদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে চেয়েছেন। দেশে সুস্থ রাজনীতি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সফল সংসদীয় কার্যক্রমের প্রচলনের উদ্দেশ্যে এমন একটি সনদে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারলে দেশ ও জাতির জন্য বিরাট কল্যাণ হতে পারে। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে এ উদ্যোগকে মহৎ বলা যায়।

রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপের মাধ্যমে তিনি এ সনদ প্রণয়নের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এ মহৎ কাজটির ব্যাপারে তিনি মৌলিক ভুল করে ফেলেছেন।

প্রথমত, প্রধান দলগুলোর নেতৃবৃন্দকে দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার করে তাদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করেছেন। অথচ দীর্ঘ এক বছরেও দুর্নীতিতে অপরাধী সাব্যস্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এভাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে শত্রুতে পরিণত করায় এ সরকারের প্রতি তারা বিরূপ হন।

দ্বিতীয়ত, শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সরকার ও নির্বাচন কমিশন সংসদ নির্বাচনের উদ্যোগকে অগ্রাধিকার না দিয়ে দেশ-শাসনের অপচেষ্টা করায় তাদের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, তারা দীর্ঘদিন ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে চায়।

তৃতীয়ত, রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে বিভেদ সৃষ্টি করার ষড়যন্ত্র করে সরকারের প্রতি অনাস্থার জন্ম দেয়।

এভাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে ড. ফখরুদ্দীন সম্পূর্ণ আস্থা হারানোর পর তাদেরকে জাতীয় ঐকমত্যের সনদে স্বাক্ষর দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি দেশের রাজনৈতিক অভিভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

যদি ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই তিনি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে সম্মানজনক আচরণ প্রদর্শন করে এ জাতীয় প্রস্তাব দিতেন তাহলে অবশ্যই সাড়া পেতেন। তাহলে সকলের আস্থা সৃষ্টি হতো যে, সরকার সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টিতে আন্তরিক।

এর বিপরীত আচরণের দরুন তার এ আহ্বানকে নেতৃবৃন্দ ধৃষ্টতার শামিল মনে করে থাকলে বিস্মিত হওয়া যায় না। নেতৃবৃন্দের উপর এমন মাতব্বরী করার সাহস কেমন করে দেখালেন?

গণপ্রতিনিধিত্ব অর্ডিন্যান্স

প্রধান রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা না করে নিজেদের খামখেয়ালি অনুযায়ী অর্ডিন্যান্স চাপিয়ে যেসব রাজনৈতিক বিধান মেনে নিতে সরকার রাজনৈতিক দলসমূহকে বাধ্য করতে চেয়েছেন, ঐ একই কারণে তা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি।

সরকারের সামনে একমাত্র পথ

ওয়াদা ও রোডম্যাপ অনুযায়ী ডিসেম্বরে সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করে নবনির্বাচিত সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে নিরাপদে ও সসম্মানে বিদায় হতে হলে ২০০১ সালে যেসব দল সংসদে নির্বাচিত হয় সেসব দলের নেতৃবৃন্দের সাথে সমঝোতা করে একটি সুন্দর নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এর কোনো বিকল্প চিন্তা করলে সরকারসহ সকলের জন্যই চরম সংকট সৃষ্টি হবে।

৩৪৪.

যুদ্ধাপরাধী ইস্যু

২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের শোচনীয় পরাজয়ের পর থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, বামপন্থি, ভারতপন্থি ও সকল ইসলামবিরোধী মহল অব্যাহতভাবে দাবি জানাচ্ছে যে, জামায়াতে ইসলামী যুদ্ধাপরাধী।

ইসলাম সম্পর্কে তাদের জ্ঞান কমবেশি যতটুকুই থাকুক বা না থাকুক, অন্যান্য বিষয়ে তারা মোটেই অজ্ঞ নন। তাই যুদ্ধাপরাধীর যথাযথ সংজ্ঞা তাদের জানা না থাকা

অসম্ভব। তারা যে এ সংজ্ঞা জানেন এর প্রমাণ :

১. বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করার পর এর প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৯৫ জন উচ্চ কর্মকর্তাকে যুদ্ধাপরাধী (War criminal) হিসেবে চিহ্নিত করেন। কোনো বেসামরিক ব্যক্তিকে তিনি এ তালিকাভুক্ত করেননি বা বেসামরিক লোকদেরকে নিয়ে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে পৃথক তালিকাও তৈরি করেননি।

   জনগণের মধ্যে যারা পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিরুদ্ধে ছিল, তারা মুক্তিযুদ্ধে শরীক হয়নি। তাদের মধ্যে যারা কোনো সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে তাদেরকে শেখ মুজিব কলেবরেটর (দালাল) নাম দিয়ে তাদেরকে বিচারের সম্মুখীন করার জন্য দালাল আইন পাস করেন। সে আইনে লক্ষাধিক লোককে গ্রেফতার করে বিচারকার্য শুরু করা হয়; কিন্তু ১৯৭৪ সালে শেখ মুজিব সব দালালকে সাধারণ ক্ষমার মাধ্যমে মুক্তি দেন। অবশ্য যাদের বিরুদ্ধে খুন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ রয়েছে, তাদের বিচার করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

   শেখ মুজিবের শাসনামলে জেনারেল শফীউল্লাহ সেনাপ্রধান ছিলেন এবং এ. কে খন্দকার বিমান বাহিনীর প্রধান ছিলেন। তারা যদি বেসামরিক লোকদেরকেও যুদ্ধাপরাধী গণ্য করা যায় বলে বিশ্বাস করতেন তাহলে তারা রাষ্ট্রপ্রধানকে এ বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারতেন। তারা নিশ্চয়ই এ বিশ্বাস পোষণ করতেন না। কারণ তারা যুদ্ধাপরাধীর সংজ্ঞা জানতেন।

২. শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালের জুন থেকে ২০০১ সালের জুন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ নেতারা বাংলাদেশের হর্তাকর্তা ছিলেন। যে আওয়ামী লীগ নেতারা ২০০১ সালের নির্বাচনের পর থেকে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দকে যুদ্ধাপরাধী বলে দাবি করে চলেছেন, তারা ক্ষমতাসীন থাকাকালে কি যুদ্ধাপরাধীর সংজ্ঞা জানতেন না? তারা শেখ মুজিব হত্যার বিচারের ব্যবস্থা করতে পারলেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা কেন করলেন না? যে সেক্টর কমান্ডারগণ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবিতে এত লাফালাফি করছেন, তারা তাদের নিজস্ব সরকারের নিকট কেন দাবি জানালেন না? তারা বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট কেন ধরনা দিচ্ছেন?

গরজ বড় বালাই

এ দুটো উদাহরণই এ কথা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট যে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সোচ্চার সবাই এর সঠিক সংজ্ঞা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু গরজ বড় বালাই। তারা জামায়াতে ইসলামীকে ঘায়েল করার আর কোনো উপায় না পেয়ে নিতান্ত দায়ে ঠেকে

এমন জ্ঞানপাপীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়েছেন। জামায়াত এ আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, সে ইসলামী আদর্শের বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না। জামায়াতকে সন্ত্রাসের সাথে জড়িত প্রমাণ করতেও তারা ব্যর্থ হয়েছেন। শেখ হাসিনার শাসনামলে যে কয়টি সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে, প্রত্যেকটির বেলায়ই বিনা তদন্তে ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই স্বয়ং শেখ হাসিনা জামায়াত-শিবিরকে দায়ী বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি কোনো ঘটনারই নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করেননি। তিনি নিশ্চিতভাবে জামায়াতকে দায়ী মনে করে থাকলে তদন্ত করে বিচার করলেন না কেন?

শেখ হাসিনার লগি-বৈঠার আন্দোলনের ফসল বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করে জামায়াত নেতৃবৃন্দের দুর্নীতি আবিষ্কার করার চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি। সরকারের বৈদেশিক বিভাগের উপদেষ্টা ড. ইফতেখার আহমদ জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের নিকট পর্যন্ত এ বিষয়ে ধরনা দেওয়া আবশ্যক মনে করেছেন। প্রধান উপদেষ্টা যাদের আন্দোলনের ফসল হিসেবে দু বছর বাংলাদেশের রাজত্ব করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাদের সান্ত্বনার জন্য ঘোষণা করেছেন যে, তার সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকার্য শুরু করতে না পারলেও তিনি এমন আইনী ব্যবস্থা করে রেখে যাবেন, যাতে পরবর্তী সরকার এ মহান কার্যটি সমাধান করতে বাধ্য হন।

আসল গরজটি কী?

আওয়ামী লীগ, বামপন্থি ও সেক্টর কমান্ডারগণের আসল গরজটি কী, যার জন্য জামায়াত নেতৃবৃন্দকে যুদ্ধাপরাধী সাব্যস্ত করে থাকেন এবং তাদের বিরুদ্ধে বিচার দাবিতে আন্দোলন করেন? তাদের ক্ষমতায় যাওয়ার পথে জামায়াতে ইসলামীকেই তারা একমাত্র অন্তরায় মনে করেন। ২০০১ সালের নির্বাচনী ফলাফল থেকে তারা হিসাব কষেই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী শক্তি ও ইসলামী শক্তির ঐক্য ভঙ্গ করার এটাই একমাত্র উপায় বলে তাদের ধারণা।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন তাদের প্রতি স্বাভাবিক কারণেই কৃতজ্ঞ, যাদের সন্ত্রাসী আন্দোলনের ফলে তারা দেশের হর্তাকর্তা হওয়ার সুযোগ পেলেন। তাই তারা বিএনপি'কে বিভক্ত করার চেষ্টা করেন। নির্বাচন কমিশন তো মূল বিএনপি'কে পাত্তাই দিতে চাননি।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সকল মহল জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তিকে নির্বাচনে তাদের বিজয়ের পথে প্রতিবন্ধক মনে করে। বর্তমান সরকার তাদের পক্ষ হয়েই এ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় করণীয় সমাধা করার চেষ্টায় ত্রুটি করেনি। এ মহা গরজের কারণেই বিএনপি'কে দুর্বল করা ও জামায়াত নেতাদেরকে নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষণা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই যুদ্ধাপরাধের ধোয়া তুলতে হয়েছে।

যুদ্ধাপরাধীর সংজ্ঞা

এ সংজ্ঞা আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছি এ জন্য যে, যুদ্ধাপরাধীর প্রচারাভিযান কিছু লোককে বিভ্রান্ত করতে পারে। পত্র-পত্রিকায় ও টিভি চ্যানেল যাদের নিয়ন্ত্রণে, তাদের অধিকাংশ ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকেই ক্ষমতাসীন দেখতে চান। তাই তাদেরকে ক্ষমতায় আনতে হলে ভোটের ময়দানে জনমতকে বিভ্রান্ত করা অত্যাবশ্যক।

সর্বসাধারণকে বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত রাখার প্রয়োজনেই এ আলোচনা করছি। জ্ঞানপাপীদেরকে জ্ঞানদান করার কোনো প্রয়োজনে এ আলোচনা নয়।

যখন এক দেশের সৈন্য অন্য দেশ আক্রমণ করে তখন দু দেশের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে যে সংঘর্ষ চলে এরই নাম যুদ্ধ। যুদ্ধেরও কতক নীতি-পদ্ধতি আছে। সে পদ্ধতি অনুযায়ী উভয় পক্ষে যুদ্ধে যত হতাহতই হোক, তাকে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় না। এমনকি এক পক্ষের সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেলেও এটাকে দূষণীয় মনে করা হয় না। যুদ্ধে জয়-পরাজয় হয়েই থাকে। কিন্তু কোনো পক্ষের সেনাবাহিনী যদি অপর পক্ষের বেসামরিক জনগণকে হত্যা করে অথবা আন্তর্জাতিক যুদ্ধনীতি লঙ্ঘন করে তাহলে এটাকে যুদ্ধাপরাধ বলা হয়। ন্যায়যুদ্ধ অপরাধ নয়; অন্যায় যুদ্ধই অপরাধ। সেনাবাহিনীর লোকই যুদ্ধাপরাধী বলে গণ্য। বেসামরিক লোককে যুদ্ধাপরাধী বলা হয় না।

বেসামরিক লোকদের মধ্যে যদি মারামারি হয় তাহলে এটাকে যুদ্ধ বলা হয় না; দাঙ্গা-হাঙ্গামা বলা হয়। ভারতের গুজরাটে হিন্দু জঙ্গীবাদীরা ও মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পুলিশ বাহিনী মুসলমানদেরকে পাইকারিভাবে হত্যা করেছে– এটাকে সন্ত্রাস বলা চলে; যুদ্ধ নয়।

১৯৭১ সালে যা ঘটেছে

১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করার উদ্দেশ্যে একচেটিয়াভাবে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদেরকে বিজয়ী করে। তারা পাকিস্তান থেকে পৃথক হওয়ার উদ্দেশ্যে ভোট দেয়নি; কিন্তু ইয়াহইয়া খান ও ভুট্টো ষড়যন্ত্র করে শেখ মুজিবের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে।

ইয়াহইয়া-মুজিব সংলাপ ব্যর্থ হয় এবং ২৫ মার্চ ইয়াহইয়া সরকার ব্যালটের সিদ্ধান্তকে বুলেটের মাধ্যমে দাবিয়ে রাখার অপচেষ্টা চালায়। নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা ভারতে আশ্রয় নিয়ে ভারত সরকারের সাহায্যে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার সিদ্ধান্ত নেন। শেখ মুজিব আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিলে তিনিও হয়তো ভারতে আশ্রয় নিতেন। তিনি পাকিস্তান সরকারের নিকট স্বেচ্ছায় বন্দী হয়ে পশ্চিম-পাকিস্তানে যেতে বাধ্য হন।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব-পাকিস্তানকে অস্ত্রবলে দখলে রাখতে চেষ্টা করল। আর পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ তাদের দখল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সংগ্রাম করতে বাধ্য হলো। এটাকে কাশ্মীরের আযাদী সংগ্রামের সাথে তুলনা করা যায়। কাশ্মীর ভারত থেকে স্বাধীন হওয়ার সংগ্রাম করছে, আর ভারত সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে কাশ্মীরকে দখল করে আছে।

পূর্ব-পাকিস্তানে কোনো বিদেশি সেনাবাহিনী হামলা করেনি। হামলাকারীরা সবাই পশ্চিম-পাকিস্তানি। পূর্ব-পাকিস্তানি যারা সশস্ত্র বাহিনীতে ছিল তাদের মধ্যে যারা পূর্ব-পাকিস্তানে ছিল তারাই মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করে। সে হিসেবে এটাকে শুধু স্বাধীনতা সংগ্রাম না বলে স্বাধীনতা যুদ্ধই বলতে হয়।

পাকিস্তানের জন্মের পর থেকে ভারত সরকার পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি অব্যাহতভাবে যে বৈরী আচরণ করে তাতে ভারতের সাহায্যে স্বাধীনতা অর্জন করার পর ভারতের আধিপত্য থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না বলে যারা আশঙ্কা করেছে, তাদের পক্ষে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী পূর্ব-পাকিস্তানে হামলা চালিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে এবং তাদেরকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে ভারতে নিয়ে যায়। বিজয়ী বাহিনী হিসেবে ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানি বাহিনীর যাবতীয় সামরিক সরঞ্জাম ভারতে নিয়ে যায়। বাংলাদেশকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে যদি তারা মুক্তিযুদ্ধের সহায়কের ভূমিকা পালন করত তাহলে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য পাকিস্তানি বাহিনীর সমর-সরঞ্জাম রেখে যেত। তারা যে বাংলাদেশকে তাদের করায়ত্ত রাখার কুমতলবেই এ এলাকাকে পাকিস্তান থেকে পৃথক করতে মুক্তিযুদ্ধে সহায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছে তা ঐ আচরণ থেকে তো প্রমাণিত হয়ই, তদুপরি স্বাধীন বাংলাদেশের সাথে ভারতের বৈরী আচরণ এমন নগ্নভাবে প্রকাশিত যে, জনগণ ভারত সরকারকে সৎ প্রতিবেশী হিসেবেও গণ্য করতে পারছে না।

ভারতীয় বাহিনী স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এজি ওসমানীকে উপস্থিত করেনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের শতকরা একশ ভাগ কৃতিত্বই ভারত দাবি করে থাকে।

ভারতের বিরাট সাফল্য

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে ভারতের যে জনবল ক্ষয় ও অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে তা ব্যর্থ হয়নি। তাদের বিরাট সাফল্য এখানে যে, বাংলাদেশিদের মধ্যে তারা এমন একটি রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে, যারা মুক্তিযুদ্ধে ভারতের

সহযোগিতার প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এ দেশে ভারতের আধিপত্য কায়েমের হীন উদ্দেশ্যে ভারতসরকার যত দাবি জানাচ্ছে, তা সবই অত্যন্ত উৎসাহ ও আবেগের সাথে সমর্থন করে।

বাংলাদেশের চারপাশে ভারতের যে কয়টি রাজ্য রয়েছে, যেখানে বাংলাদেশের উপর দিয়ে যাতায়াত করার উদ্দেশ্যে ট্রানজিটের দাবি পূরণ করতে তারা আগ্রহী। চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহার করার দাবি ও বাংলাদেশ থেকে গ্যাস পাওয়ার দাবি পূরণ করে ভারতকে খুশি করার জন্য তারা উদগ্রীব।

তারা বাংলাদেশের প্রতি ভারতের কোনো বৈরী আচরণে কখনো আপত্তি করে না। সীমান্তে বিএসএফ প্রায়ই গুলি করে পাখি শিকার করার মতো বাংলাদেশিদেরকে হত্যা করছে। তারা প্রতিবাদ করা বেয়াদবি মনে করে। ভারত থেকে বাংলাদেশের দিকে প্রবাহিত নদীর পানি আটকের বিরুদ্ধে দেশবাসী যত সোচ্চারই হোক, তারা এটাকে অন্যায়ই মনে করে না।

অথচ এ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের উপর হামলা হলে একমাত্র ভারত থেকেই হবে বলে দেশবাসী মনে করে। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের মতো ভারতের অন্ধ সমর্থক শক্তি যদি ক্ষমতাসীন হতে পারে তাহলে ভারতের আধিপত্য ভারতের চেষ্টা ছাড়াই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

আওয়ামী লীগের হাতে দেশের সার্বভৌমত্ব কি নিরাপদ?

'স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রশ্ন' শিরোনামে আমার রচিত বইটিতে পর্যাপ্ত তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছি যে, আওয়ামী লীগের হাতে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব নিরাপদ নয়। তারা ভারতের আধিপত্য কায়েমের জন্যই সংকল্পবদ্ধ।

ভারতে ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ধ্বংস ও গুজরাটে মুসলিম গণহত্যার সামান্য প্রতিবাদও আওয়ামী লীগ করেনি; বরং ২০০১ সালের নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর ভারতে গিয়ে শেখ হাসিনা প্রচার করেন যে, বাংলাদেশে তালেবান সরকার কায়েম হয়েছে এবং সংখ্যালঘুদের উপর চরম নির্যাতন চলছে। তার মুখে এসব কথা প্রচারিত হওয়ার পর সেখানকার প্রভাবশালী কোনো কোনো পত্রিকায় ভারতসরকারের প্রতি বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়কে রক্ষার জন্য সামরিক হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়।

আমার উপরিউক্ত পুস্তকের একটি তথ্য এখানে উদ্ধৃত করছি, যা এ কথা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে ভারতের কর্তৃত্ব চায়।

'২০০৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালন উপলক্ষে বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী সমিতির এক আলোচনাসভায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল জলিল এমপি স্পষ্ট ভাষায়ই ভারতকে বাংলাদেশের উপর হামলা করার উদাত্ত আহ্বান জানালেন।

ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী বুদ্ধিজীবী নেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ড. এ কে আযাদ চৌধুরী। উক্ত সভায় ভারতের ডিপুটি হাই কমিশনার বাবু সর্বজিৎ চক্রবর্তী রীতিমতো হুমকির ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন।' (৬৮ পৃষ্ঠা)

দৈনিক ইনকিলাবে ১৬ ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত ঐ সভার সংবাদ উদ্ধৃত করছি :

"মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষায় ভারতকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে

—আবদুল জলিল

ট্রানজিটের জন্য আর বেশিদিন অপেক্ষা করবো না

—ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার

স্টাফ রিপোর্টার : মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে গতকাল ঢাকায় বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতি আয়োজিত এক আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল এমপি বলেছেন, ১৯৭১-এ আমরা পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম। বাংলাদেশকে একটি উদার মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধ করিনি। অথচ বাংলাদেশকে এখন একটি উদার মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনাকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে। আর এর ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বর্তমানে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শরীক ভারতও। কারণ ভারতের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও আদর্শিক চেতনা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলনীতি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এক ও অভিন্ন। এ কারণেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত সহায়তা দেয়।

তাই মুক্তিযুদ্ধের এ চেতনাকে রক্ষা করতে এখন ভারতকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বর্তমান ৪ দলীয় জোট সরকারকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তিকে লালনকারী অপশক্তি আখ্যায়িত করে এই সরকারের সাথে নীতিগত কোন সম্পর্ক না রাখার জন্যও ভারতের প্রতি আহ্বান জানান। আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার সর্বজিৎ চক্রবর্তী বলেন, বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে আসা-যাওয়ার জন্য ট্রানজিট একটি অনিবার্য বিষয়। ভারতকে এই ট্রানজিট প্রদানের জন্য বাংলাদেশ চুক্তিবদ্ধ। কিন্তু একমাত্র পানিপথ ছাড়া অন্যান্য পথে ভারতকে এই ট্রানজিট দিতে বাংলাদেশ দীর্ঘদিন যাবৎ কালক্ষেপণ করে চলেছে। এ অবস্থায় ট্রানজিটের জন্য আমরা আর বেশি দিন অপেক্ষা করতে পারি না। বাংলাদেশের সাথে ভারতের পানি সমস্যা সম্পর্কে তিনি বলেন, বাংলাদেশকে ভারত প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি পানি দিচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন, বর্ষাকালসহ বছরে বাংলাদেশের

মানুষের মাথাপিছু পানির প্রাপ্যতা হচ্ছে ২০ হাজার কিউসেক। আর ভারতে তা ১ হাজার ৮শ' কিউসেক মাত্র। সুতরাং এই পানিও যদি বাংলাদেশের জন্য পর্যাপ্ত না হয় তবে আর কতোটা হলে পর্যাপ্ত হবে?

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল বর্তমান সরকার ও তার রাজনৈতিক চেতনাকে প্রতিরোধ করার আহ্বান জানিয়ে আরও বলেন, আমরা আবার ক্ষমতায় গেলে ভারতের সাথে বাংলাদেশের যত সমস্যা আছে তার সবই সমাধান করা হবে।

ভারতের সহায়তা ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব ছিলো না উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। কারণ এ দু'দেশের ঐতিহাসিক সম্পর্ক মহান মুক্তিযুদ্ধের রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ। ভারত এ দেশের স্বাধীনতা অর্জনে যে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে তা সারাজীবন আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবো উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, এ দেশের ভারতবিরোধী অপপ্রচারের মধ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য চিহ্নিত মহলটির অপপ্রয়াস মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় থেকেই চলে আসছে। কিন্তু এ দেশের সচেতন মানুষ ঐ অপপ্রচারে কখনো বিভ্রান্ত হয়নি বলেই তারা এখনো ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং দু'দেশের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করতে আগ্রহী।"

১৯৭১ ও ২০০৪-এর পরিস্থিতি কি এক

আওয়ামী নেতা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে পুনর্বহাল করার উদ্দেশ্যে '৭১-এর মতোই ভারতকে আবার এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন। '৭১-এর পরিস্থিতি ও ২০০৪ সালের পরিস্থিতির পার্থক্য বোঝার যোগ্যতাও তিনি হারিয়ে ফেললেন।

১৯৭১ সালের নির্বাচনে জনগণ আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাসীন করতে চেয়েছে। পশ্চিম-পাকিস্তানি সেনাবাহিনী শক্তিবলে পূর্ব-পাকিস্তান দখল করে রাখল। তখন আওয়ামী লীগ নেতাদের ডাকে সাড়া দিয়ে ভারত দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীকে তাড়িয়ে জনগণকে স্বাধীন করতে এগিয়ে এল।

২০০৪ সালে বাংলাদেশ কার দখলে ছিল? দেশ তখন জনগণের দখলেই ছিল। জনগণ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে চার দলীয় জোটকে বিপুলভাবে বিজয়ী করে ক্ষমতায় বসায়। আবদুল জলিল সাহেব ভারতকে যে আহ্বান জানালেন, এর উদ্দেশ্য কী? দেশকে জনগণের দখল থেকে উদ্ধার করে আওয়ামী লীগকে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন করার উদ্দেশ্য ছাড়া আর কী উদ্দেশ্য হতে পারে? জনগণ কেন আওয়ামী লীগকে '৭১ সালের মতো ভোট দিল না, এর প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যেই কি এ আহ্বান?

বাংলাদেশের স্বাধীনতা কাদের হাতে নিরাপদ?

আগেই লিখেছি যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যদি কখনো বিপন্ন হয় তাহলে একমাত্র ভারতের পক্ষ থেকেই হবে। যারা ভারতকে সর্বাবস্থায় বন্ধু মনে করে, এমনকি ক্ষমতার লোভে ভারতকে হামলা করার আহ্বান জানায়, তাদের হাতে কি বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিরাপদ?

১৯৭১ সালে যারা ভারতের আধিপত্যের আশঙ্কায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি, জনগণ কি তাদেরকে স্বাধীনতাবিরোধী মনে করে? যদি তা-ই মনে করত তাহলে তারা দেশে জনগণের নিকট নির্বাচনে ভোট চাওয়া দূরের কথা, দেশে তারা থাকতেই পারত না। এ দেশে ভারতের হামলা হলে তারাই সর্বাগ্রে দেশের স্বাধীনতার জন্য জান দেবে বলে জনগণ বিশ্বাস করে। যারা ক্ষমতার লোভে ভারতকে হামলা করার আহ্বান জানায়, তাদের হাতে দেশের স্বাধীনতা নিরাপদ বলে জনগণ কেমন করে বিশ্বাস করতে পারে?

যুদ্ধাপরাধীর ধোয়া তুলে জনগণকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ যে আর নেই, সে কথা যত তাড়াতাড়ি তারা উপলব্ধি করবেন ততই তাদের জন্য মঙ্গল। এ উপলব্ধি না থাকায়ই তারা জামায়াতকে 'এক ঘরে' করার অপচেষ্টায় নিজেরাই 'এক ঘরে' হয়ে গেলেন।

তারা চাচ্ছিলেন যে, কোনো অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট, প্রধান উপদেষ্টা ও বিদেশি রাষ্ট্রদূতগণ যেন জামায়াতকে দাওয়াত না দেন। দিলে তারা গোশ্বা করে থাকবেন ও দাওয়াতে যাবেন না। সৌদি দূতের ইফতারের দাওয়াতে গিয়ে তারা বিপদেই পড়লেন। আমেরিকার দূতের ইফতারে গিয়েও তারা একই সমস্যায় পড়লেন। তাই তারা ঈদ সম্বর্ধনায় প্রেসিডেন্ট ও প্রধান উপদেষ্টার দাওয়াতে অনুপস্থিত থেকে 'এক ঘরে' হয়ে থাকতে বাধ্য হলেন। গত ৭ অক্টোবর সৌদি জাতীয় দিবসে আমিও না যেয়ে পারলাম না। তাদেরকে নিশ্চয়ই দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। তাদের কাউকে দেখা গেল না। তবে পত্রিকায় দেখলাম, শুধু জনাব তোফায়েল আহমদ গিয়েছিলেন। তারা জামায়াতকে বয়কট করার অপচেষ্টা করে নিজেরাই বয়কটের শিকার হলেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আকল ও হুঁশজ্ঞান দান করুন।

৩৪৫.

জনগণ কি '৭২-এর শাসনতন্ত্র ফিরে পেতে চায়?

২০০৮ সালের ১০ অক্টোবরের পত্রিকায় প্রকাশ যে, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন সংক্রান্ত এক বৈঠকের পর দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম সাংবাদিকদের নিকট বলেন, 'আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংসদে দু তৃতীয়াংশ আসনে বিজয়ী হলে তারা ১৯৭২ সালে প্রণীত শাসনতন্ত্র পুনর্বহাল করবেন।'

আওয়ামী লীগ নেতাকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি স্পষ্ট ভাষায় দেশবাসীকে জানিয়ে দিলেন যে, তারা ১৯৭২-এর শাসতন্ত্রকে বহাল করতে চান এবং এ মহান উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তাদেরকে আগামী নির্বাচনে সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে কমপক্ষে ২০০ আসনে বিজয়ী হতে হবে।

শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষমতাসীন থাকাকালেই শাসনতন্ত্রে ৪টি সংশোধন করেছিলেন। '৭২-এর শাসনতন্ত্র বহাল করলে তো তাদের আদর্শ নেতার সংশোধনীও বাতিল হয়ে যাবে। এদিকটা খেয়ালে রাখা হয়েছে কি না জানি না।

আগামী ডিসেম্বরের ১৮ তারিখে (২০০৮ সাল) অনুষ্ঠিতব্য নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন কতটুকু নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হবে, তা এখনো অনিশ্চিত। নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে এবং সকল দল নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ পেলে নির্বাচনের মাধ্যমেই প্রমাণিত হবে যে, জনগণ ১৯৭২ সালের শাসনতন্ত্র পুনর্বহালের পক্ষে রায় দেয় কি না। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে এ কথার উল্লেখ থাকলে এটা একটা নির্বাচনী ইস্যুতে পরিণত হতে পারে।

১৯৭২ সালের শাসনতন্ত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগ নেতাদের প্রণীত শাসনতন্ত্রের যেসব বৈশিষ্ট্য ছিল তা নিম্নে উল্লেখ করেছি :

১. ঐ শাসনতন্ত্রে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লেখা ছিল না। এমনকি আল্লাহ শব্দটিও ছিল না।

২. রাষ্ট্র-পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে নিম্নরূপ ৪টি আদর্শ লেখা ছিল :
(ক) ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ, (খ) জাতীয়তাবাদ, (গ) গণতন্ত্র ও (ঘ) সমাজতন্ত্র।

৩. ধর্মের ভিত্তিতে কোনো রাজনৈতিক দল গঠন করা নিষিদ্ধ ছিল।

১৯৭৭ সালে শাসনতন্ত্রের পঞ্চম সংশোধনী

১৯৭৭ সালে গণভোটের মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের পঞ্চম সংশোধনী অনুমোদিত হয়। ঐ সংশোধনীর মাধ্যমে যে পরিবর্তন আনা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

১. শাসনতন্ত্রের ধারাগুলোর শুরুতেই 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লেখা হয়েছে, যা আগে লেখা ছিল না।

২. রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি চারটির মধ্যে ১ম ও ৪র্থটি পরিবর্তন করে নিম্নরূপে লেখা হয়েছে :

(ক) সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস।

(ঘ) সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার।

৩. যে ধারাতে ধর্মের ভিত্তিতে কোনো রাজনৈতিক দল গঠন নিষিদ্ধ ছিল, সে ধারাটি বাতিল করা হয়।

পঞ্চম সংশোধনীর সুফল

পঞ্চম সংশোধনীর ফলে বাংলাদেশে যে পরিবর্তন আসল তা নিম্নরূপ :

প্রথম সুফল: এ সংশোধনের ফলে বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশে পরিণত হয়ে মুসলিম বিশ্বে মুসলিম দেশ হিসেবে গণ্য হয়েছে। এর আগে বাংলাদেশ ভারতের মতো একটি অমুসলিম দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল।

এ সংশোধনী না হওয়া পর্যন্ত সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতিই দেয়নি। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মুশাররফের ক্ষমতা দখলের পর সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু বাংলাদেশে সৌদি রাষ্ট্রদূত পাঠায়নি।

১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে জেনারেল জিয়াউর রহমান ইস্তাম্বুলে 'ওআইসি' নামক মুসলিম রাষ্ট্রসংস্থার সম্মেলনে যোগদানের পর সৌদি রাজধানী রিয়াদে বাদশাহ খালেদের সাথে দেখা করে বলেন, 'সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে। কিন্তু সৌদি দূতাবাস ঢাকায় না থাকায় বাংলাদেশি লোকদেরকে হজ্জের জন্য পাঠাতে বিরাট সমস্যা হচ্ছে। আমাদেরকে মিসরীয় দূতাবাসের মাধ্যমে হজ্জ যাত্রীদেরকে পাঠাতে বাধ্য হতে হচ্ছে।'

বাদশাহ খালেদ জবাবে বললেন, 'বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্র মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃত। আমরা বাংলাদেশকে মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চাই। তাই শাসনতন্ত্র থেকে ঐ দুটো ইসলামবিরোধী মতবাদ বাতিল করা হলে আমরা অবিলম্বে রাষ্ট্রদূত পাঠাব।'

এসব বিষয় আমার সরাসরি জানার সুযোগ হয়েছে। ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে হজ্জের পরপরই বাদশাহ ফায়সালের সাথে আমার সাক্ষাৎ ও ১৯৭৫ সালে বাদশাহ খালেদের

সাথে আমার সাক্ষাৎ এবং জেনারেল জিয়াউর রহমানের সাথে বাদশাহ খালেদের সাক্ষাতের খবর 'জীবনে যা দেখলাম'-এর বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

ঐসব সাক্ষাৎকারের বিবরণ

আমার লেখা 'জীবনে যা দেখলাম' নামক আত্মজীবনী গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ১৮ থেকে ২১ পৃষ্ঠায় বাদশাহ ফায়সালের সাথে আমার প্রথম একান্ত সাক্ষাতের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত। ৪র্থ খণ্ডের ১৭১ পৃষ্ঠায় বাদশাহ ফায়সালের সাথে আমার দ্বিতীয় সাক্ষাতের বিবরণ রয়েছে। ৫ম খণ্ডের ১৬ ও ১৭ পৃষ্ঠায় বাদশাহ খালেদের সাথে আমার সাক্ষাতের বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। ৫ম খণ্ডের ১০৪ পৃষ্ঠায় বাদশাহ খালেদের সাথে জেনারেল জিয়াউর রহমানের সাক্ষাতের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে।

১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রধান সামরিক শাসনকর্তা হিসেবে এক সামরিক ফরমানের (Proclamation) মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের পঞ্চম সংশোধনী করেন এবং গণভোটের মাধ্যমে এর অনুমোদন অর্জন করেন। এরপরই ঢাকায় সৌদি দূতাবাস কায়েম হয় এবং প্রথম সৌদি রাষ্ট্রদূত হিসেবে শায়খ ফুয়াদ আবদুল হামীদ আল খতীব নিয়োগ পান।

পঞ্চম সংশোধনীর কারণে 'ওআইসি'-তে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং মুসলিম বিশ্বে জিয়াউর রহমান অন্যতম নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পান।

দ্বিতীয় সুফল: পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠন নিষিদ্ধ করার ধারাটি বাতিল হওয়ায় মুসলিম লীগ, নেযামে ইসলাম পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী পুনর্বহাল হয় এবং পরবর্তীতে আরো অনেক ইসলামী দল সংগঠিত হয়।

আওয়ামী লীগ কী করতে চায়?

আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যদি, আল্লাহ্ না করুন জাতীয় সংসদে এমন সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, তাহলে যা যা করতে চায় তা নিম্নরূপ :

১. শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদকে বহাল করে ভারত ও পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের নিকট প্রিয় হতে চায় এবং বাংলাদেশে তাদের আজ্ঞাবহ সরকার কায়েম করতে চায়।

২. এরই জের হিসেবে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের ধারা বাতিল করে মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পরিচয় মুছে ফেলতে চায়। তারা তো জোর গলায়ই বলছেন যে, তারা মুসলিম দেশ বানানোর জন্য মুক্তিযুদ্ধ করেননি।

৩. তারা সকল ইসলামী দলকে বেআইনি ঘোষণা করবেন। তারা তো বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রতিটি সাক্ষাৎকারের সময়ই জোর দাবি জানিয়েছেন, যাতে কোনো ইসলামী দলকেই নিবন্ধিত হওয়ার সুযোগ না দেয় এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না দেয়।

৪. তারা ক্ষমতাসীন হলে ভারতের সকল দাবি পূরণ করে বাংলাদেশকে একটি করদ রাজ্যে পরিণত করবেন। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকবে না। ভারতের তাঁবেদার হয়েই থাকতে বাধ্য হবে।

৫. বিশ্বে বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশের মর্যাদা হারাবে। অথচ জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার কমপক্ষে শতকরা ৮৫ জন মুসলিম এবং বিশ্বের কমপক্ষে তৃতীয় বৃহত্তর দেশ হিসেবে বাংলাদেশ স্বীকৃত। বিশ্বে কোথাও এত ক্ষুদ্র দেশে এত বিরাট সংখ্যায় মুসলিম নেই।

আগামী নির্বাচনে এটা অন্যতম প্রধান নির্বাচনী ইস্যু হতে পারে

আগামী ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শাসনতন্ত্রকে ধর্মনিরপেক্ষ করার ইস্যুটিকে অন্যতম প্রধান নির্বাচনী ইস্যু হিসেবে তুলে ধরার ব্যবস্থা করে আওয়ামী লীগ বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ই দিয়েছে। আওয়ামী লীগের সাথে মহাজোটে শরীক হওয়ার জন্য জাতীয় পার্টির নেতা এরশাদ সাহেব সম্মত হবেন কি? তিনিই তো ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছেন? বিএনপির সাবেক নেতা ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও কর্নেল (অব.) অলি আহমদ কি এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের সাথে একমত হবেন? অবশ্য যারা ক্ষমতায় যাওয়ার লোভে কোনো নীতির ধার-ধারে না তাদের ব্যাপারে কিছুই নিশ্চিত করে বলা যায় না।

বর্তমান সরকার ও এর পেছনের শক্তির সমস্যা

বর্তমান সরকারকে শাসনতন্ত্রে শুধু জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়েছে, যা ৯০ দিনের মধ্যে সমাধা করার কথা। কিন্তু যেকোনো কারণেই হোক সরকার দু বছর ক্ষমতায় থাকার সিদ্ধান্ত নিজেরাই গ্রহণ করেছেন। একটি নির্বাচিত সরকারের মতোই দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তারা আইন প্রণয়ন করছেন।

শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র জাতীয় সংসদের। সংসদ অধিবেশন মুলতবি থাকলে সরকার প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে অর্ডিন্যান্স করে আইন রচনা করতে পারে। কিন্তু পরবর্তী সংসদ অধিবেশনে এর অনুমোদন নিতে হয়।

বর্তমান সরকার এ পর্যন্ত (২০ মাসে) ৮৭টি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে স্বেচ্ছাচারিভাবে যেসব আইন পাশ করিয়ে তা প্রয়োগ করেছে, এর মধ্যে ৫টি মাত্র নির্বাচনের সাথে সম্পর্কিত। সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইজীবীদের মধ্যে এ সরকারের আমলে বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার বিপক্ষে দুদকের মামলায় সরকারি এটর্নি জেনারেলদের বিরুদ্ধে আসামি পক্ষের আইনজীবী হিসেবে ব্যারিস্টার ড. রফীকুল হক আইনি লড়াই করে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন। তার মতে, ৮৭টি অর্ডিন্যান্সের মধ্যে উপরিউক্ত ৫টি বাদে আর সবগুলোই শাসনতন্ত্রবিরোধী ও অবৈধ।

তাই আগামী নির্বাচনে জাতীয় সংসদে এমন একটি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হওয়া অত্যাবশ্যক, যে দল সরকারের সকল অবৈধ আইন ও কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দান করতে সম্মত। তা না হলে সরকার ও পেছনের শক্তিধরদেরকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। এটাই এ সরকারের আসল সমস্যা।

এর সমাধান কী

বাংলাদেশে প্রধান দুটো রাজনৈতিক পক্ষের যেকোনো একটি পক্ষেরই আগামীতে সরকার গঠন করার কথা। এ সরকার যে পক্ষটি ক্ষমতায় বসালে ঐ উদ্দেশ্য সফল হওয়ার আশা করা যায়, সে পক্ষের নেত্রীকেই গত জুন মাসের (২০০৮) ১১ তারিখে নির্বাহী আদেশবলে তড়িঘড়ি করে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে চিকিৎসার অজুহাতে বিদেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। ঐ মহাসমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যেই শেখ হাসিনার সাথে সমঝোতা করা হয়।

এ সমাধান কতটুকু সফল হতে পারে এর একটি সফল রিহার্সাল হয়ে গেল গত আগস্ট মাসে। রাজনৈতিক অপরপক্ষকে নির্বাচন বর্জনে বাধ্য করে একতরফা নির্বাচন করে ৪টি মহানগর (কর্পোরেশন) ও ৯টি পৌরসভার (মিউনিলিপ্যালিটি) নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ হাসিনার দলকে একচেটিয়া বিজয়ী হওয়ার সুযোগ দান করা হয়।

বিদেশ থেকে শেখ হাসিনা পরম তৃপ্তির সাথে ঘোষণা করলেন, 'বিজয়ের এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।' প্রধান নির্বাচন কমিশনারের খুশি দেখে কে? তিনি তৃপ্তির ঢেকুর তুলে মন্তব্য করলেন, 'বাঃ কী চমৎকার নির্বাচন হয়ে গেল! প্রমাণ হয়ে গেল যে, জরুরি অবস্থার মধ্যেই সংসদ নির্বাচন করাও সম্ভব।'

আওয়ামী লীগ অনেক আগে থেকেই জোর গলায় বলে এসেছে যে, জরুরি অবস্থায় এ দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। কিন্তু সরকারের সাথে সমঝোতা হয়ে যাওয়ার কারণে বিজয়ের নিশ্চয়তা দেখে দলীয়ভাবেই এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করল। নির্বাচন কমিশন এ নির্বাচন দলীয়ভাবে করা যাবে না বলে ঘোষণা দিলেও শেষ পর্যন্ত কোনো আপত্তি করেনি।

যে দেশি ও বিদেশি মহল ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য যুক্তি প্রদর্শন করেছিল যে, সকল দলের অংশগ্রহণ করা ছাড়া নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, তাদের মধ্যেও একটি মহল আগামী ডিসেম্বরের নির্বাচনে অপর পক্ষ অংশগ্রহণ না করলেও নির্বাচন বৈধ হিসেবে গণ্য হবে বলে দাবি করছে।

সরকার ও এর তলগীবাহক নির্বাচন কমিশন জরুরি অবস্থা বহাল রেখেই তাদের সকল অবৈধ আইন ও কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দানে প্রতিশ্রুতিদাতা দলকে ক্ষমতাসীন করার মাধ্যমে তাদের প্রধান সমস্যার সমাধানের নিশ্চয়তাবোধ করতে লাগল।

শাসনতন্ত্রের অভিভাবকের ভূমিকায় সুপ্রিম কোর্ট

এ সরকার ও নির্বাচন কমিশনের কার্যকলাপ শাসনতন্ত্র লঙ্ঘনের পর্যায়ে পড়লে যেকোনো নাগরিক হাইকোর্টে মামলা দায়ের না করা পর্যন্ত কোর্ট নিজের পক্ষ থেকে সাধারণত, 'সুয়েমোটো' রায় দেয় না। কোর্ট নিরপেক্ষ। সরকারের পক্ষেও নয়, বিপক্ষেও নয়। তাই কোনো পক্ষ কোর্টের নিকট অভিযোগ করে মামলা দায়ের করলে কোর্ট রায় দেয়। শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে কোনো বিতর্ক দেখা দিলে চূড়ান্ত রায় দেওয়ার ক্ষমতা শাসনতন্ত্রই সুপ্রিম কোর্টকে দিয়েছে।

সর্বপ্রথম সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার মাসুদ রেযা সুবহান নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন যে, শাসনতন্ত্রে নির্বাচন কমিশনকে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব দিয়েছে। এ দায়িত্ব যথাসময়ে পালন না করায় নির্বাচন কমিশন শাসনতন্ত্র লঙ্ঘন করেছে কি না? ২০০৮ সালের ২২ মে হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে, শাসনতন্ত্র লঙ্ঘন করেছে। নির্বাচন কমিশন এ রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আবেদন না করায় এ রায় সুপ্রিম কোর্টের রায় হিসেবে গণ্য হয়ে গেল।

সরকার এক অর্ডিন্যান্স বলে নিকাহ্ রেজিস্ট্রার বা কাজী নিয়োগের পূর্ব-পদ্ধতি পরিবর্তন করে নতুন পদ্ধতি করতে চেয়েছিল। বাংলাদেশ কাজী সমিতির সভাপতি মাওলানা কাজী সৈয়দ শরীয়তুল্লাহ্ এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। ২০০৮ সালের ১৩ জুলাই হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে, এ সরকারের এ জাতীয় অর্ডিন্যান্স করার ইখতিয়ার নেই।

বেগম জিয়াকে এক বছর পর্যন্ত আটক করে রাখা সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই দাঁড় করাতে সরকার ব্যর্থ হওয়ায় হাইকোর্ট তাঁকে জামিনে মুক্ত করে দেয়। তাঁর মতো ব্যক্তিকে এভাবে গ্রেফতার করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। মামলা দায়ের করে অভিযোগ প্রমাণ করার পরও গ্রেফতার করা যেত। তিনি বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার লোকও নন। সরকার তাকে বিদেশে তাড়ানোর শত চেষ্টা করেও তাঁকে সম্মত করতে পারেনি। এমন একজন সম্মানিত নাগরিককে বিনা বিচারে আটক রাখার কোনো অধিকার সরকারের নেই। তাই তিনি জামিন পেয়ে জেল থেকে মুক্তি পেলেন। শাসনতন্ত্রে যে নাগরিক অধিকার রয়েছে, তা সংরক্ষণের দায়িত্বই হাইকোর্ট পালন করল।

আদালতের এ ভূমিকা সরকার ও আওয়ামী লীগকে মহাবিপদে ফেলল

শেখ হাসিনার সাথে সরকারের আঁতাত অনুযায়ী চার দলীয় জোটকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ না দিয়ে আওয়ামী লীগকে খালি ময়দানে গোল দিয়ে নির্বাচনে

বিজয়ী হওয়ার ব্যবস্থাটা বানচাল হয়ে গেল। বেগম জিয়া মুক্ত হওয়ার পর তাঁর নেতৃত্বে জোট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে যে আওয়ামী লীগ কিছুতেই নির্বাচনে বিজয়ী হতে পারবে না, তা উপলব্ধি করে শেখ হাসিনার বিচলিত হওয়ারই কথা। আর আওয়ামী লীগের হিসাব-নিকাশ উলটপালট হওয়ায় আবল-তাবল বকতে বাধ্য হয়েছে।

সরকারও মহাসংকটে পড়েছে। এ সংকট থেকে মুক্তির আশায়ই বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির অযৌক্তিক মামলা দিয়ে বেগম জিয়াকে আবার গ্রেফতার করার হীন ষড়যন্ত্রে সরকার লিপ্ত। মামলা করতে চায় করুক; কিন্তু গ্রেফতার হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে বেগম জিয়াকে হাইকোর্টে আবার জামিন চাইতে হবে।

সরকারের দরকষাকষি

সরকারের সাথে বেগম জিয়ার সংলাপের আসল বিষয় এটাই যে, বেগম জিয়া নির্বাচনে বিজয়ী হলে এ সরকারের যাবতীয় কার্যাবলিকে বৈধতা দেবেন কি না। যদি এ বিষয়ে সরকার নিশ্চয়তাবোধ না করে তাহলে বেগম জিয়াকে নির্বাচন বর্জন করতে বাধ্য করতে পারে। জেলে থাকাকালে যে সংলাপ চলেছে তার ফলাফল জানা যায়নি। সংলাপ হয়তো চলতে থাকবে।

রাজনৈতিক ক্ষমতা এমন এক বাঘ, যার পিঠে সওয়ার হওয়ার চেয়ে নিরাপদে নেমে আসা বেশি কঠিন। যারা শখ করে লাফিয়ে লাফিয়ে বাঘের পিঠে চড়ে বসলেন, তারা এখন নিরাপদে অবতরণের পথ পাচ্ছেন না।

সরকার যে পাতানো নির্বাচনের পরিকল্পনা করেছিল, তা অবাস্তব হয়ে গেল। এখন নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে বাধ্য হলে নিরাপদে বিদায় হওয়া যাবে কি না সরকার সে সমস্যারই সম্মুখীন।

আওয়ামী লীগ কি আবার নির্বাচন বাচনাল করতে চাইবে?

বিজয়ের নিশ্চয়তাবোধ না করায়ই আওয়ামী লীগ ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন বানচাল করার জন্য লগি-বৈঠার সন্ত্রাস সৃষ্টি করল। ২০০৮-এর ১৮ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এখনো বিজয়ের আশায় ময়দানে তৎপর। সরকার প্রশাসনকে আওয়ামীকরণের মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করতে চেষ্টা করতে পারে। ভোট গণনার সময় কারচুপি করতে পারলে তা সম্ভব হতেও পারে।

যদি শেষ পর্যন্ত নিশ্চয়তাবোধ না করে তাহলে আবার কোনো অঘটন ঘটিয়ে নির্বাচন বানচালের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সরকারেরও এমন কিছু একটার প্রয়োজনবোধ হতে পারে।

বেগম জিয়ার জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর শেখ হাসিনা আশঙ্কা প্রকাশ করলেন যে, সরকার বেগম জিয়াকে ক্ষমতায় বসাতে চেষ্টা করছে। তিনি আতংকিত হয়ে গেলেন।

শেখ হাসিনা বনাম বেগম জিয়া

দু নেত্রীর আইনজীবী ব্যারিস্টার ড. রফীকুল হক দু নেত্রীর সাথে বৈঠকের প্রস্তাব দিলে শেখ হাসিনা মন্তব্য করলেন, আমার সাথে বৈঠকে বসিয়ে তাকে আমার সমান মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। অর্থাৎ তিনি অপাঙ্‌ক্তের ছিলেন, তাকে এভাবে জাতে তোলার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। আরো বললেন যে, বেগম জিয়া কি এখন ধোয়া তুলসি পাতা? শেখ হাসিনা জানেন যে, তারই বিরুদ্ধে সরাসরি চাঁদাবাজির বেশ কয়টি মামলা রয়েছে। বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে সরাসরি দুর্নীতির কোনো অভিযোগ নেই। শেখ হাসিনা নিজেকে যত বড় বলে প্রকাশ করেন, তাতে যে তার ক্ষুদ্রত্বই প্রকাশ পায়, সে কথা বুঝার সাধ্যও তার নেই। তার এসব জঘন্য মন্তব্য সত্ত্বেও বেগম জিয়া কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে বড়ত্বেরই পরিচয় দিলেন। বেগম জিয়া শেখ হাসিনার অব্যাহত প্রগলভতা সত্ত্বেও তার সাথে বৈঠকে সম্মত হয়ে মহত্বের পরিচয়ও দিলেন।

নির্বাচন কি অনিশ্চিত?

১৮ ডিসেম্বর আর দু মাস মাত্র বাকি। রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন এখনো সম্পন্ন হয়নি। সরকার জরুরি অবস্থা বহাল রেখেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে জিদ ধরে আছে। চার দলীয় জোট জরুরি অবস্থায় নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

নির্বাচন কমিশন তাদের প্রণীত গণপ্রতিনিধিত্ব আইন আর সংশোধন না করার সংকল্প ব্যক্ত করেছে। অথচ এতে অনেক আপত্তিকর ও অপ্রয়োজনীয় ধারা রয়েছে বলে রাজনৈতিক দলসমূহ মনে করে। এসব বিষয় মীমাংসা কত দিনে হবে তা অনিশ্চিত। অথচ ডিসেম্বরে নির্বাচন না হলে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়বে।

এ সরকারের পক্ষে কোনো জনসমর্থন নেই। গণ-অভ্যুত্থানের ডাক দিলে জনগণ বিপুলভাবে সাড়া দেবে। সশস্ত্রবাহিনী তখন কোন্ পক্ষ নেবে? এসব জটিল দিক বিবেচনা করে সরকার যদি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে আন্তরিক হয় তাহলে দেশ, সরকার ও রাজনৈতিক দলের সকলেরই মঙ্গল।

৩৪৬.

গণতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক ঐক্য

স্বৈরশাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য রাজনৈতিক ঐক্য এ দেশে কয়েকবারই সফল হয়েছে। পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ূব খান ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সামরিক শাসন জারি করে শাসন ক্ষমতা দখল করেন এবং ১০ বছর স্বৈরশাসন চালু রাখতে সক্ষম হন। ১৯৬৪ সালে COP (Combined Opposition Parties) নামে ৫টি রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণতন্ত্র পুনর্বহালের আন্দোলন গড়ে তুলে। ১৯৬৭ সালে PDM (Pakistan Democratic Movement) নামে আবার ৫ দলীয় ঐক্যজোট সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তীতে ১৯৬৯ সালে PDM-এর পাঁচ দলের সাথে আরো তিনটি দল শরীক হলে ৮ দলীয় DAC (Democratic Action Committee) নামে সম্প্রসারিত রূপ লাভ করে। DAC-এর আন্দোলনের ফলে স্বৈরশাসক আইয়ূব খান ১৯৬৯-এর ফেব্রুয়ারিতে ক্ষমতা ত্যাগ করার ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়।

বাংলাদেশ আমলে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সেনাপ্রধান সামরিক আইন জারি করে ক্ষমতা দখল করেন এবং ৯ বছর স্বৈরশাসন চালিয়ে যান। বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী এক মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ না হয়েও যুগপৎ আন্দোলনের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনর্বহালের আন্দোলন চালাতে থাকে। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে ৬ তারিখ এ আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয় এবং স্বৈরশাসক এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

এভাবে দেখা যায় যে, রাজনৈতিক দলসমূহ যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করে তাহলে স্বৈরশাসন থেকে দেশকে মুক্ত করে গণতন্ত্র বহাল করা সম্ভব হয়।

ঐ দুটো আন্দোলনের সাফল্যের আসল কারণ

আইয়ূব খান ও এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্যের আসল কারণ– প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হলে, সেনাবাহিনী জনগণের বিরুদ্ধে স্বৈরশাসনের পক্ষ অবলম্বন করতে অস্বীকার করে। আইয়ূব খান ও এরশাদ সশস্ত্র বাহিনীকে স্বৈরশাসনের পক্ষে ব্যবহার করেই তাদের স্বৈরশাসন দীর্ঘ দিন চালু রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সশস্ত্রবাহিনী জনগণের ঐক্যের প্রতীক। তারা জনগণের বিরোধী নয়। তাদেরকে স্বৈরশাসকরা তাদের পক্ষে ব্যবহার করে ক্ষমতায় টিকে থাকে। কিন্তু যখনই জনগণ

ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়, তখন সশস্ত্রবাহিনী জনগণের বিরুদ্ধে স্বৈরশাসকের পক্ষ অবলম্বন করতে অস্বীকার করে। ১৯৬৯ সালে আইয়ূব খান ও ১৯৯০ সালে এরশাদকে ক্ষমতায় বহাল রাখার জন্য সেনাবাহিনী জনগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে সম্মত না হওয়ার কারণেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্য সম্ভব হয়েছে।

বর্তমান সরকার কি স্বৈরশাসক?

২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের দুটো প্রধান রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে একটি পক্ষ মহাজোট গঠন করে নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়ার পর বিজয়ের নিশ্চয়তাবোধ না করায় ঐ নির্বাচন বানচালের অপচেষ্টা চালায়। ঐ সময়কার দুর্বল সরকারের বিরুদ্ধে লগি-বৈঠা নিয়ে অবরোধের নামে চরম সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। আমেরিকা ও ইউরোপের রাষ্ট্রদূতগণ, এমনকি জাতিসংঘের স্থানীয় প্রতিনিধিত্ত জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের বিবৃতিকে বিকৃতভাবে ব্যবহার করে বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীকে নির্বাচন বন্ধ করতে বাধ্য করে। সর্বোচ্চ সেনা কর্মকর্তাগণ প্রেসিডেন্ট ড. ইয়াজ উদ্দীন আহম্মেদকে জরুরি আইন জারি করেও নির্বাচন প্রক্রিয়া বন্ধ করে নতুন একটি কেয়ারটেকার সরকার কায়েম করতে বাধ্য করেন।

শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের হাতে আইনগতভাবে সকল ক্ষমতা থাকলেও বাস্তবে সশস্ত্রবাহিনীই ক্ষমতা প্রয়োগ করে নতুন একটি সরকার কায়েম করার ব্যবস্থা করে। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী এ সরকারের মেয়াদ মাত্র ৯০ দিন। যদি ৯০ দিনের মধ্যে এ সরকার জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হতো তাহলে এ সরকারকে স্বৈরশাসক বলা যেত না। পূর্ণ দু বছর ক্ষমতায় থাকার সিদ্ধান্ত সশস্ত্রবাহিনী দিয়ে থাকতে পারে। যে-ই দিক আইনগতভাবে এ সরকারকে স্বৈরশাসক বলা ছাড়া উপায় নেই।

এ স্বৈরসরকারের বিরুদ্ধে কেন রাজনৈতিক দলের ঐক্য হচ্ছে না?

পূর্বের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে যেভাবে সকল রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনা করেছে, বর্তমান সরকার স্বৈরশাসক হওয়া সত্ত্বেও ঐ ধরনের ঐক্য কেন গড়ে উঠছে না? পূর্বের স্বৈরশাসকগণ কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সমঝোতা করে ক্ষমতা দখল করেননি। তারা সামরিক শক্তিবলে ক্ষমতা দখল করে সকল রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা চালিয়েছে। তাই রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় যাওয়ার পথ উন্মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য হয়েছে এবং ৯/১০ বছর দীর্ঘ আন্দোলনের পর স্বৈরশাসককে বিদায় নিতে বাধ্য করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রধান দুটো রাজনৈতিক শক্তির দুটো জোট রয়েছে। চার দলীয় জোট, আর অপরটি অনেক দলীয় মহাজোট। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোটের সন্ত্রাসী আন্দোলনের পরিণতিতেই বর্তমান স্বৈরসরকারের জন্ম। স্বয়ং শেখ হাসিনা এ সরকারকে তার আন্দোলনের ফসল বলে গৌরব প্রকাশ করেছেন এবং ক্ষমতায় গেলে এ সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে তিনি বৈধতা দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন।

এ বছরের (২০০৮) মাঝামাঝি সরকার হিসাব কষে দেখল যে, আগামী ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে এমন একটি রাজনৈতিক শক্তির জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা প্রয়োজন, যারা এ সরকারের সকল সংবিধানবিরোধী সিদ্ধান্তকে বৈধতা দান করবে বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। এ উদ্দেশ্যেই শেখ হাসিনার সাথে সমঝোতা করে তাকে নির্বাহী সিদ্ধান্তে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

২০০৮ সালের ৪ জুন চার দলীয় জোটনেত্রী আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে এ সরকারকে পরগাছা এবং সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণতন্ত্র বহাল করার আন্দোলনের ডাক দেন। বিএনপি'র মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ার হোসেন সরাসরি আওয়ামী লীগকে সম্বোধন করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে মন্তব্য করলেন, 'এটা আর হবে না যে আমরা আন্দোলন করব, আর অন্যেরা ক্ষমতায় বসবে।'

তার এ মন্তব্য থেকে বোঝা গেল যে, তিনি ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে স্বৈরশাসক এরশাদের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের পর ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিএনপির বিজয় ও আওয়ামী লীগের পরাজয়ের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তাই বিএনপিকে আবার বিজয়ী হওয়ার সুযোগ দিতে তারা সম্মত নন। উক্ত মন্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তারা যদি ক্ষমতায় যেতে না পারেন তাহলে তাদের জন্য গণতন্ত্র অর্থহীন। এ কথা কে না জানে যে, তাদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শ গণতন্ত্র নয়, একদলীয় বাকশাল। তাদের একমাত্র আদর্শ ক্ষমতায় যাওয়া ও কর্তৃত্ব হাসিল করা।

এ সরকার অত্যন্ত নিশ্চিন্ত আছে যে, তাদের বিরুদ্ধে সকল রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণ-অভ্যুত্থানের আন্দোলন করবে না। এ কারণেই এ সরকারের কোনো পেরেশানি নেই।

বর্তমান সংকট থেকে উদ্ধারের উপায় কী?

বর্তমানে (২০০৮ সালের অক্টোবর) দেশে একটি অসাংবিধানিক ও অনির্বাচিত সরকার রয়েছে, যারা আগামী ডিসেম্বরে জাতীয় সংসদের নির্বাচনের মাধ্যমে পরবর্তী সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নেওয়ার কথা। এ নির্বাচন যদি নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অবাধ হয়, তাহলে বর্তমান সংকটের অবসান হওয়ার আশা করা যায়।

কিন্তু নির্বাচন কতটুকু নিরপেক্ষ হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। বর্তমান সরকার ও নির্বাচন কমিশন প্রধান দুটো রাজনৈতিক শক্তির একটির প্রতি এত নগ্নভাবে পক্ষাপাতিত্ব করেছেন যে, তাদের নিকট থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা আশা করা অত্যন্ত কঠিন।

আগামী নির্বাচনে এমন একটি পক্ষের বিজয়ী হওয়া এ সরকারের প্রয়োজন, যে সরকার বর্তমান সরকারের যাবতীয় অসাংবিধানিক কার্যাবলিকে বৈধতা দিতে সম্মত। এ বিষয়ে যে রাজনৈতিক পক্ষকে সরকার নির্ভরযোগ্য মনে করবে, সে পক্ষকেই বিজয়ী করার চেষ্টা করতে পারে।

শেখ হাসিনা তো এ সরকার গঠনের পরপরই এর নিশ্চয়তা দিয়েছেন। ১৯ অক্টোবর (২০০৮) দৈনিক পত্রিকাসমূহে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের নামে এক বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে তিনি এ আশ্বাস দিয়েছেন যে, তার দল নির্বাচনে বিজয়ী হলে, এ সরকারের সকল কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দান করবে।

কিন্তু রাজনৈতিক অপরপক্ষ এ নিশ্চয়তা না দিলে নির্বাচনে তাদের বিজয়ী হওয়া সম্ভব হবে কি না সে কথা বলা যায় না।

নির্বাচনে পক্ষপাতিত্ব কি সম্ভব?

বর্তমান সরকার ও সরকারের পেছনের শক্তির জন্য আগামী নির্বাচনের ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর উপর সরকারের পরিচালকদের নিরাপত্তা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। নির্বাচনে যদি এমন সব শক্তি বিজয়ী হয়, যারা সরকারের সকল সিদ্ধান্তকে বৈধতা দেবে না বলে আশঙ্কাবোধ হয়, তাহলে তাদের বিজয় ঠেকানো ছাড়া সরকারের কোনো উপায় নেই।

অবশ্য এ কথা ঠিক যে, ভোট জনগণের হাতে এবং ফটোসহ ভোটার তালিকা তৈরি হওয়ায় ভোট জালিয়াতি সম্ভব নয়। কিন্তু ভোট গণনায় কারচুপি করার এমন অপকৌশল প্রয়োগ করা সম্ভব, যার ফলে চূড়ান্ত ফলাফল বদলে দেওয়া যেতে পারে।

এ নাজুক পরিস্থিতিতে উভয় রাজনৈতিক শক্তিকেই সরকারকে এ নিশ্চয়তা দেওয়া ছাড়া উপায় নেই যে, নির্বাচনের পর যে দলই ক্ষমতায় আসুক, তাদেরকে এ সরকারের সকল কর্মকাণ্ডকেই বৈধতা দিতে হবে। তা না হলে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নির্বাচনের আশা কিছুতেই করা যায় না।

আত্মরক্ষার জন্য মানুষ সবই করতে পারে। নীতি-নৈতিকতার কোনো বালাই থাকে না। এ সরকারকে নিরাপদ প্রস্থানের নিশ্চয়তা দেওয়া ছাড়া নিরপেক্ষ নির্বাচন আশা করা অসম্ভব।

বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির দুর্বলতা

বর্তমান সরকারের এ পর্যন্তকার যাবতীয় কার্যাবলি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, তারা বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তিকে দাবিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ধর্মনিরপেক্ষবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করে জনগণের নিকট ধিকৃত হয়েছে। জনগণ শতকরা কতজন কোন্ শক্তির পক্ষে, তা ২০০১ সালের নির্বাচনে প্রমাণিত হয়েছে। এ সরকারের আমলে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক।

বর্তমান স্বৈরসরকারের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের ডাক দিলে বিপুল সাড়া অবশ্যই পাওয়া যাবে। কিন্তু বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির বিশুদ্ধ দেশপ্রেম এ জাতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করতে দেয় না। সরকার দেশপ্রেমিক সশস্ত্রবাহিনীর সমর্থিত হওয়ায় ঐ ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতার সুযোগ নেই। জনগণ ও সশস্ত্রবাহিনীকে মুখোমুখী দাঁড় করার চিন্তাও করা চলে না। দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পক্ষ জানে যে, বিরোধী রাজনৈতিক পক্ষ প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় দেশে গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে ক্ষমতা দখল করতে তৎপর হবে।

এ পরিস্থিতিতে এ সরকারের নগ্ন পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও সরকারের সাথে সংঘর্ষের পথ পরিহার করতে বাধ্য হতে হচ্ছে। এ পক্ষের এ দুর্বলতার কারণেই সরকার অযৌক্তিকভাবে কয়েকটি ইস্যুতে জিদ ধরে আছে।

জরুরি আইন বহাল রাখার ইস্যু

১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে দেশি ও বিদেশি সকল পর্যবেক্ষক মহল স্বীকৃতি দিয়েছে। এসব নির্বাচনের সময় জরুরি অবস্থা জারি করতে হয়নি। এ সত্ত্বেও আগামী নির্বাচনের সময় জরুরি অবস্থা বহাল রাখার ব্যাপারে সরকার জিদ ধরে আছে। এতে আন্তরিকতার কোনো প্রমাণ মিলে না। জরুরি অবস্থার খড়গ মাথার উপর ধরে রেখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাকে অবাধ আখ্যা দেওয়া হাস্যকর। অবাধ ও সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হলে জরুরি আইন অবশ্যই প্রত্যাহার করতে হবে। এ বিষয়ে সরকারের জিদ ধরে থাকা সুলক্ষণ নয়।

জরুরি আইন বহাল থাকলে সরকার ছাড়া আর কোনো মহলের পক্ষে নিরাপদ বোধ করা সম্ভব নয়। যেকোনো অজুহাতে ঐ আইন প্রয়োগ করে কোনো এক পক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করা সহজেই সম্ভব। তাই এ জিদ ধরে থাকলে নির্বাচন অবাধ বলে দাবি করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

জাতীয় পার্টি ছাড়া বড়-ছোট সকল রাজনৈতিক দলই জরুরি আইন প্রত্যাহার করার দাবি অব্যাহতভাবে জানিয়ে আসছে। অবশ্য আওয়ামী লীগ স্থানীয় সরকার নির্বাচনে একতরফা বিজয়ের লোভে জরুরি অবস্থায়ই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। তারা একই কারণে জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও জরুরি অবস্থায়ই অংশগ্রহণ করতে পারে।

উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানে অযৌক্তিক জিদ কেন?

রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়নি যে, এ সরকারকেই উপজেলা নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। শাসনতন্ত্র তাদেরকে শুধু জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব দিয়েছে। সকল দলের আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে সরকার জিদ ধরেই আছে যে, তারা উপজেলা নির্বাচন করবেই। সংসদ নির্বাচনের আগেই উপজেলা নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে বাধ্য হয়ে সংসদ নির্বাচন আগে সমাধা করতে হচ্ছে। কিন্তু জিদ বজায় রাখার জন্য ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বেই সরকার উপজেলা নির্বাচন করতে বদ্ধপরিকর।

দেশ ও জাতির কল্যাণের ঠিকাদার সাজা মোটেই মানায় না। এ সরকার অগণিত স্বেচ্ছাচার করেছে। যে উদ্দেশ্যে তারা সংসদ নির্বাচনের পূর্বে উপজেলা নির্বাচন করতে চেয়েছিল, সংসদ নির্বাচনের পর তো সে উদ্দেশ্য থাকে না। তাহলে অহেতুক এ জিদ কেন? আপনারা সংসদ নির্বাচন করে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেশকে রেহাই দিন। স্বেচ্ছাচারিতা অব্যাহত না রেখে উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পরবর্তী সরকারের জন্যই ছেড়ে দিন। এ জিদ বহাল রাখা হলে সংসদ নির্বাচন নিরপেক্ষ না হওয়ার আশঙ্কা আরো বৃদ্ধি পাবে।

রাজনৈতিক দলের রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধন জরুরি কেন?

নির্বাচন কমিশন জিদ ধরেছে যে, তাদের শর্তাবলি মেনে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধিত হতে হবে। তারা অনেক আজব ধরনের শর্তারোপ করেছিল। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে দরকষাকষির পর কতক শর্ত শিথিল করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সকল দলকেই বাধ্য হতে হয়েছে নিবন্ধিত হওয়ার জন্য।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এ. কে. শামসুল হুদা আওয়ামী লীগের সাথে সংলাপে যেরূপ আবেগাপ্লুত হয়ে তাদের গুণগান করলেন এবং বিএনপিকে যে রকম নগ্নভাবে দাবিয়ে রাখার অপচেষ্টা চালালেন, তাতে তাকে অপসারণ করার জন্য তীব্র আন্দোলন হওয়া স্বাভাবিক ছিল। এর পূর্বের প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এমএ আজিজ কোনো দলের প্রতি সামান্য পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন না করা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ অত্যন্ত জঘন্য ভাষায় গালিগালাজ করে তাকে অপসারণের জন্য সন্ত্রাসী আন্দোলন চালিয়েছে।

বিএনপি আওয়ামী লীগের মতো আচরণ তো দূরের কথা প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ দাবি পর্যন্ত করেনি। বিএনপি জানে যে, নির্বাচন কমিশন এমন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, যার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন করা চলে না। তাই বিএনপি এ নির্বাচন কমিশনের পরিচালনায়ই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের ব্যাপারে অনমনীয়ভাবে জিদ ধরায় বিএনপি ও চার দলীয় জোটের শরীক দলগুলো নিবন্ধিত হতে সম্মত হয়েছে।

বাংলাদেশে নাকি শ' দুয়েক রাজনৈতিক দল আছে। কিন্তু ২০০১ সালের নির্বাচনে মাত্র ৪টি দলের উল্লেখযোগ্য এমপি নির্বাচিত হন। একটি মাত্র আসনে নির্বাচিত হয়ে কয়েকটি দল সংসদে ছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, রাজনৈতিক দল হিসেবে কোন দল টিকে থাকবে ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের যোগ্য এ ব্যাপারে ভোটাররাই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। নিবন্ধনের উদ্দেশ্য এভাবেই সফল হতে পারে। তবুও নির্বাচন কমিশন জিদ ধরে নিবন্ধনের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছে।

বিগত তিনটি নির্বাচনের মতো প্রতি পাঁচ বছর পরপর নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে থাকলে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ভোটাররাই নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হতো। ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন না হওয়ায় নতুন আরো কয়েকটি দলের সৃষ্টি হয়েছে।

অবশ্য রাজনৈতিক দলের নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধিত হওয়ার শর্তারোপ করায় কমিশনের একটা সুবিধা হবে। নির্বাচনে প্রার্থী দাঁড় করানোর যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও নামসর্বস্ব অনেক দল দু-একজন প্রার্থী দাঁড় করিয়ে বিরাট সংখ্যায় ব্যালট পেপারে প্রার্থী ও প্রতীক চাপাতে বাধ্য করে। এখন নিবন্ধিত হওয়ার শর্ত পূরণে অক্ষম দলগুলো নির্বাচনে অংশ না নিলে নির্বাচন কমিশনের কাজ হালকা হয়ে যাবে।

চার্টার অব ন্যাশনাল ইউনিটির ইস্যু

২০০৮ সালের ১২ মে প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে রাজনৈতিক দলসমূহকে একটি জাতীয় ঐক্য সনদে (Charter of National Unity) স্বাক্ষর করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

এর যে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়, তাতে তিনি আর এ বিষয়ে প্রচেষ্টা চালাননি বলে কোনো তিক্ততা সৃষ্টি হয়নি।

যদি উপজেলা নির্বাচনের ব্যাপারেও সরকার নমনীয় হয় তাহলে এ বিষয়েও তিক্ততা সৃষ্টি হবে না।

আশা করি, সরকার অহেতুক সমস্যা বৃদ্ধি না করে সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করে নিরাপদে প্রস্থান করার পথ সুগম করবেন। নির্বাচনের পর তো ডিসেম্বরের মধ্যেই নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করবে। উপজেলা নির্বাচনের ঝামেলা না করে বিদায় হওয়াটা কি তাদের জন্য মঙ্গলজনক নয়?

৩৪৭.

সৌদি আরব সফর

২০০৭-এর নভেম্বর থেকে ১০ মাস দৈনিক সংগ্রামে এ লেখা প্রকাশিত না হওয়ায় এ সময়কার ঘটনাবলি লেখা হয়নি। আগস্ট মাসে যখন পুনরায় লেখা শুরু হয়, তখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে লিখতে হলো। এখন পূর্বের ঘটনাবলি লিখছি।

২০০৮ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি সস্ত্রীক সৌদি আরব যাই। সেখানের আসল আকর্ষণ হলো মক্কা ও মদীনা শরীফ। উপলক্ষ হলো, বড় ছেলে মামুনের বাসায় বেড়াতে যাওয়া। সে জেদ্দায় থাকে। এপ্রিলের ২ তারিখ ঢাকা ফিরে এলাম।

সৌদি আরবে কয়েক লাখ বাংলাদেশি কর্মরত আছেন। বাংলাদেশ থেকে কোনো ইসলামী ব্যক্তিত্ব সফরে গেলে প্রবাসী বাংলাদেশিরা তাদের কাছ থেকে দীন সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে ছোট ছোট সমাবেশ করেন। সেখানে একটি সরকারি দাওয়াহ সংস্থা আছে, যার নাম 'জমিয়তে খাইরিয়্যাহ'। বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ওয়ায়েয ও মুফাসসির মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী যখনই সৌদি আরব সফর করেন, তখনই এ সরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বাংলাদেশি প্রবাসীদের জন্য বিরাট বিরাট মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মক্কা, মদীনা, জেদ্দা, রিয়াদ, তায়েফ এবং আরো অনেক এলাকায় তাকে মাহফিলে ওয়ায করতে হয়। মাওলানার বক্তৃতা সিডি করে প্রচার করার জন্যও ঐ সংস্থা ব্যবস্থা করে থাকে। তিনি বাংলাদেশে যেমন জনপ্রিয়, বিদেশেও বাংলাদেশিদের নিকট সমানভাবে প্রিয়।

আমি জাতে ওয়ায়েয নই এবং ঐ সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট পরিচিতও নই। সরকারিভাবে ছাড়া এ রকম বড় জনসমাবেশ সে দেশে হয় না। আমাকে যারা ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন, তারা আমার নিকট সময় দাবি করলে ছোট ছোট বৈঠকে উপস্থিত হই। আমি শুধু মক্কা, মদীনা, জেদ্দা ও রিয়াদে গিয়েছি। অন্যান্য স্থানে নিতে চেয়েছে; আমি স্বাস্থ্যগত কারণে যেতে সম্মত হইনি। জেদ্দায় বেশি দিন থাকায় সেখানেই বেশি সংখ্যায় প্রোগ্রাম হয়েছে।

জেদ্দায় তো আমার অবস্থানই ছিল। মক্কা ও মদীনা শরীফে প্রোগ্রামের উদ্দেশ্যে যাইনি। যিয়ারতের উদ্দেশ্যেই গিয়েছি। দীনী ভাইয়েরা ঢেঁকি থেকে কিছু কাজ আদায় করে নিয়েছেন। কিন্তু রিয়াদে যাওয়ার আমার কোনো প্রয়োজন ছিল না এবং সফর কষ্টদায়ক বলে আমি যেতে ইচ্ছুকও ছিলাম না। রিয়াদের ভাইয়েরা আমার কোনো ওযরই কবুল করলেন না। রিয়াদে একটানা আট দিন থাকতে হয়।

মক্কা-মদীনায় অবস্থান

২০০৭ সালের মার্চ-এপ্রিলে মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফে তৃপ্তিসহকারে বেশি দিন অবস্থান করা সম্ভব হয়নি। মদীনা শরীফে তো শেষবার ১৯ ঘণ্টার বেশি থাকা হয়নি। এ অতৃপ্তিবোধের কারণেই এবার (২০০৮) একটানা আট দিন (শুক্রবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত) থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। আল্লাহর রহমতে মক্কা শরীফে দুবার আট দিন করে অবস্থান করার সৌভাগ্য হলো। মদীনা শরীফে একবার আট দিন অত্যন্ত তৃপ্তিসহকারে ছিলাম।

কাবা শরীফের আকর্ষণ সম্পর্কে ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এটা আবেগ ও অনুভূতির বিষয়। যারা একবার দেখেছে, তারা স্মৃতিতে আজীবন তা অনুভব করে। আল্লাহর প্রেমে পাগল হলেই কাবা শরীফের চারপাশে ঘুরে স্বাদ অনুভব করে। আল্লাহকে তো ধরা-ছোঁয়া যায় না। কাবা ঘরের চৌকাঠ ধরে আল্লাহর দুয়ারে ধরনা দিতে পারলে অন্তরে পরম প্রশান্তিবোধ করা যায়। তাই হাজরে আসওয়াদ ও চৌকাঠ পর্যন্ত জায়গাটুকু, যা 'মুলতাযিম' (অর্থাৎ জাপটে ধরার স্থান) নামে পরিচিত, সেখানে আল্লাহ প্রেমিকদের প্রচণ্ড ভিড় লেগেই থাকে। দুর্বল দেহের লোকের পক্ষে কাবা শরীফের দেয়ালে বুক লাগিয়ে এবং চৌকাঠ ধরে কাতর ফরিয়াদ জানানোর সাধ্য নেই। গভীর রাতে ভিড় কিছুটা কম থাকলে তাদের পক্ষে পৌঁছা সম্ভব। আমার মতো বৃদ্ধের পক্ষে গভীর রাত ছাড়া সুযোগ পাওয়া সম্ভব নয় বলে তাহাজ্জুদের সময় শুরু হওয়ার পূর্বেই যেতে হলো। তখনো দুজন যুবক দীনী ভাইয়ের সাহায্য নিতে হয়েছে।

প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের এবং জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্য আল্লাহর দুয়ারে ধরনা দেওয়াই এবার আসল টারগেট ছিল। ২০০৭ সালের জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক চরম অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে তা নজিরবিহীন।

বাংলাদেশে অনেকবার অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হলেও কেটে উঠতে এত দীর্ঘ সময় লাগেনি। অনিশ্চয়তা যে অস্থিরতার জন্ম দেয় তা জনগণের জন্য অসহনীয়। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হওয়া সত্ত্বেও অনিশ্চয়তা এখনো কাটেনি। নির্বাচন কতটুকু অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে, তা নিয়ে সংশয় থাকা স্বাভাবিক। কারণ, যাদের হাতে বর্তমানে ক্ষমতা রয়েছে, তাদের নিরাপত্তা এ নির্বাচনের ফলাফলের উপর নির্ভর করে। তারা যে রকম ফলাফল কামনা করেন তা অত্যন্ত স্পষ্ট। তাহলে এ কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালানোই স্বাভাবিক। ইতঃপূর্বে যে তিনটি কেয়ারটেকার সরকার ছিল, তাদের এ জাতীয় কোনো কামনা ছিল না। এসব জটিল বিষয়ের কারণেই দেশ যে অনিশ্চয়তার অন্ধকারে নিমজ্জিত তা থেকে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে যেন মুক্তি পায়– এটাই ছিল কাবা শরীফের দুয়ারে আমার ধরনা দেওয়ার উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ সম্পর্কে আমি ইতঃপূর্বে কখনো এতটা পেরেশানিবোধ করিনি।

একা কোথাও যেতে পারি না

আমার সাইয়েটিকা রোগের কারণে একা একা হেঁটে কোথাও যাওয়া নিরাপদ মনে করি না। ঢাকায় মসজিদে যেতেও একা যাই না। ডান হাতে ক্র্যাচ্ ব্যবহার করি, আর বাঁ হাতে একজনের কাঁধে ধরি। মক্কা শরীফে আমার বাঁ হাত কাঁধে রাখার জন্য কোনো লোক সাথে নিয়ে যেতে পারিনি। আবদুল বাকী নামে একজন বাংলাদেশি যুবক আলেম এ বিরাট খেদমত করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করলেন। কাবা শরীফে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করার জন্য তিনি আমাকে হোটেল থেকে নিতে আসতেন। তিনিই আমাকে যোহর, আসর ও মাগরিবেও হারাম শরীফে নিয়ে যেতেন। মাগরিবে গিয়ে ইশার নামায শেষে হোটেলে ফিরে যেতাম।

ফজরের নামাযে ইমাম মাকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়েই ইমামতি করেন। ইমামের ঠিক পেছনে প্রথম কাতারে সরকারি নিরাপত্তা বাহিনীর লোক দাঁড়ায়। দ্বিতীয় কাতারে সাধারণ মুসল্লিদের জন্য উন্মুক্ত থাকলেও স্থানীয় কতক শায়খ দখল করে রাখে। সেখানে যাতে স্থান পাওয়া যায়, সেজন্য কয়েকজন বিশেষ করে জনাব আবুল হুসাইন ও জনাব নূরুদ্দীন ঐ জায়গা দখল করে রাখতেন। ইবরাহীমে সাবেক এমপি মুরাদনগরের জনপ্রিয় নেতা কাযী শাহ মুফাযযল হোসাইন কায়কোবাদের সাথে প্রায়ই সেখানে দেখা হতো। একদিন শেষ রাতে হঠাৎ শীত বেড়ে গেল, শীতের তীব্রতা ঠেকাতে জায়নামায গায়ে দিতে বাধ্য হলাম। কায়কোবাদ সাহেব তাঁর গরম টুপিটা আমাকে পরিয়ে দিলেন, যা কান পর্যন্ত ঢেকে দেয়। আবুল হোসাইন সাহেব তাঁর গায়ের সুয়েটার খুলে আমাকে পরিয়ে দিলেন। এত ঠাণ্ডা লাগবে আমার ধারণা ছিল না। আমি ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ার আশঙ্কা করেছিলাম। দীনী ভাইদের সহযোগিতার ফলে আল্লাহর রহমতে রক্ষা পেলাম।

মদীনা শরীফে যে হোটেলে ছিলাম, সেখান থেকে হারাম শরীফে পৌছতে অনেকখানি হাঁটতে হতো। রাস্তা থেকে মসজিদের বিরাট চত্বর পার হয়ে গেটে পৌছতে হয়। ভেতরেও বিশাল মসজিদের দীর্ঘ পথ পার হয়ে রওযাতুল জান্নাতে পৌছতে অনেক সময় লাগে। আমার পক্ষে ক্র্যাচে ভর দিয়ে এবং একজনের কাঁধে হাত রেখেও এতটা পথ হাঁটা খুবই কষ্টকর মনে হতো। হোটেলের হুইল চেয়ার ব্যবহার করার সুযোগ থাকায় আমি হাঁটার কষ্ট থেকে বেঁচে গেলাম। কিন্তু হুইল চেয়ার ঠেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো ভাড়াটে লোক সেখানে পাওয়া যায় না। কুমিল্লা জেলার ধামতীর জনাব মুহাম্মদ ইয়াসীন আট দিন আমাকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে হারাম শরীফে নিয়ে যেতেন ও আবার হোটেলে ফিরিয়ে আনতেন। শেষ রাতে এবং অন্যান্য সকল নামাযে তিনি এ বিরাট খেদমত করতেন। তিনি মধ্যবয়সী হওয়ায় আমি সংকোচবোধ করতাম। মাঝে যুবক বয়সের হারুনুর রশীদও এ খেদমত করতেন।

কুমিল্লার হারুনুর রশীদ ও মাওলানা আবদুশ শহীদের যে খেদমত আমার সবচেয়ে বড় মনে হয়েছে, তা হলো শেষ রাতে রওযাতুল জান্নাতে আমার জন্য পছন্দনীয় এলাকায় আগে এসে জায়গা দখল করে রাখা। মদীনার মসজিদে ঐ এলাকায় নামায আদায় ও আল্লাহর দুয়ারে ধরনা দেওয়ার জন্য সারা বছরই প্রচণ্ড ভীড় থাকে। মক্কা ও মদীনা শরীফে যারা আমার খেদমত করেছেন তাদের জন্য সেখানে তো দু'আ করেছি, এখনো তাঁদের কথা মনে হলে অন্তর থেকে দু'আ আসে। তাঁরা যে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে দু'আ চেয়েছেন সে ফরমায়েশ মোতাবেকই দু'আ করেছি।

জেদ্দায় তো আমার ছেলের বাসায়ই ছিলাম। মক্কা, মদীনা ও রিয়াদে হোটেলে থাকলেও নাস্তা ও দু বেলার খাবার কখনো হোটেলে খেতে হয়নি। দীনী ভাইদের বাসা থেকে বাংলাদেশি মজাদার খাবার হোটেলে বসেই খেয়েছি। দীনের ভিত্তিতে সম্পর্কটা যে নিকটাত্মীয় থেকেও নিবিড়, তা যে দেশেই গিয়েছি সেখানেই অনুভব করেছি।

আমাদের বংশে সবারই প্রমোশন হয়ে গেল

জেদ্দায় আমার অবস্থানকালেই ২২ মার্চ (২০০৮) লন্ডন থেকে খবর এল যে, আমার বড় নাতি নাবিলের ছেলে জন্মগ্রহণ করেছে এবং আমার বড় ছেলে মামুন দাদার পরিজশনে উন্নীত হয়েছে।

'জীবনে যা দেখলাম' প্রথম খণ্ডের ৬০ থেকে ৬৫ পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় খণ্ডের ২৬৬ পৃষ্ঠা থেকে ২৮৮ পৃষ্ঠা এবং সপ্তম খণ্ডের ২২২ পৃষ্ঠা থেকে ২২৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আমাদের বংশ সম্পর্কে লেখা হয়েছে।

এখানে এটুকু কথা পুনরুল্লেখ করছি যে, আমার দাদার পূর্বে ৭ পুরুষ পর্যন্ত প্রতি জেনারেশনে একজন করে মাত্র পুরুষ থাকায় আমাদের বংশ বৃদ্ধি পায়নি। দাদার পর থেকেই বংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দাদা মাওলানা আবদুস সুবহানের বংশ পরিচয় নামের পুস্তিকায় বংশ বৃদ্ধির বিস্তারিত বিবরণ লিখেছি। এতে দেখা যায় যে, ২০০৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দাদার বংশের জীবিত ও মৃত সদস্যদের মোট সংখ্যা ১৭৫ জন। এর মধ্যে ৩৫ জন বিবাহসূত্রে স্ত্রী হিসেবে বংশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এদেরকে গণনার বাইরে রাখলে সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪০ জন। বংশের ৫৬ জন বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে– ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা ও পাকিস্তানে। আমার নাতির ছেলে এক হিসেবে ১৭৬তম ও আরেক হিসেবে ১৪১তম সদস্য।

এ বইটির লেখায় আমাদের বংশের প্রবাসীরা খুব খুশি হয়েছে। ওরা ওদের সন্তানদেরকে ঐ বই পড়ে শোনায়। এ বই থেকে বংশের সবার নাম জানতে পারায়, বংশের সবার নিকটই বইটি জনপ্রিয়।

ঘটনাক্রমে দাদার সন্তানদের মধ্যে আমার আব্বা প্রথম। আমার আব্বা ও চাচাদের সন্তানদের মধ্যে আমি সবার বড়। আমার ও আমার চাচাত ভাইদের সন্তানদের মধ্যে আমার বড় ছেলে সবার বড়। এর পরের প্রজন্মে আমার বড় নাতি নাবীল প্রথম। দাদার বংশের ৫ম প্রজন্ম শুরু হলো নাবীলের ছেলেকে দিয়ে।

এ ছেলের মা ডা. নাসরীনের দাবি ছিল, যেকোনো নবীর নামে এর নাম রাখতে হবে। সে হযরত ঈসা (আ)-এর নাম বাছাই করল। আমি বললাম যে, এমন কোনো নবীর নামে নাম রাখ, যার যুগে দীন বিজয়ী হয়েছে। আমাকে যে নাম বাছাই করতে বলল, আমি হযরত দাঊদ (আ)-এর নাম বললাম। কিন্তু এ নাম এ ছেলের এক আপন খালাত ভাইয়ের হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সুলাইমান রাখা হলো।

সুলাইমানকে লেখা আমার চিঠি

এর জন্মের ৭ম দিন জেদ্দায় আকীকা করা হলো। ঐ তারিখেই আমিই সুলাইমান বিন নাবীলকে ইংরেজিতে এক আবেগময় চিঠি দিলাম। নাবীল চিঠিটাকে ঐতিহাসিক গুরুত্ব দিয়ে হেফাযত করে রেখেছে, যাতে ছেলেটি এ চিঠি পড়ে বুঝবার বয়স হলে পড়ে মজা নিতে পারে।

এখানে আমার আত্মজীবনীতে রেকর্ড রাখার উদ্দেশ্যে চিঠির প্রথম থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

Dearest Sulaiman Bin Nabeel,

Hearty wellcome to you happy arrival. To-day is your 7th day with us and we are enjoying Aqiqa party for you, organized by your grandpa in Jeddah.

You birth is a matter of most pleasant joy for all members of our dynasty of 176 members of whom you are the youngest.

Your happen to be leader of the 5th generation of Mowlana Abdus Subhan dynasty, your father being the leader of the 4rth generation, your grandpa 3rd, your great grandpa 2nd and your great grandpa 1st generation.

Your happy arrival has caused the promotion of all member of the vast family. Myself have been promoted to great grand father, our sons to grand father, our daughter-in-law to great mothers, our grandsons to uncles and ground daughter to aunties. It is virtually a grant revolution in our dynasty.

You are placed in a coveted position of deep affection from the whole dynasty. We pray for your speedy growth and long pious life with exceptional qualities of head and heart.

চিঠির অনুবাদ

প্রিয় সুলাইমান বিন নাবীল,

তোমার আনন্দময় আগমনে তোমাকে জানাই আন্তরিক খোশ-আমদেদ। আজকে সপ্তম দিন হলো তুমি আমাদের সাথে আছো। আজ তোমার দাদার আয়োজন করা তোমার আকীকা উৎসব উপভোগ করছি আমরা।

আমাদের বংশের ১৭৬ জন সদস্যের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ সদস্য তুমি। তোমার জন্ম আমাদের জন্য অত্যন্ত সুখকর ও আনন্দের।

ঘটনাক্রমে মাওলানা আব্দুস সুবহান এর ৫ম প্রজন্মের তুমি নেতা, তোমার আব্বা ৪র্থ প্রজন্মের নেতা, তোমার দাদা ৩য় প্রজন্মের, তোমার দাদার আব্বা ২য় প্রজন্মের এবং তোমার দাদার দাদা ১ম প্রজন্মের নেতা।

তোমার আগমন এ বিরাট বংশের সকল সদস্যের প্রমোশন ঘটিয়েছে। আমি হয়েছি বড় আব্বা, আমার ছেলেরা হয়েছে দাদা, আমার ছেলেদের স্ত্রীরা হয়েছে দাদী, নাতিরা হয়েছে চাচা, নাতনীরা হয়েছে ফুফু। এ ঘটনা বাস্তবে একটা বড় বিপ্লব ঘটিয়েছে আমাদের বংশে। পুরো বংশের মধ্যে তোমার স্থান গভীর ভালোবাসার। আমরা তোমার দ্রুততর শারীরিক বিকাশ এবং মন ও মননের বিশেষ গুণাবলিসহ দীর্ঘ নেক হায়াত কামনা করি।

আমার দাদার ৮০ বছর বয়সে ইন্তেকালের সময় আমি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। আমার আববার ৭৮ বছর বয়সে ইন্তেকালের সময় তাঁর বড় নাতি, আমার বড় সন্তান মামুন আইএ পাস করল। আল্লাহ তাআলা আমাকে নাতির ঘরে পুতি বা পৌত্র দেখার সৌভাগ্য দিলেন। আমি এখন এক কুড়ি নাতি-নাতনীর দাদা ও এক পুতীর বড় বাপ বা বড় আব্বা। উর্দুতে বলে পরদাদা।

একান্ত আপনজনকে হারালাম

রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলাস্থ পাকুরিয়া শরীফের পীর হিসেবে খ্যাত শাহ মুহাম্মদ রূহুল ইসলাম ২০০৮ সালের ১৮ মে ফজরের নামাযের সময় তাঁর তৃতীয় জামাতা ডাক্তার মেজর (অব.) আমীনের ঢাকার সিদ্ধেশ্বরীস্থ বাসায় ইন্তিকাল করেন।

দুদিন আগে অসুস্থতা নিয়েই সস্ত্রীক ঢাকায় আসেন। ১৬ মে আমার মগবাজারস্থ বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে আসলে দেখা হবে বলে অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু অসুস্থতা বোধ করায় আসেননি। সাইয়েটিকা বেড়ে যাওয়ায় আমি মসজিদেও যেতে সক্ষম হইনি। তাই আমি গিয়ে দেখা করতে পারলাম না। এসিডিটি ও গ্যাসের

কারণে শেষ রাতে অস্থিরতা বেড়ে গেলে তাঁর ডাক্তার জামাতা ইনজেকশন দিলে সুস্থবোধ করেন। আবার অস্থিরতাবোধ করলে হাসপাতাল থেকে এম্বুলেন্স ডাকা হলো। ফজরের নামায পড়ে নিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই হার্ট ফেল করে দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিলেন। এক ওয়াক্তের নামাযও কাযা হয়নি। কী ভাগ্যবান!

দুঃখের বিষয় আমার ফোন খারাপ থাকায় খবর পেতে দু ঘণ্টা দেরি হলো। অথচ হেঁটে গেলে জামাতার বাসা আমার বাড়ি থেকে মাত্র ৭/৮ মিনিটের পথ। কোনো রকমে এক হাতে ক্রাচ এবং অপর হাতে একজনের কাঁধে ধরে গাড়িতে বসে গেলাম। লিফটে ১২ তালায় উঠে যে কামরায় লাশ রাখা হয়েছে সেখানে কোনো রকমে পৌছলাম। তাঁর মেজো মেয়ে মুকাররামা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'খালুজি! এই দেখুন আপনার ছাত্র।' দেখে মনে হলো ঘুমিয়ে আছে। এত মায়া লাগল যে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কপালে চুমু দিলাম। কামরায় ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মহিলারা কান্নারত থাকায় বিলম্ব না করে বের হয়ে গেলাম। জামাতা আমাকে নিয়ে পুরুষ আত্মীয়দের মাঝে বসায়ে শেষ রাতের ঘটনাবলি শোনাল।

এ জামাতা আর্মি মেডিক্যাল কোর থেকে অবসর নিয়ে একটা নামকরা প্রাইভেট হাসপাতালে কর্মরত। আফসোস করে বলল, 'আমার হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে সিটের ব্যবস্থা করে এম্বুলেন্স আনালাম।' আর বলতে পারল না। রুহুল ইসলাম অত্যন্ত ভাগ্যবান। তাঁর চার জামাতাই বিভিন্ন দিকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। কিন্তু শেষ সময়ে হাসপাতালে নিয়ে সেবাযত্ন করার সুযোগ পেল না। তিন জামাতাই ঢাকায়। কনিষ্ঠ জামাতা আমেরিকায়।

আমার সাথে সম্পর্ক

১৯৫০ সালের ডিসেম্বর রংপুর কারমাইকেল কলেজে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করলাম। ঐ বছরই জুনে এমএ পাস করি। রংপুরেই আমার কর্মজীবন শুরু।

বিএ প্রথম বর্ষের ক্লাসে ছাত্রদের মধ্যে একজনের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। ফরসা চেহারায় নতুন দাঁড়ি বেশ দেখাচ্ছিল। বুঝা গেল দাঁড়ি কখনো কামায়নি। আমার ছাত্র জীবনের কথা মনে পড়ল। আইএ দ্বিতীয় বর্ষে আমার মুখে দাঁড়ি গজাল। আব্বার ভয়ে দাঁড়ি কামাতে সাহস করলাম না। আমার সহপাঠী কয়েকজন বলল, আমাদের ধারণা ছিল, প্রথম দিকে দাঁড়ি না কামালে দাঁড়ি দেখতে সুন্দর লাগে না। তোমাকে দেখে ধারণা বদলে গেল। আমরাও দাঁড়ি কামাব না।

একদিন রুহুল ইসলামকে বাসায় ডাকলাম। জানলাম, তাঁর আব্বা মাওলানা আফযালুল হক দেওবন্দের আলেম এবং পাকুরিয়া শরীফের পীর। এখন হিসাব কষে

দেখলাম, তখন আমার বয়স ২৭ এবং আমার ছাত্রের বয়স ২১ বছর। তাকে বললাম, ক্লাসের পড়া কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে বাসায় এসো। এভাবে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠল। বছর খানিক পর তাদের বাড়িতে অনুষ্ঠিত বার্ষিক মাহফিলে আমাকে নিয়ে গেল বক্তৃতা করার জন্য। আমি কলেজে যোহরের নামাযের বিরতির সময় নামায শেষে ইসলাম সম্পর্কে ছাত্রদের মধ্যে বক্তব্য রাখতাম। তাই ছাত্ররা যেসব হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেছে সেসব প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক মিলাদ মাহফিলে আমাকে নিয়ে যেত।

পাকুরিয়ার পীর সাহেব রাষ্ট্র বিজ্ঞানের দীনদার অধ্যাপক পেয়ে খুবই খুশি হলেন এবং আমার বক্তব্য শুনে আমার সাথে মহব্বতের সাথে আলিঙ্গন করলেন। এভাবে এ পরিবারের সাথে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠে। ১৯৫১ সালের ডিসেম্বরে আমার বিয়ে হয়। বছর খানিক পর একদিন রুহুল ইসলাম তার প্রাইমারি পড়ুয়া বোন সাদেকাকে আমার বাসায় নিয়ে এলো। খুব মিষ্টি চেহারা। আমার স্ত্রী খুব আদর করলেন।

ইসলামী ছাত্রসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও পরবর্তীতে জামায়াত নেতা মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী আমার পরিচয় সূত্রে ঐ সাদেকাকে বিয়ে করেন। ১৯৯২ সালে আমি জেলে থাকাকালে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর স্ত্রী আল্লাহর রহমতে এখনো বেঁচে আছেন এবং স্বামীর ঢাকাস্থ বাড়িতেই থাকেন।

আমার ছাত্র ভায়রা হয়ে গেল

রুহুল ইসলাম বিএ পাস করার পর পিতার নির্দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষায় এমএ ক্লাসে ভর্তি হয়। তার পিতা পাকুরিয়ায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে রুহুলকে প্রিন্সিপাল নিয়োগ করেন। ঐ বছরই সে এমএ পাস করে।

আমি ১৯৫৪ সালের এপ্রিলে গাইবান্ধায় অনুষ্ঠিত উত্তরবঙ্গ জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে আয়োজিত সম্মেলনে যোগদান করার দাওয়াত পাই। জনাব আবদুল খালেক থেকে এ দাওয়াত পেলাম। তিনি গাইবান্ধায় জামায়াতে ইসলামীর সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তার নিকট থেকেই সর্বপ্রথম জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে জানার সুযোগ পাই। সম্মেলন শেষে আমি জামায়াতে যোগদান করি। ঐ বছরই শেষের দিকে রুহুল ইসলাম আমাকে আবার পাকুরিয়ায় নিয়ে যায়। তার আব্বার প্রতিষ্ঠিত আলিয়া মাদরাসা ও কলেজ দেখলাম।

তার পিতাকে দেওয়ার জন্য জামায়াতে ইসলামীর কতক উর্দু বই সাথে নিয়েছিলাম। আমার জামায়াতে যোগদানের কথা জানার পর তিনি জানালেন যে তিনি রংপুর জেলা নেযামে ইসলাম পার্টির সভাপতি। তাঁর কাছে শুনলাম দেওবন্দে এক সময় মাওলানা

মওদূদী 'সুলতানুল কালাম' (কলম সম্রাট) হিসেবে খ্যাত ছিলেন। পরে মাওলানার বিরুদ্ধে ফতুয়ার কারণে পরিবেশ বদলে যায়। দেওবন্দ মাদরাসা পাস করা আলেমদের মধ্যে মাওলানা মওদূদীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণের যে ধারণা আমার ছিল, পীর সাহেবের মধ্যে তেমন কিছু অনুভব করলাম না।

রুহুল ইসলামকে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করতে তিনি বাধা দেননি। রুহুল ইসলামের ছোট ভাই মওলানা ভাসানীর ভক্ত ছিল এবং মওলানার ন্যাপ পার্টিতে যোগ দিল। পীর সাহেব আমাকে হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার দু' ছেলে দু' পার্টিতে, আমিও এক পার্টি করি। এ তিন দলের যে দলই ক্ষমতায় যাবে আমাদেরই ক্ষমতায় থাকা হবে। সব ব্যাংকেই একাউন্ট থাক'। তাঁর উদার মনের পরিচয় পেলাম।

আমি কোনো সময় ইশারা-ইঙ্গিতেও রুহুল ইসলামের সাথে কোনো রকম আত্মীয়তা করার ইচ্ছা প্রকাশ করিনি। জানতে পারলাম, সে আমার বড় শালী মুহসিনাকে বিয়ে করতে চায়। আমার নিকট থেকে শ্বশুর সাহেব ছেলের পরিচয় জেনে সম্মত হন। আমার ছাত্র ভায়রা ভাই-এর মর্যাদায় প্রমোশন পেল।

জামায়াত নেতা হিসেবে

ছাত্রজীবন শেষ করে কর্মজীবনের শুরুতেই তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। ১৯৮০ সালে তিনি রংপুর ও নিলফামারী সাংগঠনিক জেলার আমীর নির্বাচিত হন। ১৯৮৫ সালে রংপুর জেলার ৫টি মহকুমা জেলার মর্যাদা লাভ করার পর থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত তিনি রংপুর জেলার আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এভাবে মোট ১৪ বছর একটানা আমীর ছিলেন। রংপুর জেলায় জামায়াতে ইসলামীর অগ্রগতিতে তার অবদান বিরাট।

পাকুরিয়া শরীফের গদ্দিনশীন পীর হিসেবে যে ধরনের জীবন যাপন করার কথা, তিনি সে ধরনের গতানুগতিক পীর ছিলেন না। যদি গদ্দিনশীন পীরের প্রচলিত ভূমিকা তিনি পালন করতেন তাহলে জামায়াতের এত বড় সাংগঠনিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারতেন না।

রংপুর জেলা পাঁচটি জেলায় পরিণত হওয়ার পর তিনি বৃহত্তর রংপুরে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। জেলা আমীর থাকাকাল থেকেই তিনি কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন। সাংগঠনিক সেক্রেটারি পদে থাকাকালে কেন্দ্রীয় কর্ম-পরিষদেরও সদস্য ছিলেন। রংপুরের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে জামায়াত নেতা হিসেবে তিনি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

মানুষ হিসেবে

তাঁর চালচলন ও আচার-ব্যবহারে পীর হিসেবে সামান্য স্বাতন্ত্র্যবোধও কোনো সময় লক্ষ্য করা যায়নি। অত্যন্ত বিনয়ী, ভদ্র ও নিরহংকারী হিসেবেই তিনি সকল মহলে পরিচিত ছিলেন। সহজ-সরল জীবনই তিনি যাপন করে গেছেন। সদা হাসিমুখ তাঁর বৈশিষ্ট্য। সদালাপি, মিশুক ও প্রিয়ভাষী বলে সবাই সহজেই তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে চাইত। তাঁর আচরণে কেউ অসন্তুষ্ট হয়েছে এমন উদাহরণ নেই। যেসব গুণাবলি থাকলে জনগণের নিকট ভালো মানুষ হিসেবে খ্যাতি লাভ করা যায় তা সবই তাঁর মধ্যে ছিল। আর্থিক লেনদেনেই মানুষের সততার পরিচয় পাওয়া যায়। সেদিক দিয়ে তিনি আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। স্বার্থের কারণেই আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বিনষ্ট হয়। তিনি স্বার্থত্যাগ করে হলেও সম্পর্ক বহাল রাখার চেষ্টা করতেন। উন্নত নৈতিক চরিত্রই সত্যিকারের মনুষ্যত্ব। তিনি তেমনি একজন মানুষ ছিলেন।

তাঁর জনপ্রিয়তা

আমি উপস্থিত না থাকলেও জানতে পেরেছি যে, তাঁর ইন্তিকালের খবর পেয়ে হাজার হাজার মানুষ পাকুরিয়ায় সমবেত হয়। জানাযায় এত লোক হয় যে, মাঠ ও রাস্তা পেরিয়ে কৃষিজমিতেও মানুষকে দাঁড়াতে হয়। মানুষ তাঁকে যে, কত ভালোবাসত তা সবার চোখ-মুখের অবস্থা দেখে বুঝা গেল। শ্রদ্ধেয় পীর ও প্রিয় নেতার শোক তাদের চোখের পানিতে প্রকাশ পেল। জনগণের এমন ভালোবাসা কমলোকের ভাগ্যেই জুটে।

১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসার ডিসি তাঁকে বিজয়ী ঘোষণা করার পর রেডিওতেও তা প্রচারিত হয়। কিন্তু স্বৈরশাসক এরশাদের নির্দেশে সকল ব্যালট বাক্স রংপুর সেনানিবাসে নিয়ে সুস্পষ্ট কারচুপি করে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। তখন রংপুর ক্যান্টমেন্টের জিওসি ছিলেন মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান।

তিনি আমার দূর সম্পর্কে আত্মীয়। ১৯৯৬ সালে তিনি তুরস্কে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। আমি তখনকার প্রধানমন্ত্রী ড. নাজমুদ্দীন আরবাকানের দাওয়াতে তুরস্ক সফরে গেলাম। রাষ্ট্রদূত আমাকে তাঁর বাসায় দাওয়াত দিলেন। একান্তে আমার নিকট কাতরভাবে বললেন, 'এরশাদের হুকুমে বিবেকের বিরুদ্ধে আমাকে ঐ অন্যায়টি করতে হয়। পীর সাহেবকে ক্ষমা করার জন্য বলতে আপনাকে অনুরোধ জানাই।' আমি তাঁকে এ কথা জানিয়েছি। তিনি ক্ষমা করেছেন কি না তা আমি জিজ্ঞেস করা সমীচীন মনে করিনি।

ঢাকায় জানাযা

সিদ্ধান্ত হয় যে, যোহরের নামাযের পর বাইতুল মুকাররমে জানাযার পর মৃতদেহ রংপুর নিয়ে যাওয়া হবে। অসুস্থতার দরুন আমি সেখানে যেতে পারব না বলে বাইতুল মুকাররমে নেওয়ার সময় নিচ তলায় আত্মীয়-স্বজনদেরকে নিয়ে জানাযায়

আমাকে ইমামতি করার ব্যবস্থা করা হয়। আমীরে জামায়াত ঐ দিন জামিনের আবেদন নিয়ে হাইকোর্টে থাকতে বাধ্য না হলে তিনিই বাইতুল মুকাররম মসজিদে জানাযায় ইমামতি করতেন।

আমার প্রিয় ছাত্র, স্নেহের ছোট ভায়রা-ভাই, ইসলামী আন্দোলনের আজীবন সাথী ও অত্যন্ত মহব্বতের একান্ত আপনজনকে হারাবার বেদনা নিয়েই বেঁচে আছি। মহান মাবুদের নিকট কাতরভাবে আবেদন জানাই, যেন তাঁকে 'সাবিকুনাল মুকাররাবূনের' মধ্যে শামিল করেন। সূরা আল ওয়াকি'আতে বলা হয়েছে যে, হাশরের দিন মানবজাতি তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। যারা নেক তারা আসহাবুল ইয়ামীন– অর্থাৎ তারা ডানদিকে থাকবে। আর যারা বদ তারা 'আসহাবুশ শিমাল'– এরা বামদিকে থাকবে। নেক লোকদের মধ্যে যারা অগ্রসর তারা 'আসসাবিকূন'। তারা সামনের দিকে থাকবে। তারাই আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করে ধন্য হবে। তাদেরই পরিচয় 'আসসাবিকূনাল মুকাররাবূন'।

৩৪৮.

বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংকটের মূলে

বাংলাদেশে যে জটিল রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে এর সঠিক পর্যালোচনা করে এ থেকে মুক্তির পথ আবিষ্কার করতে হলে এ দেশের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

বাংলাদেশ হঠাৎ করে ১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন দেশে পরিণত হয়নি। ১৭৫৭ সালে স্বাধীন বাংলার শেষ শাসক নবাব সিরাজুদ্দৌলা যে রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন তা বর্তমান বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ছিল না। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা মিলে বিরাট রাষ্ট্র ছিল।

বাংলায় মাঝে মাঝে দিল্লির সম্রাটের আধিপত্য কায়েম হলেও বাস্তবে সাড়ে পাঁচ শ' বছর এ এলাকাটি মোটামুটি স্বাধীন ছিল বলা যায়। ১২০৩ সালে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বিজয়াভিযানের পর এ এলাকায় ইসলামী আইন ও ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল।

গোটা ভারতবর্ষেই প্রায় ৭ শতাব্দী মুসলিম শাসন ছিল। উত্তর ভারত ও মধ্য ভারতে অমুসলিমদের পক্ষ থেকে বারবারই মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেষ্টা চলেছে। কিন্তু এ এলাকায় অমুসলিমরা তেমন কোনো বিদ্রোহ করেনি। অমুসলিম জনগণ অর্থনৈতিক সুবিচার ও আদালতের ন্যায়বিচারে সন্তুষ্টই ছিল।

এ দেশে ইংরেজ শাসন

বণিকবেশে ইংরেজরা এ দেশে ব্যবসার সুযোগে স্থানীয় হিন্দু বণিকদের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলে। বাণিজ্যের আড়ালে তারা বিভিন্ন স্থানে সামরিক অস্ত্রে সজ্জিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী সংগঠিত করে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ উন্নত সমরাস্ত্র নিয়ে বাণিজ্যের ছদ্মবেশে সাম্রাজ্য বিস্তারের কর্মসূচি গ্রহণ করে। বাংলাদেশে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' নামে ইংরেজরা ঐ কর্মসূচি অনুযায়ী বাণিজ্য শুরু করে। ১৮ ও ১৯ শতাব্দীতে গোটা বিশ্বে ইউরোপীয় দেশগুলো এ পদ্ধতিতেই সাম্রাজ্য বিস্তার করে।

ভারতবর্ষে ইংরেজরা সর্বপ্রথম ১৭৫৭ সালে বাংলাদেশে শাসন ক্ষমতা দখল করার সুযোগ পায় এবং ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লব দমন করে গোটা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। দিল্লির শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ্ জাফরকে ক্ষমতাচ্যুত করে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করে।

ইংরেজ শাসন কেমন করে এত দীর্ঘায়িত হলো?

মুসলিম শাসকদের হাত থেকে ইংরেজরা ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই তাদের রাজত্ব এ দেশে মযবুত করার জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। ক্ষমতা হারিয়ে মুসলমানরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে চরম বিক্ষুব্ধ হয় এবং বিভিন্নভাবে বিদ্রোহ চালায়। ইংরেজরাও মুসলমানদেরকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেনি। সে সময় এ দেশে হিন্দু সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠই ছিল। তারা এদের সহযোগিতা সহজেই পেয়ে গেল।

বাণিজ্য উপলক্ষে যেসব বড় বড় হিন্দু বণিক ইংরেজদের সাথে ঘনিষ্ঠ ছিল তারাই ষড়যন্ত্র করে সেনাপতি মীর জাফর আলীকে নবাব বানানোর প্রলোভন দেখিয়ে নবাব সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করাতে সক্ষম হয়। মীর জাফর নবাব হয়ে বেশি দিন টিকতে পারেনি। বিশ্বাসঘাতককে কে বিশ্বাস করে? ফলে কিছু দিন পরই ইংরেজদের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা চলে যায়।

ইংরেজ শাসনকে মযবুত করার জন্য গোটা হিন্দু সমাজ এগিয়ে আসে। সরকারি কর্মকর্তা থেকে পিয়ন-চাপরাশি পর্যন্ত সর্বত্র হিন্দুরাই ইংরেজ সরকারের সেবাদাসে পরিণত হয়। ইংরেজরা এ দেশ থেকে যোগ্য দাসবাহিনী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে। হিন্দুরা এ শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে সকল সরকারি পদ দখল করে। মুসলমানরা ইংরেজ-বিদ্বেষের দরুন এ শিক্ষা গ্রহণ না করে শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের রাজনৈতিক গোলাম হিন্দুদের অর্থনৈতিক গোলামে পরিণত হয়।

প্রখ্যাত ব্রিটিশ শাসক ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার তার 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্স' নামক পুস্তকে লিখেছেন, 'পঞ্চাশ বছর পূর্বে এ দেশে কোনো অশিক্ষিত ও দরিদ্র মুসলিম

ছিল না। ইংরেজ শাসনের ৫০ বছরপূর্তির সময় কোনো শিক্ষিত ও সচ্ছল মুসলিম পরিবার দেখা যায়নি।'

ভারতবর্ষে স্বায়ত্তশাসন

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনানুযায়ী ১৯৩৭ সালে নির্বাচন হয়। সে নির্বাচনে ৭টি প্রদেশে কংগ্রেস সরকার এবং ৪টি প্রদেশে মুসলিম লীগ সরকার কায়েম হয়। বঙ্গদেশ, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম শাসন ও ৭টি প্রদেশে হিন্দু শাসন কায়েম হয়। কংগ্রেসশাসিত প্রদেশগুলোতে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিম জনগণ যে অন্যায়-অবিচারের শিকার হয় সে তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ শেরে বাংলা ফজলুল হকের উত্থাপিত প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতকে বিভক্ত করে মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলোতে স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েমের দাবি করে।

স্বাধীনতা দাবি

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ইংরেজ শাসন থেকে স্বাধীন হওয়ার দাবি জানালে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধের অবসানের পর ভারতবর্ষ থেকে চলে যাওয়ার ওয়াদা করে।

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস দাবি জানায় যে, ভারতের হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-শিখ-খ্রিস্টান মিলে এক ভারতীয় জাতি। তাই অখণ্ড ভারতবর্ষে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম হবে এবং গণতান্ত্রিক সরকার দেশ শাসন করবে। কংগ্রেস আরো ঘোষণা করে যে, স্বাধীন ভারতের আদর্শ হবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ।

সে সময় ভারতবর্ষে মোট ৪০ কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র দশ কোটি মুসলমান ছিল। গণতান্ত্রিক সরকার হলে অখণ্ড ভারতে হিন্দুশাসনই কায়েম হবে। ৭টি কংগ্রেসশাসিত প্রদেশে হিন্দু শাসনের যে নমুনা দেখা গেছে, তাতে মুসলিম লীগ যৌক্তিক কারণেই উপলব্ধি করল যে, ইংরেজ থেকে দেশ স্বাধীন হলেও আসলে মুসলমানরা হিন্দুদের গোলামই থেকে যাবে। ইংরেজ আমলে মুসলমানরা ব্রিটিশের রাজনৈতিক গোলামি ও হিন্দুদের অর্থনৈতিক গোলামির যাতনা ভোগ করেছে। মুসলিমদের পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র না হলে মুসলিম জাতির ভাগ্য পরিবর্তন হবে না।

কংগ্রেসের এক জাতিত্বের দাবি খণ্ডন করে মুসলিম লীগ দ্বিজাতিত্ব দাবি করে ঘোষণা করল যে, ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে মুসলিমগণ একটি পৃথক জাতি এক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মুসলিমদের আদর্শ হতে পারে না। তাই মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে দাবি জানাল যে, বঙ্গদেশ, আসাম, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও কাশ্মিরে পাকিস্তান নামে পৃথক রাষ্ট্র চাই।

১৯৪৬ সালের নির্বাচন

কংগ্রেসের অখণ্ড ভারত ও মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবি ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে প্রধান নির্বাচনী ইস্যুতে পরিণত হয়। ব্রিটিশ সরকার ভারত বিভক্তির বিরোধী ছিল। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলে তারা ভারত বিভক্ত করতে বাধ্য হলো। বঙ্গদেশে ১৯০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে বাঙালি মুসলমানরা মুসলিম লীগকে ৯৭% ভোট দিয়ে একচেটিয়া বিজয়ী করে। কংগ্রেসশাসিত ৭টি প্রদেশের মুসলমানরা শতকরা ৯৯ ভোট মুসলিম লীগকে দেয়। পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, সীমান্ত ও কাশ্মিরে এত বিশাল সংখ্যায় না হলেও মুসলিম লীগ অধিকাংশ আসনে বিজয়ী হয়। এসব এলাকায় মাত্র ৯০ বছর ব্রিটিশ শাসন ছিল বটে, কিন্তু বঙ্গদেশের মতো সেখানকার মুসলমানরা হিন্দুদের অর্থনৈতিক গোলাম ছিল না। তাই তাদের প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের মতো বিরূপ হয়নি।

শেষ ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টবেটেনের সাথে কংগ্রেসনেতা পণ্ডিত নেহরুর পরম ঘনিষ্ঠতা থাকায় এবং ব্রিটিশসরকার অখণ্ড ভারতের পক্ষে থাকায় দেশ ভাগ করার সময় পাকিস্তানের এলাকা যতটা কম করা যায়, সে ব্যবস্থাই করল। আসাম ও কাশ্মির সম্পূর্ণ বাদ দিল। বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাব বিভক্ত করল। কায়েদে আযম জিন্নাহ মন্তব্য করলেন, আমরা Truncated (কাট-ছাট করা) পাকিস্তান পেলাম।

নির্বাচনের পর দিল্লিতে মুসলিম লীগের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণের সম্মেলন হয়। লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তানের একাধিক রাষ্ট্র হবে বলে লেখা ছিল। সে প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব-পাকিস্তান একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র হতে পারত। কিন্তু কাট-ছাট করা পাকিস্তানের সবটুকু এলাকা নিয়ে একটি রাষ্ট্র কায়েমের জন্য বাংলার মুসলিম লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দিল্লি কনভেনশনে প্রস্তাব পেশ করলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

পাকিস্তান আন্দোলনে দু প্রধান নেতা

পাকিস্তান আন্দোলনে মুসলিম লীগের নেতা হিসেবে অবিভক্ত বাংলায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আসামে মওলানা আবদুল হামীদ খান ভাসানী অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতায় ও জনাব তাজ উদ্দীন ঢাকায় পাকিস্তান আন্দোলনে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন।

তারা মুসলিম লীগের দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রচারক ও কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিরোধী ছিলেন।

১৯৪৯ সালে যখন মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করা হয় তখন এ দলের গঠনতন্ত্রে মুসলিম লীগের আদর্শ ত্যাগ করা হয়নি এবং দলের নামে মুসলিম শব্দ যুক্ত ছিল।

বঙ্গদেশে মুসলিম লীগে দুটো উপদল

পাকিস্তান আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে বঙ্গদেশে মুসলিম লীগে দুটো উপদল সৃষ্টি হয়। একটির নেতৃত্বে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, অপরটির নেতৃত্বে ঢাকার নওয়াব পরিবারের খাজা নাজিমুদ্দীন। পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর বঙ্গদেশের মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টিতে পূর্ব-পাকিস্তানে প্রাদেশিক সরকার কায়েমের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে নাজিমুদ্দীন গ্রুপ বিজয়ী হয় এবং খাজা নাজিমুদ্দীন পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম সরকারপ্রধান হয়। প্রাদেশিক আইনসভায় সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের সদস্যগণ বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করেন। মওলানা ভাসানী আসাম থেকে হিজরত করে পূর্ব-পাকিস্তানে এলে বিরোধী গ্রুপটি তাঁর নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করে। জনাব সোহরাওয়ার্দী কলকাতার অধিবাসী। তিনি হিজরত করে করাচি চলে যান। তিনিই পরে পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতা হন এবং আজীবন এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

খাজা নাজিমুদ্দীন জননেতা ছিলেন না। জনসভায় বক্তৃতা করতেন ভাঙা ভাঙা বাংলায়। ঢাকার নওয়াব পরিবারের মাতৃভাষা ছিল উর্দু। মওলানা ভাসানী আসামে জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে তিনি ব্যাপক প্রচার করলেন যে, খাজা নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে যে মুসলিম লীগ শাসন চলছে তা জনগণের মুসলিম লীগ নয়। তাই জনগণের মুসলিম লীগ প্রয়োজন। জনগণ শব্দটির আরবী হলো 'আওয়াম'। তাই নাম রাখা হলো আওয়ামী মুসলিম লীগ বা জনগণের মুসলিম লীগ।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন

১৯৫৪ সালে সর্বপ্রথম পূর্ব-পাকিস্তানে প্রাদেশিক আইনসভায় নির্বাচন হয়। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সর্বদলীয় যুক্তফ্রন্ট কায়েম হয়। নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ মাত্র ১০টি আসনে বিজয়ী হয়। হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ সম্প্রদায় ৭২টি আর যুক্তফ্রন্ট পায় ২১৮টি।

তখন পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ভোটাররা শুধু ঐ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে। আইনসভায় মুসলিম সদস্যরা মুসলিমদের ভোটে, হিন্দু সদস্যরা হিন্দুদের ভোটে নির্বাচিত হয়। বর্তমানে একটি নির্বাচনী এলাকার সব সম্প্রদায়ের লোকেরাই যেকোনো সম্প্রদায়ের প্রার্থীকে ভোট দেয়। এর নাম হলো যুক্ত নির্বাচন।

ব্রিটিশ শাসনামলেই মুসলিম লীগের দাবি মেনে নিয়ে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা হয়। পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি ছিল বলেই মুসলমানরা আলাদাভাবে পাকিস্তান দাবির পক্ষে ভোট দিতে সক্ষম হয়। যুক্ত নির্বাচনব্যবস্থা থাকলে কোনোক্রমেই ভারত

বিভাগ সম্ভব হতো না। মুসলিমগণ আলাদা জাতি– এ আদর্শের সাথে পৃথক নির্বাচনই মানানসই। হিন্দু-মুসলিম একজাতি-এটা ভারতীয় কংগ্রেসের আদর্শ।

নির্বাচনের পর প্রথম যে সরকার গঠিত হয় তাতে শেরে বাংলা ফজলুল হক প্রাদেশিক চিফ মিনিস্টার হন। শেরে বাংলার কৃষক শ্রমিক পার্টি ও নেযামে ইসলাম এবং ছোট ছোট আরো কতক দলের সদস্যরা শেরে বাংলার দলের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ থাকেন। কিন্তু আওয়ামী মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্ট থেকে আলাদা হয়ে যায়। উভয় পক্ষে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচিত সদস্যরা প্রায় সমান সংখ্যায় দু দলে বিভক্ত হন।

ক্ষমতার কোন্দলে যুক্তফ্রন্ট বিযুক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে সরকার গঠনে ব্যালেন্স অব পাওয়ার ৭২ জন অমুসলিম সদস্যের হাতে চলে আসে। তারা পরবর্তী সরকার গঠনে শেরে বাংলার দলকে সমর্থন করেন। আওয়ামী মুসলিম লীগ অমুসলিম সদস্যদের সমর্থন চাইলে তারা যে কারণে অসম্মতি জানালেন, তা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন। সে কারণ হলো :

১. দলের নামে মুসলিম শব্দ থাকায় দলটি সাম্প্রদায়িক দল।

২. দলটির আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নয়।

৩. দলটি পৃথক নির্বাচনের সমর্থক হওয়ায় দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী। দলটি হিন্দু-মুসলিম একজাতি বলে বিশ্বাস করে না।

আওয়ামী মুসলিম লীগের আদর্শিক অধঃপতন

ক্ষমতাপাগল আওয়ামী নেতৃবৃন্দ হিন্দু সদস্যদের সমর্থনে ক্ষমতায় আরোহণ করার মহান উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের কাগমারিতে (বর্তমান নাম সন্তোষ) আওয়ামী মুসলিম লীগের এক সম্মেলনে দলটি উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ে হিন্দু সদস্যদের দাবি মেনে নেয়। দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ নামকরণ করা হয়। দলটির আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলে ঘোষণা করা হয়। আর পৃথক নির্বাচন পদ্ধতির বদলে যুক্ত নির্বাচনব্যবস্থা পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হয়। (এ বিষয়ে 'জীবনে যা দেখলাম' দ্বিতীয় খণ্ডের ১৫৮ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি।)

উক্ত সম্মেলনে আওয়ামী মুসলিম লীগ দলের শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর আইনসভার ৭২ জন অমুসলিম সদস্য অত্যন্ত উৎসাহের সাথে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করায় আওয়ামী লীগনেতা এডভোকেট আতাউর রহমান পূর্ব-পাকিস্তানের চিফ মিনিস্টার হন। বিস্ময়ের বিষয় যে, পাকিস্তান আন্দোলনের মহান নেতা মওলানা ভাসানী ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের আদর্শ এত সহজেই ত্যাগ করতে পারলেন।

ইসলামী আদর্শের প্রতি মুসলিম লীগের বিশ্বাসঘাতকতা

'পাকিস্তান কা মতলব কিয়া, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' স্লোগান দিয়ে মুসলিম জাতির ব্যাপক সমর্থনে ১৯৪৬-এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করার ফলে পাকিস্তান নামে যে রাষ্ট্রটি বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করে এর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের একচ্ছত্র ক্ষমতা মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের হাতেই ছিল। তারা ইচ্ছা করলে মুসলিম জাতির আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী পাকিস্তানকে একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে পারতেন। এ বিষয়ে বাধা দেওয়ার মতো কোনো শক্তির অস্তিত্ব ছিল না।

কিন্তু লক্ষ্য করা গেল যে, মুসলিম লীগ সরকারই ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের সম্পূর্ণ বিরোধী। পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্যে যারা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী নতুন দেশটিকে গড়ে তোলার দাবি করলেন, তারা কোণঠাসা হয়ে পড়লেন।

১৯৫৬ সালে কোনো রকমে সামান্য কিছু ইসলামী ধারাসহ যে শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়, সে অনুযায়ী ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে কেন্দ্রে ও প্রদেশে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। এর চার মাস আগে সেনাপতি আইয়ূব খান দেশে সামরিক শাসন চালু করে শাসনতন্ত্র বাতিল করেন এবং সকল রাজনৈতিক দলকে বেআইনি ঘোষণা করেন। একটানা দশ বছর স্বৈরশাসন চালু রেখে ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসেবে চালু থাকতে দেন। ইসলামী পারিবারিক আইন যা ব্রিটিশ শাসনকালেও বহাল ছিল, আইয়ূব খান তাও বিকৃত করেন। শিক্ষাব্যবস্থা আগের মতোই ধর্মনিরপেক্ষ থাকায় নতুন প্রজন্ম পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি অনুযায়ী গড়ে উঠে।

পূর্ব-পাকিস্তানের জনসংখ্যা শতকরা ৫৬ ও পশ্চিম-পাকিস্তানে শতকরা ৪৪ হওয়া সত্ত্বেও পার্লামেন্টে 'প্যারিটি' কায়েম করে পূর্ব ও পশ্চিমকে শতকরা ৫০টি আসন দেওয়া হয়। এভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার থেকেও পূর্ব-পাকিস্তানকে বঞ্চিত করা হয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য পূর্ব-পাকিস্তানে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। পশ্চিম-পাকিস্তানিরা পূর্ব-পাকিস্তানকে শাসন ও শোষণ করছে বলে পশ্চিমের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি হতে থাকে।

১৯৭০-এর নির্বাচন

পাকিস্তান কায়েমের ২৩ বছর পর ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে গোটা পাকিস্তান প্রথম প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের ৩০০ আসনের মধ্যে ১৬২টি পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল। সে নির্বাচনে সাধারণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নির্বাচনের সময় গণঅভ্যুত্থান ঘটে এবং ১৬০টি আসনই আওয়ামী লীগ দখল করে। জামায়াতে ইসলামী ছাড়া আর সব দল নির্বাচনী ময়দান থেকে পালিয়ে যায়।

ব্যালটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ দিলে পাকিস্তান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দ্বিখণ্ডিত হতো না। মি. ভুট্টো পশ্চিম-পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন হওয়ার উদ্দেশ্যে সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খানের সাথে ষড়যন্ত্র করার মাধ্যমে এ দেশে মুক্তিযুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। পাকিস্তানের চির দুশমন ভারত এ মহাসুযোগ গ্রহণ করে সরাসরি সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে।

বাংলাদেশে ভারতের আধিপত্য

বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে বিশ্বে মর্যাদার সাথে মাথা উঁচু করে উন্নতি করার জন্য যদি আন্তরিক সদিচ্ছা নিয়ে ভারত এগিয়ে আসত তাহলে বাংলাদেশে বর্তমান সংকট সৃষ্টি হতো না। তারা এ দেশকে তাদের বিশাল বাজার হিসেবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে এ দেশের ধর্মনিরপেক্ষবাদী শক্তির সহযোগিতায় তাদের আধিপত্য স্থায়ীভাবে কায়েম রাখার পরিকল্পনা নিয়েই গত ৩৭ বছর থেকে কাজ করে চলেছে।

ভারত তাদের স্বার্থে যা করণীয় তা করবেই। এর জন্য তাদেরকে অপরাধী গণ্য করা চলে না। তাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য যারা এ দেশে দায়িত্ব পালন করছে, তারা অবশ্যই অপরাধী। ইংরেজ শাসন কায়েমের উদ্দেশ্যে ক্লাইভ যা করেছেন তার ফলে তিনি তার দেশের হিরোর মর্যাদা পেয়েছেন এবং লর্ড উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। আমার দেশের মীর জাফর ব্রিটিশদের স্বার্থরক্ষার সহায়তা করে অবশ্যই চরম অপরাধ করেছে।

স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রশ্ন

এ শিরোনামে ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত আমার রচিত ৭২ পৃষ্ঠার বইটিতে অনেক তথ্য-উপাত্ত দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশকে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে দিতে চায় না। তারা এ দেশে ভারতের আধিপত্য কায়েমে বদ্ধপরিকর। এর কারণ আদর্শিক।

শেখ মুজিব হত্যায় জনগণের উল্লাস, ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ উচ্ছেদ, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অগ্রগতি এ কথাই প্রমাণ করে যে, জনগণ ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদের বিরোধী। ভারতের এ মতবাদটিকে বাংলাদেশে কায়েম করতে হলে মুক্তিযুদ্ধের মতোই ভারতের সরাসরি হস্তক্ষেপ অপরিহার্য এবং আওয়ামী লীগ তাই চাচ্ছে। ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বুঝতে পেরেছে যে, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী শক্তি ঐক্যবদ্ধ থাকলে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই তারা লগি-বৈঠার সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ২০০৭ সালের নির্বাচনকে বানচাল করা অত্যাবশ্যক মনে করেছে।

ফিল্ড মার্শাল মানেক শ'র বস্তুনিষ্ঠ মন্তব্য

উপরিউক্ত পুস্তকটির পেছনের মলাটে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ভারতীয় সেনাপ্রধান ব্রিটিশ আমল থেকে প্রখ্যাত ভারতীয় ইংরেজি দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকায় ১৯৮৮ সালের ২৯ এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত নিম্নরূপ বিবৃতিটি উদ্ধৃত করা হয়েছে :

'যদি বাংলাদেশকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়, তাহলে ভারতের আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই। যেদিন আমার সৈনিকরা বাংলাদেশকে মুক্ত করে, সে দিনই আমি এ কথা উপলব্ধি করি। বাংলাদেশিদের কখনোই ভারতের প্রতি তেমন ভালোবাসা ছিল না। আমি জানতাম, ভারতের প্রতি তাদের ভালোবাসা অস্থায়ী। অনুপ্রেরণা লাভের জন্য ভারতের দিকে না তাকিয়ে তারা মক্কা ও পাকিস্তানের দিকে দৃষ্টিপাত করবে। আমাদের সত্যাশ্রয়ী হতে হবে। বাংলাদেশিদের প্রতি আমরা সঠিক আচরণ করিনি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের সব রকমের সাহায্য করা উচিত ছিল, কিন্তু আমাদের রাজনীতিবিদরা তা করেননি। তারা বেনিয়ার মতো আচরণ করেছেন।'

মার্শাল মানেক শ বিদেশে থেকেও যে সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন, শেখ হাসিনা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে অবস্থান করেও এখন পর্যন্ত এ মহাসত্যটি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। একবার ক্ষমতায় যেয়ে যে স্বাদ পেয়েছেন এবং ধর্মনিরপেক্ষতার মহান আদর্শ যেটুকু বাস্তবায়িত করার সুযোগ পেয়েছেন তার ফলে মোহান্ধ হয়ে যেকোনো উপায়ে আবার ক্ষমতা লাভের জন্য পাগল হয়ে আছেন।

সরকারের সাথে আঁতাত করে প্যারোলে মুক্তি পেলেন এবং তিনিও তার দল সরকারের উপর সম্পূর্ণ আস্থাশীল হয়ে আছেন যে, আগামী নির্বাচনে তাকে ক্ষমতাসীন করার জন্য সরকার নিজেদের স্বার্থেই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে।

সরকার আওয়ামী লীগের এজেন্ডাই বাস্তবায়ন করছে

বর্তমান তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার, এর পেছনের প্রধান পরিচালক ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার আওয়ামী লীগের অসাংবিধানিক ও ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের সৃষ্টি হিসেবে তাদের নিকট নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সরকারের কার্যাবলিতে সন্তুষ্ট হয়ে রণক্লান্ত শেখ হাসিনা কিছু দিন বিশ্রাম উদযাপনের উদ্দেশ্যে বিদেশে পাড়ি জমানোর দিন বিমান বন্দরে লাইসেন্স দিয়ে গেলেন যে, এ সরকার যত অবৈধ কর্ম সমাধা করবে, তা তিনি ক্ষমতাসীন হয়ে বৈধ করে দেবেন।

সরকার উৎসাহের সাথে আওয়ামী লীগের এজেন্ডা বাস্তবায়নে তৎপর হয়ে গেল :

১. আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিপক্ষ বিএনপিকে ক্ষমতায় যাওয়া থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে সে দলের নেতাদেরকে পাইকারি হারে গ্রেফতার করল এবং আসল বিএনপিকে স্বীকৃতি না দিয়ে নকল বিএনপি গড়ার উদ্দেশ্যে জঘন্য পন্থা অবলম্বন করল।

২. মুজিব হত্যা দিবসকে জাতীয় শোক দিবস পালনের ব্যবস্থা করল এবং ১৫ আগস্ট সরকারি ছুটি পালন করল।

৩. ১৫ আগস্ট রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান ও সশস্ত্রবাহিনী প্রধানগণ টুঙ্গিপাড়া যেয়ে শেখ মুজিবের মাযার যিয়ারত করে তার প্রতি রাজকীয় মর্যাদায় শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে ধন্য হলেন।

৪. ৭ নভেম্বর বাংলাদেশের এক গৌরবময় ঐতিহাসিক দিন। মুক্তিযুদ্ধের আদলেই সেদিন সিপাহী-জনতার বিপ্লব সফল হয়। এ দিনটি ১৯৯১ সাল থেকে 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছিল এবং সরকারি ছুটির দিন হিসেবে উদযাপিত হচ্ছিল। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হয়ে এ দিবসটি পালন করা থেকে বিরত রইলেন এবং সরকারি ছুটিও বাতিল করলেন।

৫. সেনাপ্রধান শেখ মুজিবকে জাতির পিতা ঘোষণা করলেন এবং পাঠ্যপুস্তকে তা লিখে দিয়ে নতুন প্রজন্মকে তা বিশ্বাস করতে বাধ্য করলেন।

৬. সরকার বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। অবশ্য উচ্চ আদালত বেগম জিয়াকে জামিন দিয়ে সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়।

৭. আওয়ামী লীগের সাথে আঁতাত করে সরকার তাদেরকে নির্বাচনে বিজয়ী করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

৮. প্রধান নির্বাচন কমিশনার আওয়ামী লীগের সাথে সংলাপের প্রথম দিনেই চরম আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন, 'এ কমিশন আপনাদের আন্দোলনেরই ফসল, আপনারাই দেশ স্বাধীন করেছেন এবং জনগণ আপনাদেরকেই ক্ষমতায় দেখতে চায়।' ঐ একই আবেগ নিয়ে তিনি নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসারদের (জেলার ডিসি) সম্মেলনে বললেন, '২০০১ সালে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি। আমি ঐ রকম নির্বাচন চাই না, ১৯৭০-এর নির্বাচনের মতো নির্বাচন চাই।'

নির্বাচনে কারচুপি করার সুযোগ প্রধানত রিটার্নিং অফিসারদের। তাদেরকে স্পষ্ট করেই জানিয়ে দেওয়া হলো যে, '৭০-এর মতো আওয়ামী লীগকে বিপুলভাবে বিজয়ী করাই নির্বাচন কমিশনের লক্ষ।

আওয়ামী লীগের আদর্শিক অধঃপতনই রাজনৈতিক সংকটের মূল

আওয়ামী লীগের ইতিহাস প্রমাণ করে যে, তারা ফ্যাসিবাদী দল, গণতন্ত্রে তারা বিশ্বাসী নয়। যেকোনো প্রকারে ক্ষমতাসীন হওয়াই তাদের নীতি। গণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতায় এসেও তাদের ফ্যাসিবাদী চরিত্রের দরুন তারা স্বৈরতন্ত্র কায়েম করেন। বিশেষ করে ২০০১ সালের নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের পর তারা জনগণের উপর আস্থা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছেন। এ কারণেই তারা ২০০৭ সালে বিজয়ের নিশ্চয়তা না দেখে বর্তমান সংকট সৃষ্টি করেছেন।

ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে তারা অন্ধভাবে বিশ্বাসী এবং '৭১ সালে ভারত সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে তাদেরকে ক্ষমতাসীন করার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এবং এ দেশে আবার ক্ষমতায় আসার উদ্দেশ্যে তারা ভারতের আধিপত্য কামনা করেন। বিশেষ করে ভারতের আধিপত্য ছাড়া এ দেশে ইসলামী শক্তিকে পরাভূত করে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে কায়েম করা কিছুতেই সম্ভব নয় বলে বিশ্বাস করেন।

৩৪৯.

রাজনৈতিক সংকট থেকে মুক্তির উপায়

আওয়ামী মুসলিম লীগের আদর্শিক অধঃপতনের পরিণামে বাংলাদেশ যে জটিল রাজনৈতিক সংকটে নিপতিত হয়েছে, এ অবস্থা থেকে মুক্তির পথ আওয়ামী লীগেরই হাতে রয়েছে। তারা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত না নিলে এ সংকট আরো মারাত্মক রূপ ধারণ করার আশঙ্কা রয়েছে।

ময়দানে সক্রিয় রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে আওয়ামী লীগই প্রাচীনতম। এ দলটি ১৯৭০ সালের নির্বাচনে একমাত্র শক্তিধর দল হিসেবে স্বীকৃত। এ দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায়ই ভারতের ইন্দিরাসরকার কূটনৈতিক ও সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকে সফল করে। স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগই একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী ছিল। ১৯৭৫-এ শেখ মুজিবের পতনের পর আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক অঙ্গনে দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু ১৯৯৬ সালে আবার ক্ষমতাসীন হয়ে পাঁচ বছর দাপটের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করার সুযোগ পাওয়ায় দলটি তৃণমূলেও মযবুত হয়।

২০০১ সালের নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের পর চার দলীয় জোট সরকারকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে বারবার গণ-অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা চালালেও আওয়ামী লীগ জনগণের কোনো সাড়া না পেয়ে ব্যর্থ হয়। কিন্তু জোটসরকারের বিদায় নেওয়ার পরদিন থেকেই দলটির ফ্যাসিবাদী বাহিনী লাঠি-লগি-বৈঠা নিয়ে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো স্বাভাবিক কারণেই দুর্বল থাকার কথা। তাই তারা হরতাল, অবরোধের নামে চরম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনকে বানচাল করতে সক্ষম হয়। পরিণামে বাংলাদেশ দু বছর গণতন্ত্র থেকে বঞ্চিত হয়ে রাজনৈতিক মহা সংকটে পতিত হয়।

গণতন্ত্র পুনর্বহাল করার একমাত্র উপায় নির্বাচন

আগামী ১৮ ডিসেম্বর নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। এ নির্বাচনে বিজয়ের নিশ্চয়তাবোধ করে শেখ হাসিনা প্রায় ৫ মাস বিদেশে কাটিয়ে ৬ নভেম্বর (২০০৮) দেশে ফিরে এলেন। আওয়ামী লীগ চরম উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়ে গেছে।

জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার না করলে নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা সত্ত্বেও জরুরি অবস্থা বহাল থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়ে যাওয়ায় নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে না বলে সন্দেহ রয়ে গেল।

নিরপেক্ষ নির্বাচনে চার দলীয় জোটকে পরাজিত করা সম্ভব নয় মনে করেই আওয়ামী লীগ ২০০৭ সালের নির্বাচন হতে দিল না। ২০০৮-এর নির্বাচনে চার দলীয় জোটকে পরাজিত করার জন্যই জরুরি আইন বহাল রাখা অত্যাবশ্যক। জরুরি অবস্থা বহাল না থাকলে কারচুপি করার কোনো উপায় থাকে না। আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাসীন করা সম্ভব না হলে সরকারের যাবতীয় অবৈধ সিদ্ধান্ত বৈধতা পাবে কি না সন্দেহ করা স্বাভাবিক।

এ কারণেই চার দলীয় জোট নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য জরুরি আইন প্রত্যাহার সহ ৭ দফা দাবি তুলেছে। আওয়ামী লীগ নেতা জিল্লুর রহমান বলেছেন, কোনো দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলেও ১৮ ডিসেম্বর নির্বাচন হবে। এ কথায় আশঙ্কা হচ্ছে যে, সরকার জরুরি অবস্থা বহাল রেখেই নির্বাচন করতে চায়, যাতে তাদের পছন্দের দল ক্ষমতাসীন হয়। এভাবে সরকার নিরাপদ প্রস্থানের ব্যবস্থা করলেও রাজনৈতিক সংকট তো আরো জটিলই হবে।

সংকট উত্তরণের একমাত্র পথ

রাজনৈতিক সংকট থেকে স্থায়ীভাবে মুক্তি পেতে হলে আওয়ামী লীগকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, নির্বাচনে পরাজিত হলেও নির্বাচনী ফলাফল মেনে নেবে। বিজয়ী হওয়া কখনো নিশ্চিত নয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী হতে হবে। শেখ হাসিনা আমেরিকাতে থাকাকালেই ২০০৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়ে গেল। তিনি নির্বাচনের দিন ৪ নভেম্বর ওয়াশিংটনেই ছিলেন। তিনি দেখলেন, নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জন ম্যাককেইন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েও ফলাফল প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে বিজয়ীকে মুবারকবাদ জানালেন।

শেখ হাসিনা নির্বাচনে পরাজিত হলে ফলাফল মেনে নিতে চান না বলেই বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে। ২০০১ সালের নির্বাচন যে নিরপেক্ষ হয়েছে তা তিনি জানেন। নির্বাচনের দিনও তিনি সাংবাদিকদের নিকট সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি যদি সত্যি বিশ্বাস করতেন যে, জনগণ তাকেই ভোট দিয়েছে, নির্বাচন কমিশন ও সরকার কারচুপি করে হারিয়ে দিয়েছে, তাহলে তিনি নির্বাচনের পরপরই জনগণের দুয়ারে ধরনা দিয়ে প্রতিবাদ করতেন এবং জনগণ সাড়া দিয়ে তার পক্ষে বিক্ষোভ প্রকাশ করত।

পরাজিত হওয়ার পর তিনি আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারতে যেয়ে জোটসরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছেন। এ দ্বারা বুঝা গেল যে, জনগণের প্রতি আস্থা হারিয়ে তিনি ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য বিদেশিদের সাহায্য চাইলেন।

আওয়ামী লীগের আদর্শিক সংশোধন

আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ভারতীয় আদর্শে বিশ্বাসী। অবশ্য আওয়ামী লীগ নেতারা ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসেবে স্বীকার করেন, পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে স্বীকার করেন না। তাদের অনেকে নামায-রোযা-হজ্জ ইত্যাদিকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে পালন করেন। তারা নিশ্চয়ই কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলে বিশ্বাস করেন। তা-না হলে নামায-রোযা কেন করবেন? কুরআনে মানবজীবনের সকল দিকের জন্যই সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। কুরআন থেকে শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো গ্রহণ করে কুরআনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধানগুলোকে মানতে অস্বীকার করার অনুমতি তারা কোথায় পেলেন?

তারা নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (স)-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করেন। কিন্তু রাসূল (স) কি শুধু ধর্মনেতা? তিনি যে কুরআনের বিধানমতো রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা বাস্তবে কায়েম করে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন, তা তারা কোন্ যুক্তিতে অস্বীকার করেন? কুরআনের কোনো একটি বিধানকেও কি কোনো ঈমানদারের অস্বীকার করার অনুমতি আছে? দীন ইসলামের কোনো কোনো বিধান মানবিক দুর্বলতার কারণে পালন না করলে গুনাহগার হয়; কাফির হয় না। কিন্তু কোনো একটি বিধানকেও মানতে অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যায়। এ অবস্থায় কুরআনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধানসমূহকে মানতে অস্বীকার করার এত বড় সাহস তারা কেমন করে করেন?

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মানে তো এটাই যে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও পার্থিব যাবতীয় বিষয়কে ধর্মের বাইরে রাখতে হবে। ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তি জীবনে যার ইচ্ছা ধর্ম পালন করবে। কিন্তু রাষ্ট্রপরিচালনার সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক থাকবে না– কুরআনে এ জাতীয় অনুষ্ঠান সর্বস্ব কোনো ধর্মের ধারণা পাওয়া যায় না। কুরআন আল্লাহর প্রভুত্ব, রাসূলের নেতৃত্ব ও পরকালের জবাবদিহিতার ভিত্তিতে মানবজীবনের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান।

আওয়ামী লীগ যদি এ কুরআনে বিশ্বাসী হন, তাহলে তারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মতো জঘন্য কুফরী মতবাদে বিশ্বাসী হতে পারেন না। তারা যদি কুরআন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবের দরুন ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে কুরআন ও ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে নিজেদেরকে সংশোধন করে নিতে পারেন। তারা আদর্শিক অধঃপতন থেকে নিজেদেরকে উদ্ধার করে নিলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটের পূর্ণ সমাধান হয়ে যাবে। এখন এর কি কোনো সম্ভাবনা আছে?

আওয়ামী লীগের আদর্শিক সংশোধন কি সম্ভব?

আওয়ামী লীগের কোনো কোনো নেতা-কর্মীর ব্যক্তিগত সংশোধন হতে পারে এবং হচ্ছে। কিন্তু দলটির যে দীর্ঘ রাজনৈতিক ঐতিহ্য, তাতে আদর্শিক সংশোধনের কোনো সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। এর কারণ প্রধানত :

১. ১৯০ বছরের গোলামি যুগ, ২৫ বছর পাকিস্তানি যুগ ও ৩৯ বছর বাংলাদেশ আমল মিলে আড়াই শত বছরের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে গড়ে উঠা শিক্ষিত বাহিনীর হাতেই সরকার পরিচালিত হয়ে এসেছে। আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহেও তাদের নেতৃত্বে চলছে। মাদরাসা শিক্ষা ছাড়া গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই তাদের হাতে। শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য তাদেরই মালিকানায় চলছে। প্রিন্ট মিডিয়া তাদেরই নিয়ন্ত্রণে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনও তাদেরই দখলে।

   সুতরাং এ দেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা ও সমাজ গঠন করাই সবচেয়ে সহজ বলে মনে করাই আওয়ামী লীগের পক্ষে স্বাভাবিক।

   ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের জন্য যারা চেষ্টা করছে, তাদের শক্তি-সামর্থ্যকে বিবেচনায় আনার প্রয়োজনও হয়ত তারা বোধ করেন না।

২. গোটা বিশ্ব ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের নিয়ন্ত্রণে। বিশ্ব মোড়ল আমেরিকা এ মতবাদের প্রধান পতাকাবাহী। হিমালয়ান উপমহাদেশে আমেরিকা ভারতকে মোড়ল বানিয়ে রেখেছে। ভারত থেকে যত নেতা এ দেশে আসেন, তারা সামান্য সংকোচ না করেই বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেন যে, ভারত এ দেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সরকার চান। ভারতের বর্তমান হাইকমিশনারও আন্তরিকতার সাথেই এ কথা বলেছেন।

বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র থেকে ১৯৭৭ সালে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ উৎখাত হয়ে গেছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে এ শাসনতন্ত্র সংরক্ষণের শপথ নিয়ে ক্ষমতাসীন হওয়া সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দাপটের সাথে ঘোষণা করলেন যে,

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদই আওয়ামী লীগের আদর্শ। আওয়ামী লীগের মতো বিরাট এক রাজনৈতিক শক্তি ভারতের আদর্শে বিশ্বাসী বলে বলিষ্ঠ কণ্ঠে দাবি করার কারণেই ভারতীয় নেতারা নির্দ্বিধায় তাদের আদর্শের পক্ষে বাংলাদেশে এসেও মতামত প্রকাশ করেন। এ পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের আদর্শিক সংশোধনের কোনো সম্ভাবনাই থাকার কথা নয়।

বাংলাদেশে আদর্শিক সংঘাত অনিবার্য

রাসূল (স)-কে প্রধান কী দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে, সে বিষয়ে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে :

'তিনিই সে সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও একমাত্র হক দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি (মানবরচিত) সকল দীনের উপর আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করেন।'

এ কথাটির গুরুত্ব বিবেচনা করে এ আয়াতটি তিনটি সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে– সূরা তাওবার ৩৩, সূরা ফাত্‌হের ২৮ ও সূরা সাফ্-এর ৯ নং আয়াত।

কুরআনে মানবজাতির সামগ্রিক জীবনের জন্য যেসব বিধান নাযিল করা হয়েছে, এর সবটুকুই রাসূল (স) বাস্তবে কায়েম করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। মুসলিম জাতির প্রধান কর্তব্য এটাই। তাই দীনকে বিজয়ী করার চেষ্টা করা সব ফরযের বড় ফরয। মুসলমানদের মধ্যে যাদের এ চেতনা রয়েছে, তারা ঈমানী দায়িত্ব হিসেবেই এ কাজের জন্য জান ও মাল খরচ করা কর্তব্য মনে করেন। বাংলাদেশে যারা এ কাজে সক্রিয় তারা আখিরাতের সাফল্যের উদ্দেশ্যে এ পথে জীবন দিতে প্রস্তুত।

বাংলাদেশের মুসলমান জনগণ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, রাসূল (স)-কে মহব্বত করে, কুরআনকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে এবং ইসলামকে ভালোবাসে। তাই নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগকেও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নৌকার মালিক তুই আল্লাহ' স্লোগান দিয়ে জনগণকে আশ্বস্ত করতে হয় যে, তারা ইসলামবিরোধী নয়; এতে বোঝা গেল জনগণ দীনকে বিজয়ী করার বিপক্ষে নয়।

এ পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ ইসলামী আন্দোলনকে উৎখাত করে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কায়েম করার অপচেষ্টা অব্যাহত রাখলে সংঘাত অনিবার্য।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে চলুন

শেখ মুজিব ১৯৭৫ সালে গণতন্ত্র হত্যা করলেন। শেখ হাসিনা ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর থেকে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত ফ্যাসিবাদী কর্মসূচি দিয়ে ও নির্বাচন বর্জন করে গণতন্ত্রকে বিপন্ন করলেন। ২০০১ সালের নির্বাচনী ফলাফলকে মেনে না নিয়ে ৫ বছর সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন করলেন।

শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের নিকট আবেদন জানাই যে, আপনারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কায়েমের জন্য গণতান্ত্রিক পন্থায় প্রচেষ্টা চালাতে থাকুন এবং নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। আপনারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পক্ষে জনমত গড় তুলতে থাকুন এবং প্রতিপক্ষ ইসলামী আন্দোলনকেও তাদের পক্ষে জনমত গঠনের সুযোগ দিন। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণকে সিদ্ধান্ত নিতে দিন যে তারা কী চান।

লাঠি-লগি-বৈঠা দিয়ে সন্ত্রাসী আন্দোলন করে দেশকে আর বিপদে ফেলবেন না। ২০০৭-এর নির্বাচন বানচাল করে আপনারা যে সরকারকে ক্ষমতায় আনলেন, তারা দেশকে সর্বদিক দিয়ে ২০ বছর পিছিয়ে দিল।

অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক দাবি করা বন্ধ করুন

আপনারা সরকার ও নির্বাচন কমিশনের নিকট ইসলামী দলসমূহের বিরুদ্ধে যেসব দাবি করেছেন, তা কি গণতান্ত্রিক ও সংবিধানসম্মত?

আপনারা ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি তুলেছেন। এ দেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীরা রাজনীতি করতে পারবে; ইসলামী রাজনীতি করার অধিকার থাকবে না কোন্ যুক্তিতে? আপনাদের এ ফ্যাসিবাদী মনোবৃত্তি ত্যাগ করতে হবে। এ দাবি কোনো সরকারের পক্ষেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কোনো সরকারই আপনাদের মতো অযৌক্তিক মনোবৃত্তির হতে পারে না। আপনারা ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় গিয়েও এ কমিটি করতে পারেননি।

জামায়াতে ইসলামীকে নিবন্ধন না দেওয়ার জন্য ইলেকশন কমিশনে সকল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মহল একজোট হয়ে ধরনা দিয়ে কি ঠেকাতে পারল? আপনাদের ফ্যাসিবাদী মানসিকতা ত্যাগ না করলে এভাবেই হেয় হয়ে থাকতে হবে।

যুদ্ধাপরাধী স্লোগান

শেখ মুজিব ১৯৫ জন পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছিলেন। তিনি কোনো বেসামরিক ব্যক্তিকে যুদ্ধাপরাধী গণ্য করেননি। কারণ তিনি জানতেন যে, বেসামরিক লোক যুদ্ধাপরাধীর সংজ্ঞায় পড়ে না। সেক্টর কমান্ডারগণ ও আওয়ামী লীগের বর্তমান নেতৃবৃন্দও এ কথা জানেন। যদি না জানতেন তাহলে তারা নিশ্চয়ই শেখ মুজিবকে পরামর্শ দিতেন, যাতে বেসামরিক লোককেও তালিকাভুক্ত করা হয়।

তিনি বেসামরিক লোকদেরকে 'কলেবরেটর' নাম দিয়ে তাদের বিচার করার জন্য আইনও পাস করেছিলেন। সে আইনে লাখখানেক লোককে গ্রেফতারও করেছিলেন। পরে তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে তাদেরকে মুক্তি দেন। অবশ্য যারা খুন, ধর্ষণ, লুট ও অগ্নিসংযোগের অপরাধ করেছে তাদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন।

এসব অপরাধে যারা লিপ্ত, তাদের বিচারের জন্য সব সময়ই আইন আছে। শেখ সাহেবকে এ জন্য আলাদা সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

তাই সম্মানিত সেক্টর কমান্ডারগণসহ যারা জামায়াত নেতৃবৃন্দকে যুদ্ধাপরাধী আখ্যা দেন, তাদেরকে আর হাস্যাস্পদ না হওয়ার পরামর্শ দিতে চাই। ২০০১ সালের নির্বাচনের পূর্বে মাওলানা নিজামীর প্রতিপক্ষ সাঁথিয়ায় '৭১-এর গণকবর আবিষ্কার করার ব্যর্থ চেষ্টা করে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছেন।

জামায়াত তাদের আসল টারগেটে পরিণত হওয়ার রাজনৈতিক কারণ একটাই। বিএনপি ও জামায়াতের নির্বাচনী ঐক্য বজায় থাকলে আওয়ামীদের ক্ষমতায় যাওয়ার কোনো উপায় নেই বলেই তাদের ধারণা। তাই গরজ বড় বালাই। জামায়াতকে ঘায়েল করার জন্য এটাই তাদের নিকট একমাত্র অস্ত্র।

তারা মিডিয়াতে ৫০ জন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে যুদ্ধাপরাধী বলে ফতওয়া দিয়ে একটি তালিকা মিডিয়ায় প্রচার করেছেন। এর কি আইনগত কোনো মূল্য আছে? বাংলাদেশ তো এখনো মগেরমুল্লুকে পরিণত হয়নি। দেশে আইন-আদালত আছে। তারা এ বিষয়ে আদালতের রায় নেওয়ার কেন চেষ্টা করেন না?

বর্তমান সরকারের সাবেক আইন উপদেষ্টার নিকট যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি জানালে তিনি বলেছিলেন, 'আসল যুদ্ধাপরাধীদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে তারা দালালদের বিরুদ্ধে লেগেছেন।' এরপরও এ দাবি জানানো অব্যাহত রাখতে তারা লজ্জাবোধ করছেন না।

এক ভাইকে হারালাম

আমরা চার ভাই ও ৫ বোন। আমি সবার বড়। তিন বোন চলে গেছে। ৪র্থ ও ৫ম বোন আল্লাহর রহমতে বেঁচে আছে।

৬ নভেম্বর (২০০৮) আমার বয়স ৮৬ বছর পূর্ণ হলো। দ্বিতীয় ভাই ডাক্তার মুহাম্মদ গোলাম মুয়ায্যামের বয়স এখন ৮৪ বছর। তৃতীয় ভাই ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ গোলাম মুকাররাম গত ১৩ রামাদান, ১৪ সেপ্টেম্বর (২০০৮) ৭৯ বছর বয়সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেল। সবার ছোট ভাই ইঞ্জিনিয়ার ড. মুহাম্মদ মাহদীউয্যামানের বয়স ৭২ বছর।

আব্বা ঢাকা মুহসিনিয়া মাদরাসা (বর্তমানে নজরুল কলেজ) থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে সে কালের এন্ট্রান্স পাস করায় ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় সাধন করেন।

মাদরাসা শিক্ষিতদের জন্য কর্মজীবনে ময়দান অত্যন্ত সংকীর্ণ বলে আব্বা তাঁর সন্তানদেরকে আধুনিক শিক্ষা দেন। আরবী ভাষা কমপক্ষে এ পরিমাণ শেখার ব্যবস্থা

করেন, যাতে অনুবাদ ও তাফসীর পড়ে কুরআন বুঝতে সক্ষম হয়। আর মসজিদে নামায আদায়ের অভ্যাস গড়ে তুলেন। ধর্মীয় ব্যাপারে সামান্য শৈথিল্যও মেনে নিতেন না। ফলে আমরা ছাত্র জীবনেই দাড়ি রাখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। আমরা কোনো সময়ই দাড়ি কামাইনি।

আমার তৃতীয় ভাইটি মধ্য বয়স থেকেই অসুস্থ। তাই চাকরির মেয়াদ পাঁচ বছর বাকি থাকতেই ১৯৮১ সালে চাকরি থেকে মাত্র ৫২ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করে। কেমিক্যাল ইন্ডাসট্রিজ কর্পোরেশনে চিফ ইঞ্জিনিয়ার পদে থাকাকালে অবসর নেয়। চাকরিজীবনে বিভিন্ন সারকারখানা ও চিনি কারখানায় দায়িত্ব পালন করে।

২৭ বছর অবসর জীবন-যাপনকালেও কোনো সময় কর্মহীন থাকায় অভ্যস্ত ছিল না। কোনো অর্থকরী কর্মে নয়, সেবামূলক কাজে সময় দিত। অসুস্থতা সত্ত্বেও পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে যেয়ে নামায আদায় করত। অসুস্থতা বেড়ে গেলে বাধ্য হয়ে ঘরে নামায পড়ত। অনেকবার রমাদানে ইতিকাফ পালন করেছে।

আব্বার নির্মিত মসজিদ কমিটির সহ-সভাপতি হিসেবে মসজিদের উন্নয়ন ও সকল কর্মকাণ্ডে যথেষ্ট মনোযোগী ছিল।

ইসলামী আন্দোলনের বলিষ্ঠ সমর্থক ছিল। অসুস্থতার কারণে সাংগঠনিকভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে অক্ষম বলে আফসোস করত। কিন্তু দাওয়াতী কাজে যথেষ্ট সময়, অর্থ ও শ্রম ব্যয় করতে সচেষ্ট ছিল। রমনা পার্কে প্রাতর্ভ্রমণে অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাদের মধ্যে ইসলামী সাহিত্য বিতরণ ও বিক্রয় করত। আমার লেখা চটি বই খুব পছন্দ করত ও কিনে নিয়ে বিলি করত।

২০০২ সালে জীবনসাথী স্ত্রীকে হারিয়ে বলতে গেলে মনের দিক দিয়ে খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। কারণ তার স্ত্রী তার এত যত্ন নিত যে, কখন কী খাবে, কোন্ জামা পড়ে বাইরে যাবে, কখন বিছানায় যাবে ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয়েও সে স্ত্রীর উপর নির্ভরশীল ছিল।

আমার এ ভাইটি অত্যন্ত সৎ ও নেক জীবনযাপন করে গেছে। সন্তানদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ছিল।

মৃত্যুর পূর্বে কয়েক মাস রোগযন্ত্রণায় বেশ কষ্টই পেয়েছে। কয়েক সপ্তাহ নাকে খাদ্যগ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। ফজরের পর তাকে বিছানায় মৃত অবস্থায় দেখা গেল, ঘুমের মধ্যেই শান্তিতে চলে গেল। আমাকেই ছোট ভাইয়ের জানাযা পড়াতে হলো। মসজিদের পাশেই পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

আব্বার কেনা জমিতে আমার ভাইয়েরা সবাই বিল্ডিং নির্মাণ করেছিল। ২য় ভাই ও ৪র্থ ভাই তাদের বাড়ি বিক্রয় করে অন্যত্র চলে গেল। তৃতীয় ভাইটিই মগবাজার

ছেড়ে যায়নি বলে আমরা দুই ভাই বলতে গেলে একসাথেই ছিলাম। সুস্থ থাকাকালে তো মসজিদে রোজ পাঁচবারই দেখা হতো। দীন সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য বা বই নেওয়ার জন্য প্রায়ই আসত। সে দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ায় মগবাজারে আমি একা হয়ে গেলাম। তার একমাত্র পুত্র আবদুল্লাহ সালেহকে দেখে সান্ত্বনাবোধ করি। তার আব্বার যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে মসজিদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে।

আল্লাহ তাআলা তার সকল নেক আমল কবুল করুন এবং সকল গুনাহখাতা মাফ করুন, কবরের আযাব থেকে রেহাই দান করুন এবং তার সন্তানদেরকে তার জন্য হামেশা দোআ করার তাওফীক দান করুন।

৩৫০.

আওয়ামী লীগের কি দেশগড়ার যোগ্যতা আছে?

যারা দেশকে সত্যিকারভাবে ভালোবাসে তারা দেশকে উন্নত, সমৃদ্ধ ও মর্যাদাশীল হিসেবে গড়ে তুলতে চায় এবং জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি কায়েম করে দেশে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি করতে সার্বিক প্রচেষ্টা চালায়।

আওয়ামী লীগ বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কায়েম করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ভারতকে সরাসরি অংশগ্রহণের জন্য সম্মত করাতে সক্ষম হয়, যার ফলে মাত্র নয় মাসের সংগ্রামেই স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হয়।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে যখন দেশে ফিরলেন, তখন বীরোচিত সম্বর্ধনা দিয়ে জনগণ তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। দেশের অবিসংবাদিত নেতার মর্যাদায় তিনি অধিষ্ঠিত হন।

ইতিহাসে দেখা যায়, এ জাতীয় মহাবিজয় লাভের পর বিজয়ী নেতা দেশবাসী সকলকে আপন করে নিয়ে সকল মহলকে সাথে নিয়ে দেশগড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এমনকি রাজনৈতিক বিরোধীদেরকেও জাতীয় সংহতির স্বার্থে ক্ষমা করার ঘোষণা দেন।

যদি দেশ গড়াই তার আসল লক্ষ্য হতো, তাহলে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল মহলকে নিয়ে জাতীয় সরকার গঠন করতেন। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী সকলকে ক্ষমা করার ঘোষণা দিয়ে দেশগড়ায় সহযোগিতা করার আহ্বান জানাতেন।

জনগণের অবিসংবাদিত নেতার এ যোগ্যতা না থাকায়, তিনি শুধু আওয়ামী লীগের সরকার কায়েম করে মুক্তিযুদ্ধের আর সকল মহলকে বিরোধী দলের ভূমিকায় লিপ্ত হতে বাধ্য করেন। যার ফলে অন্য মুক্তিযোদ্ধারা 'জাসদ' নামে রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করে জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া সৃষ্টি করার সুযোগ পায়।

শেখ মুজিব যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, তা কাজে লাগিয়ে দেশের উপজাতিসহ সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের উন্নতির জন্য যদি কাজ করার আহ্বান জানাতেন, তাহলে তিনি সকলের আস্থা অর্জন করে সফল নেতা হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিতে পারতেন। তিনি জানতেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা তার দলকে ভোট দেয়নি, তাদের রাজা ত্রিদিব রায়কে তারা নির্বাচিত করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা নিজেদেরকে বাঙালি মনে করে না। যারা উপজাতি নয় তাদেরকে তারা বাঙালি বলে। সেখানে পরিভাষা হিসেবে পাহাড়ি ও বাঙালি হিসেবে জনগণ বিভক্ত।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর শেখ মুজিব পার্বত্য চট্টগ্রামে গিয়ে উপজাতিদের সকলকে বাঙালি হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। এর অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় উপজাতীয়দের মধ্যে।

কোনো মানবগোষ্ঠী যখন নিজেদেরকে একটি পৃথক জাতিসত্তা হিসেবে গণ্য করে, তখন সেটা তাদের বিরাট আবেগের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, জীবনাচার যে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তা-ই তাদেরকে অন্য মানবগোষ্ঠী থেকে ভিন্ন পরিচিতি দান করে।

রাষ্ট্রের নাম শেখ মুজিবই বাংলাদেশ রেখেছেন। দেশগড়ার মনোভাব নিয়ে তিনি যদি বলতেন, 'বাংলাদেশকে উন্নত করার জন্য সকল বাংলাদেশিকে একমনা হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে, যাতে এ দেশের অধিবাসী আমরা সবাই সুখ-শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারি। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, উপজাতি আমাদের সকলের একটাই পরিচয়– 'আমরা বাংলাদেশী', তাহলে উপজাতিরা বিদ্রোহী হওয়ার চিন্তাও করত না।

কিন্তু তিনি উপজাতিদেরকে বাঙালি হওয়ার কথা বলে তাদেরকে বিদ্রোহের পথে ঠেলে দিলেন। তারা বিদ্রোহ করলে প্রতিবেশী ভারত তাদেরকে তেমনিভাবে সাহায্য করেছে, যেমনভাবে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করেছিল, এটুকু দূরদৃষ্টি তার ছিল না। তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি যে, ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য নয়, পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করে বাংলাদেশকে সিকিমের মতো কব্জা করার অসদুদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেছিল।

এভাবে প্রমাণিত হয় যে, শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ ক্ষমতার পাগল। দেশগড়ার কোনো যোগ্যতা তাদের নেই। শেখ মুজিবের পৌনে চার বছরের শাসন ও শেখ হাসিনার পাঁচ বছরের শাসনকালে তারা ঐ যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেননি।

জনগণকে বিভক্ত করে শাসন করাই তাদের উদ্দেশ্য

ব্রিটিশ শাসনামলে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে হিন্দুদের সমর্থনে শাসনকাল বৃদ্ধি করাই ব্রিটিশদের পলিসি ছিল, যা 'ডিভাইড এন্ড রুল' নামে কুখ্যাত।

আওয়ামী লীগও স্বাধীনতার পক্ষ ও বিপক্ষ তথা মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধার স্লোগান তুলে দেশের রাজনৈতিক শক্তিকে বিভক্ত করে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি করছে। তা না হলে ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির দাবিতে এক মঞ্চে না হলেও এক সাথে যুগপৎ আন্দোলন করা সত্ত্বেও ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয়ের পর থেকে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ তুলে জামায়াত নেতাদের সাথে এক টেবিলে বসতেও অসম্মত হওয়ার কী যুক্তি থাকতে পারে? যুগপৎ আন্দোলনের সময় আওয়ামী নেতা আবদুস সামাদ আযাদের বাসায় লিয়াজোঁ কমিটির যুক্তবৈঠকে অসংখ্যবার আওয়ামী নেতাদের সাথে জামায়াত নেতাদের ঘনিষ্ঠ আলোচনা ও আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আওয়ামী নেতাদের জামায়াত নেতাদের বিরুদ্ধে চরম আক্রোশের কারণ এটাই যে, আওয়ামী লীগ ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপির সমান ভোট পাওয়া সত্ত্বেও একমাত্র জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্য জোটের কারণে তারা শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হন।

আওয়ামী নেতারা জামায়াতে ইসলামীকে স্বাধীনতাবিরোধী বলে অপপ্রচার চালান। জামায়াতে ইসলামীর হাজার হাজার রুকন ও লাখ লাখ কর্মী-সমর্থকের শতকরা ৮০ ভাগ '৭১ সালের পর জন্মগ্রহণ করেছেন। জামায়াতের বর্তমান কেন্দ্রীয় নেতারা বাংলাদেশ আমলে জামায়াতে যোগদান করেছেন। পাকিস্তান আমলে তারা ছাত্র ছিলেন। তারা ইসলামী ছাত্রশিবিরকেও স্বাধীনতাবিরোধী বলে গালি দেন। ১৯৭৭ সালে এ সংগঠনের জন্ম। বর্তমানে যারা এর নেতা তারা ১৯৭১ সালে পয়দাও হয়নি।

জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবির ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েম করে রাসূল (স)-এর আদর্শে বাংলাদেশকে গড়ে তোলার চেষ্টা করার কারণে যে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে চলেছে, তা ঠেকানোর জন্য কোনো উপায় না দেখে গোটা ইসলামী আন্দোলনকেই তারা স্বাধীনতাবিরোধী বলে অপপ্রচার চালাচ্ছেন। তারা তো ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করার মতো ধৃষ্টতাপূর্ণ দাবিও করতে দ্বিধা করছেন না। এমনকি জামায়াতে ইসলামী যাতে রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সে জন্য ১৪ দলীয় নেতারা সেক্টর কমান্ডারর্সদেরকে সাথে নিয়ে নির্বাচন কমিশনের নিকট ধরনা দিয়েছেন, যেন জামায়াতকে নিবন্ধিত হিসেবে স্বীকৃতি না দেয়।

তারা ইসলাম ও জামায়াতে ইসলামীর দুশমনি করতে গিয়ে এতটা অন্ধ হয়ে গেছেন যে, জনগণ তাদেরকে ভারতের দালাল মনে করছে কি না তা-ও টের পাচ্ছেন না।

জনগণ এবং সশস্ত্রবাহিনী যে ভারত থেকেই স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে বলে ধারণা করে, তারা সে কথাও বুঝতে পারছেন না। তাই তারা ভারতের প্রেমে পাগল হয়ে তাদের সকল বাড়াবাড়িকেই হজম করে চলেছেন।

আওয়ামী লীগের বিভাজন নীতি সর্বমহলে ব্যাপ্ত

ইসলামী আন্দোলনের অগ্রগতিতে আতংকিত হয়ে সকল বামপন্থি মহল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ। সকল ময়দানে তারা সমন্বিত মঞ্চ গড়ে তুলেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মধ্যে তাদের মঞ্চ থেকে সুপরিকল্পিতভাবে প্রচেষ্টা চলছে, যাতে মাদরাসার ছাত্ররা ভর্তি পরীক্ষায় যোগ্যতার প্রতিযোগিতায়ই অংশ নিতে না পারে। মাদরাসার ছাত্ররা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে যেখানেই কর্মরত থাকবে সেখানেই ইসলামের পক্ষে কাজ করবে। কারণ, তারা কিছুতেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মতো কুফরী তত্ত্ব কখনো গ্রহণ করবে না।

সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মধ্যে আওয়ামী ও বামপন্থি শিক্ষকদের মঞ্চশিক্ষক সমিতির নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান।

সাংবাদিক ময়দানেও তাদের সমিতি আলাদা। বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন (বিএমএ) বহু বছর তাদের দখলেই ছিল। কিছু দিন থেকে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ফলে তাদের একচেটিয়া নেতৃত্ব অব্যাহত নেই। সুপ্রিমকোর্ট বার সমিতিতে এখনো তাদের নেতৃত্ব বহাল আছে। জেলা বার সমিতিতে যেখানে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তি ঐক্যবদ্ধ নয়, সেখানে তাদের নেতৃত্ব কায়েম আছে।

রাজনৈতিক ময়দানে এ বিভাজন দুটো জোটের নেতৃত্ব দিচ্ছে। প্রধান দুটো রাজনৈতিক দল দু জোটের নেতৃত্ব দিচ্ছে। এরশাদের জাতীয় পার্টির মতো কতক আদর্শহীন পার্টিও শুধু ক্ষমতায় অংশীদার হওয়ার উদ্দেশ্যে আওয়ামী জোটে শামিল আছে।

এ বিভাজনের ব্যাপ্তি যে আকার ধারণ করেছে তাতে মনে হয়, জাতীয় ঐক্যের কোনো সম্ভাবনাই নেই। তাহলে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার কি কোনো উপায়ই নেই? আমরা কি তাহলে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ করে ক্রমে অবনতির দিকে যেতে থাকব?

মুক্তির একই পথ

এ মারাত্মক বিভাজন সত্ত্বেও যদি উভয় পক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মীমাংসার ব্যাপারে আন্তরিক হয়, তাহলে দেশের জনগণকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ ইখতিয়ার দিতে হবে। অর্থাৎ জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে যাদেরকে ক্ষমতাসীন করবে, তাদেরকে দেশ শাসনের ব্যাপারে সহযোগিতা করতে হবে। নির্বাচনে পরাজিত হলে নির্বাচনী

ফলাফলকে মেনে নেওয়ার মনোবৃত্তি গড়ে তুলতে হবে। হরতাল, অবরোধ ও সন্ত্রাসী পন্থায় সরকারকে অচল করার অপচেষ্টা বর্জন করতে হবে। বিরোধী দলকে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদে ও বাইরে আচরণ করতে হবে। পরাজিত হলেও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য অনুযায়ী বিজয়ী দলকে অভিনন্দন জানানোর সাহস সঞ্চয় করতে হবে। পরাজিত দলকে বিদেশে যেয়ে দেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর ঘৃণ্য অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। তাদেরকে জনগণের নিকট ধরনা দিতে হবে, যাতে পরবর্তী নির্বাচনে বিজয়ী হওয়া যায়। রাজনৈতিক উভয় পক্ষ যদি এসব গণতান্ত্রিক নীতি পালন করার সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়, তাহলে বিভাজন সত্ত্বেও দেশের উন্নতি ও জনগণের কল্যাণ হতে থাকবে। জনগণের ময়দানেই চূড়ান্ত ফায়সালার ব্যাপারে সবাই একমত না হলে আমাদের অধঃপতন অনিবার্য। যদি আমাদের মধ্যে সত্যিকার দেশপ্রেম থাকে তাহলে এ বিষয়ে ঐকমত্য অবশ্যই সম্ভব।

২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিব্য নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচন শেষ মুহূর্তে বর্জন করে শেখ হাসিনা বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে যে পরিণতি ডেকে এনেছেন, তা কি তাঁর রাজনীতির জন্য কল্যাণকর হয়েছে? এতে সর্বদিক দিয়ে দেশ অনেক পিছিয়ে গিয়েছে। তাকেও জেল খাটতে হয়েছে। তার দলকেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে।

২০০৭ ও ২০০৮ সালে একটি অনির্বাচিত সরকারের স্বেচ্ছাচারী শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে দেশপ্রেমিক সকল মহল, বিশেষ করে রাজনৈতিক উভয় পক্ষ যদি যথার্থ শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়, তাহলে আগামী নির্বাচনের পর দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হওয়ার সম্ভাবনা অবশ্যই রয়েছে।

দেশগড়ার রাজনীতির উদাহরণ

যারা দেশগড়ার উদ্দেশ্যে ও জনকল্যাণে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজনীতি করেন, তাদের রাজনীতি কখনো জনগণের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে না, বরং দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। অতীত ইতিহাস ও বর্তমান ঘটনাবলি থেকে মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি :

১. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর ২১ বছরের চরম বিরোধীদের সাথে কেমন আচরণ করলেন? যারা ১৩ বছর পর্যন্ত জ্বালাতন করল, হত্যার সিদ্ধান্ত নিল, মদীনায় হিজরত করার পর ৬ বছর পর্যন্ত বার বার মদীনা আক্রমণ করল, হুদাইবিয়ার সন্ধিতে যাদের অন্যায় দাবি মেনে নিয়ে চুক্তি করতে হলো, চুক্তির দু বছর পর বিনা রক্তপাতে মক্কা জয় করে আল্লাহর রাসূল (স) সবাইকে ক্ষমা করে দিয়ে বিরোধীদের মনও জয় করে নিলেন, যার ফলে দীর্ঘ একুশ বছর যার নেতৃত্বে দুশমনি চলল সে আবু সুফিয়ানসহ সকলেই ঈমান এনে পরম অনুগত হয়ে গেল।

২. কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, 'মুসলিমরা একটি আলাদা জাতির' দাবিতে আন্দোলন করে মি. গান্ধি ও পণ্ডিত নেহরুর কংগ্রেস দল ও ব্রিটিশ সরকারকে তাদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ভারতকে খণ্ডিত করে পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম করতে বাধ্য করেন। ঐ আন্দোলনের পরিণামে ভারতের হিন্দু সম্প্রদায় তাদের দেবী 'ভারতমাতা'-কে খণ্ডিত করার পক্ষে ভোট দেওয়ার অপরাধে সারা দেশে মুসলমানদেরকে হত্যা করতে লাগল। যাতে এর প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানের মুসলমানরা হিন্দুদেরকে হত্যা না করে সে জন্য কায়েদে আযম ঘোষণা করলেন যে, পাকিস্তানের হিন্দু-মুসলিম সবাই পাকিস্তানি জাতি। ভারত বিভাগের ৬০ বছর পরও ভারতে মুসলিম হত্যা বন্ধ হয়নি। অথচ পাকিস্তানে ও বর্তমান বাংলাদেশে এর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

৩. দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ জনগণের উপর সাম্রাজ্যবাদী সাদাদের দীর্ঘ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করার অপরাধে নেলসন মেন্ডেলাকে ২৭ বছর কারাগারে বন্দী রাখা হয়। তার আন্দোলন বিজয়ী হওয়ার পর তিনি প্রতিহিংসার রাজনীতি করলে দেশ গড়ায় সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হতেন না। তিনি বিজয়ী হয়ে যখন সরকার গঠন করেন, তখন সাবেক স্বৈরশাসককেও সরকারে অংশীদার করেন, যাতে দেশে সাদাদের বিরুদ্ধে কালো সংখ্যাগরিষ্ঠরা কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া না দেখায়।

৪. ২০০৮ সালের ৪ নভেম্বর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এবারই প্রথম একজন কৃষ্ণাঙ্গ প্রার্থী বিপুল ভোটাধিক্যে বিজয়ী হন। নির্বাচনী ফলাফল জানার সাথে সাথে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বারাক হোসেন ওবামা তার ঐতিহাসিক বিজয়-ভাষণ দিলেন। গোটা বিশ্ব তার ভাষণ মুগ্ধ হয়ে শুনেছে। আমিও ঐ ভাষণ উপভোগ করেছি। তিনি বললেন, আমরা সবাই আমেরিকান। এটাই আমাদের একমাত্র পরিচয়। আমরা সাদাকালো সব এক হয়ে কাজ করব। যারা আমাকে ভোট দেননি আমি তাদেরও প্রেসিডেন্ট তাদেরও সেবক।

তিনি ঐ ভাষণেই বললেন, আমি ম্যাককেইনের (প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান প্রার্থী) ফোন পেলাম। তিনি আমাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন। আমার সরকারে রিপাবলিকানও থাকবে। এ কয়টি উদাহরণই দেশগড়ার যোগ্য নেতাদের পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং 'ডিভাইড এন্ড রুল'– সাম্রাজ্যবাদী নীতি, স্বৈরশাসকদের কৌশল, দেশগড়ায় অযোগ্য নেতাদের অপরাজনীতি।

একজন আদর্শ মুজাহিদের তিরোধান

আল্লাহর পথে জিহাদ করার যে দায়িত্ব ও কর্তব্য মুমিনদের উপর অর্পণ করা হয়েছে, সে ব্যাপারে যারা সচেতনভাবে সক্রিয়, তাদের সকলের মান এক রকম নয়। এ দেশে আল্লাহর রহমতে বিপুলসংখ্যক লোক মুজাহিদের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করছেন।

তাদেরই একজন হিসেবে আমি যাদের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পেয়েছি, এর মধ্যে মরহুম শামসুর রহমান একজন। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর আমরা একই আন্দোলনের কর্মী হিসেবে তাকে নিবিড়ভাবে জানার সৌভাগ্য হয়েছে। আমি সাক্ষ্য দিতে বাধ্য যে, তিনি সর্বদিক দিয়ে একজন আদর্শ মুজাহিদ। কারণ, আমি তার সংগ্রামী জীবনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবনেও তিনি আদর্শ বলে আমার ধারণা হয়েছে।

যে ক'জন ব্যক্তি এ দেশে ইসলামী আন্দোলনকে শূন্য থেকে গড়ে তুলে এ পর্যায়ে পৌঁছিয়েছেন, তিনি তাদেরই মধ্যে বিশেষভাবে গণ্য। খুলনা বিভাগে জামায়াতে ইসলামীকে সংগঠিত করার জন্য তিনি অতুলনীয় অবদান রেখেছেন। গ্রামে গ্রামে সাইকেলে চড়ে দাওয়াতী কাজ সম্প্রসারণ করেছেন এবং সংগঠন গড়ে তুলেছেন।

তার ইন্তিকালের পর আমি পত্রিকায় যে সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছি তা ০৪.১১.'০৮ তারিখের দৈনিক সংগ্রাম ও ০৫.১১.'০৮-এর সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হলো :

'জনাব শামসুর রাহমানের সাথে আমার পঞ্চাশ বছরের দীর্ঘ সম্পর্ক। তাঁর ইন্তিকালে একজন মুখলিস দীনী ভাইকে হারালাম। জামায়াত হারাল একজন যোগ্য ও নিঃস্বার্থ নেতাকে। আর দেশ হারাল একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক নাগরিককে।

সান্ত্বনার বিষয় যে, তিনি মাশাআল্লাহ ৯৩ বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। আমার জানামতে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দের মধ্যে এত দীর্ঘ হায়াত কেউ পাননি। তিনি আমার চেয়ে বয়সে ৭ বছর বড়। বর্তমানে আমার চেয়ে তিন বছর বড় বয়সের একজন নেতা বেঁচে আছেন। তিনি বগুড়ার সাবেক জেলা আমীর, ১৯৭০-এর নির্বাচনে জামায়াতের একমাত্র নির্বাচিত এমপিএ (প্রাদেশিক আইনসভা সদস্য)। যার নাম মাওলানা আবদুর রহমান ফকীর।

জনাব শামসুর রাহমান কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর, সেক্রেটারি জেনারেল ও জামায়াতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে সততা ও যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন করে শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হয়েছেন। তাঁর দায়িত্ববোধ, কর্তব্যনিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা ও আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ। দীর্ঘদিন জামায়াতের আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তার মধ্যে উপরিউক্ত গুণাবলি লক্ষ্য করেছি।

তাঁর ছেলে ডাক্তার শরীফুল ইসলামের সাথে আমার আপন ভায়রা মরহুম শাহ রুহুল ইসলামের মেয়ের বিয়ে হওয়ায় তাঁর সাথে সম্পর্কে আরো এক মাত্রা যোগ হলো। সে হিসেবে তিনি আমার বেয়াই। ডাক্তার শরীফ আমেরিকার শিকাগোতে ইসলামী সংগঠনের নেতা।

অন্তর থেকে দু'আ করি, আল্লাহ তাআলা তাঁর এ নেক বান্দাহকে তাঁর রহমতের ছায়ায় স্থান দান করুন, তাঁর সকল দীনী খিদমতকে কবুল করুন এবং জান্নাতে তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন।'

৩৫১.

পরাশক্তির ইসলামাতঙ্ক

১৯৯০ সালে অন্যতম পরাশক্তি সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র পরাশক্তি হিসেবে বিশ্ব-মোড়লের ভূমিকায় অবতীর্ণ রয়েছে। ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী বিপ্লব সফল হওয়ায় আমেরিকাকে অপমানিত হয়ে সেখান থেকে বিতাড়িত হতে হয়। এরপর সুদানে ইসলামী সরকার কায়েম হলে আমেরিকা চমকে উঠে। শুধু মাদরাসা শিক্ষিতদের নেতৃত্বে আফগানিস্তানে তালেবান সরকার কায়েম হওয়ায় আধুনিক যুগের দাবি যথাযথভাবে উপলব্ধি না করায়, তারা কোনো কোনো বিষয়ে চরমপন্থি বলে মনে হলেও চিন্তা-চেতনার দিক দিয়ে তারা অবশ্যই খাঁটি ইসলামী।

বিভিন্ন দেশে ইসলামের এসব উত্থানে পাশ্চাত্য সভ্যতার পতাকাবাহী হিসেবে আমেরিকা রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ইসলামী সভ্যতা ৭ম শতাব্দী থেকে ১৭তম শতাব্দী পর্যন্ত গোটা বিশ্বে নেতৃত্ব দিয়েছে। ইসলামী সভ্যতার পুনরায় উত্থান হলে পাশ্চাত্য সভ্যতা তেমনিভাবে বিপন্ন হয়ে পড়বে, যেমনি অতীতে রোমান ও পারস্য সভ্যতা ইসলামী সভ্যতার নিকট পরাজিত হয়েছে। এ আতঙ্কে পরাশক্তি অস্থির।

পাশ্চাত্য সভ্যতার চিন্তাবিদদের আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়া

পাশ্চাত্য সভ্যতার চিন্তানায়কদের মধ্যে আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর স্যামুয়েল পি হান্টিংটন ইসলামী সভ্যতার পুনরুত্থানের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠতম ভূমিকা পালন করছেন। তিনি প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের সময় আমেরিকার নিরাপত্তা বিভাগের ডাইরেক্টর ছিলেন। তিনি আমেরিকান পলিটিক্যাল সাইন্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। বর্তমান প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের পিতা সিনিয়র বুশ যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন থেকেই প্রফেসর হান্টিংটন আমেরিকান সরকারের ফ্রেন্ড, ফিলমদার এন্ড গাইডের ভূমিকা পালন করছেন। তিনি তাঁর 'Clash of Civilizations and the Remaking of world order' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে গোটা বিশ্বে অগ্রসরমান ইসলামী আন্দোলনকে দমন করার জন্য পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারক হিসেবে আমেরিকান সরকারকে কঠোর দায়িত্ব পালনের পরামর্শ দিয়েছেন।

তিনি আরো লিখেছেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য এক আপদ ছিল সমাজতন্ত্র, সেটা ৭০ বছরেই খতম হয়ে গেছে। এখন ইসলামই পাশ্চাত্য সভ্যতার স্থায়ী বিপদ (Permanent danger)।

জীবনে যা দেখলাম ২০৭ পৃষ্ঠায় প্রফেসর হান্টিংটনের বিস্তারিত পরিচয় ও তার গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উল্লেখ করেছি এবং ২০৮ পৃষ্ঠায় 'মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে আমেরিকার বর্তমান পলিসি' সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর (যা 'নাইন-ইলেভেন' নামে পরিচিত) নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ধ্বংস হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট (জুনিয়র) বুশ এর কোনো তদন্ত না করেই 'ইসলামী মৌলবাদী'দেরকে দোষী সাব্যস্ত করে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেড (ধর্মযুদ্ধ) ঘোষণা করেন। গোটা আমেরিকায় মুসলমান অধিবাসীদেরকে হয়রানি করা, হিজাব পরা মহিলাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং টিভিতে ব্যাপকভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে জঘন্য প্রচারাভিযান চালিয়ে জনগণকে খেপিয়ে তোলা হয়। খোঁড়া অজুহাতে আফগানিস্তান দখল করে নেয় এবং মিথ্যা অজুহাত সৃষ্টি করে ইরাক দখল করে বিচারের প্রহসন করে পবিত্র ঈদের দিনে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসি দেয়।

ইসলামের পুনরুত্থানকে প্রতিরোধ করার মার্কিন পরিকল্পনা

পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজাধারী আমেরিকা প্রফেসর হান্টিংটনের ডকট্রিনকে যথার্থ হিসাব গ্রহণ করে, গোটা মুসলিম বিশ্বে ইসলামের পুনরুত্থান প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার নিম্নরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন :

১. আফগানিস্তান ও ইরাক দখল করা হয়েছে এবং ইরান ও সিরিয়াকে হুমকির মধ্যে রেখেছে।

২. মিসরে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের উত্থানকে ঠেকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ২৫ বছর থেকে হোসনি মোবারককে দালাল হিসেবে টিকিয়ে রেখেছে।

৩. পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামীকে দমন করার জন্য প্রেসিডেন্ট মুশারফকে ৯ বছর সাহায্য করেছে। তাঁর জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠায় নেমে আসায় আমেরিকাই বেনজির ভুট্টোকে নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে আনতে মুশারফকে বাধ্য করে।

   বেনজির ভুট্টো সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হওয়ায় জনগণের আবেগকে কাজে লাগিয়ে পিপলস্ পার্টি নির্বাচনে বিজয়ী হয়। জনগণ মুশাররফের মার্কিন পলিসির বিরুদ্ধে ভোট দিলেও প্রেসিডেন্ট জারদারি মার্কিন পরিকল্পনার সমর্থক বলেই জনগণের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে।

৪. আমেরিকা গণতন্ত্র ও মানবধিকারের পতাকাবাহী হিসেবে পাশ্চাত্য সভ্যতার নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত। অথচ আমেরিকা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে গণতন্ত্রকে দাবিয়ে রাখার জন্য হীন ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। যেসব মুসলিম দেশে গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামের অগ্রগতি হওয়ার আশঙ্কা করছে, সেসব দেশে গণতন্ত্রকে সে দেশের সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে দাবিয়ে রাখছে। যেমন আলজেরিয়া ও তুরস্ক। যেসব দেশে রাজতন্ত্র রয়েছে, সেখানে রাজতন্ত্রকেই সমর্থন করছে, যাতে গণতন্ত্রের কোনো সম্ভাবনাই দেখা না দেয়।

৫. যেসব দেশে জনগণ এতটা গণতন্ত্রমনা যে, গণতন্ত্রকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়, সেসব দেশে সেক্যুলার রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে ক্ষমতাসীন করার জন্য ষড়যন্ত্র চালায়– যেমন বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি।

পরাশক্তির খপ্পরে বাংলাদেশ

হিমালয়ান উপমহাদেশে মার্কিন পরাশক্তির দালালি করার দায়িত্ব নিয়েছে ভারত। আফগানিস্তান থেকে মিয়ানমার (বার্মা) পর্যন্ত উপমহাদেশের সকল দেশকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ভারতকে দায়িত্ব দেওয়ার প্রয়োজনেই আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে পারমাণবিক সহযোগিতা চুক্তি হয়েছে। গত বছর (২০০৭) প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী কন্ডোলিৎসা রাইস দিল্লি সফরে এসে ঘোষণা করে গেছেন যে, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের জন্য ভারতকে সাথে নিয়ে কাজ করতে হবে। আমেরিকান গণতন্ত্র হলো 'সেক্যুলার ডেমোক্রেসি'। আমেরিকার পক্ষ থেকে ভারত বিশ্বস্ততার সাথেই বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র' কায়েমের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর অগ্রগতিতে আতঙ্কিত হয়ে আমেরিকা ও ভারতের পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমান তত্ত্বধায়ক সরকার ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পতাকাবাহী আওয়ামী লীগকে একটা প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু হাইকোর্টে জামিন পেয়ে বেগম জিয়া জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর পরিস্থিতি বদলে যাওয়ায় এবং নির্বাচন কমিশন সকল দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে বাধ্য হয়ে নির্বাচনের তারিখ মাত্র ১১ দিন পিছিয়ে দেওয়াতে শেখ হাসিনা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছেন। তার দাবি অনুযায়ী ১৮ ডিসেম্বর নির্বাচন হলে চার দলীয় জোটকে নির্বাচনের বাইরে থাকতে বাধ্য করার যে চক্রান্ত করা হয়েছিল, তা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি এ অভিযোগ তুলেছেন। প্রতিশ্রুত 'লেভেল প্লেইং ফিল্ড' তৈরি করতে সরকার গড়িমসি করে বিলম্ব না করলে নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করার প্রয়োজন হতো না। এর জন্য চার দলীয় জোটের কোনো দোষ নেই। মাত্র ১১ দিন পিছিয়ে দেওয়াতে এ জাতীয় আপত্তি তুলে শেখ হাসিনা গোপন আতঙ্কই প্রকাশ করলেন। তিনি নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার যে নিশ্চয়তা নিয়ে উৎফুল্ল হয়ে আমেরিকার আর্শিবাদ নিয়ে দেশে ফিরে এসেছিলেন তা এখন অনিশ্চিত হয়ে গেল বলে পেরেশান হয়েই এমন আজব অভিযোগ করলেন।

পরাশক্তি কাদেরকে দালাল নিযুক্ত করল?

বাংলাদেশকে ইসলামমুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য পরাশক্তি এ দেশে কাদেরকে দালাল নিয়োগ করেছে তা সম্প্রতি প্রকাশ পেয়ে গেছে। প্রখ্যাত কলামিস্ট, আন্তর্জাতিক রাজনীতির দক্ষ বিশ্লেষক জনাব ফরহাদ মজহার ২২ নভেম্বর (২০০৮) দৈনিক নয়া দিগন্তে 'নির্বাচন, ধর্মনিরপেক্ষতা ও দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন সমরনীতি'

শিরোনামে লিখিত নিবন্ধে আমেরিকার বিখ্যাত 'হারভার্ড ইন্টারন্যাশনাল রিভিউ' নামক ম্যাগাজিনে ১৯ নভেম্বরে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। প্রবন্ধটির শিরোনাম, 'Stemming the rise of Islamic Extremism in Bangladesh.' (বাংলাদেশে ইসলামী চরমপন্থার উত্থান প্রতিরোধ করা)।

প্রবন্ধটির লেখকদের পরিচয়

প্রবন্ধটির দুজন লেখক। প্রথমেই লেখকদ্বয়ের পরিচয় দিয়ে লেখা হয়েছে :

১. সজীব এ ওয়াজেদ, বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার একজন উপদেষ্টা। বেশ কয়েক উপলক্ষে তিনি প্রধান সমঝোতা আলোচকের ভূমিকা পালন করেছেন। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশে গণতন্ত্র বহালের ব্যাপারে বর্তমান সামরিক সরকারের সাথে সমঝোতা-আলোচনার করেছেন। (এখানে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে বাংলাদেশ সেনাপ্রধানের সাথে তার সাক্ষাতের)।

২. কার্ল জে সিওভাককো যিনি সেনা কর্মকর্তা হিসেবে ইরাক ও সৌদি আরবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

এ দুজন যৌথভাবে প্রবন্ধটি রচনা করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, মার্কিন সেনা কর্মকর্তার সাথে সজীব ওয়াজেদ বাংলাদেশের ব্যাপারে যৌথভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন।

প্রবন্ধটির ভূমিকা

'১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হয়ে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ একটি সেক্যুলার মুসলিম রাষ্ট্রই ছিল। বার বার সামরিক অভ্যুত্থান সত্ত্বেও দেশটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবেই সবসময় মূলের দিকে ফিরে এসেছে। অবশ্য দেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পবিত্রতাকে বিপন্ন করার মতো নতুন আপদ দেখা যাচ্ছে, যা দেশটিকে ইসলামের দিকে অগ্রসরমান করে দিতে পারে। জরুরি অবস্থায় পরিচালিত সামরিক শাসন যখন গত দুবছর ধরে রাজনৈতিক অবৈধতার শিকার, তখন দেশের শাসনতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিমূলের জন্য ইসলাম প্রচণ্ড হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

'আগামী ডিসেম্বরে যে নির্বাচন হচ্ছে, তাতে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রধান দুটো রাজনৈতিক দলের ঠেলাঠেলিতে প্রত্যেক পার্টির দৃষ্টিতে ইসলাম ও সরকারের সংমিশ্রণই প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়াবে। শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ দীর্ঘদিন থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পতাকাবাহী। এ দলটি যদি নির্বাচিত হয় তাহলে তারা বাংলাদেশে ইসলামের অগ্রগতিকে রোধ করতে পারবে। অবশ্য আওয়ামী লীগ যদি

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও গণতন্ত্রের দীর্ঘ স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা চায় তাহলে তাদেরকে ইসলামের প্রতিরোধের জন্য বেশ কতক বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। যদি এতে তারা সফল হয় তাহলে আওয়ামী লীগ পরিচালিত বাংলাদেশ বিশ্বে একটি মুসলিম দেশের আদর্শ নমুনা হতে পারে।'

এ ভূমিকার পর দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে আওয়ামী লীগ সরকারের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি প্রদান করা হয়েছে, যা এ লেখায় উল্লেখ করা সম্ভব হলো না। তবে কর্মসূচির শুরুতে পাঁচ দফা কর্মসূচির যে সারসংক্ষেপ রয়েছে, তা এ প্রবন্ধে দিয়ে দিচ্ছি।

বাংলাদেশের ব্যাপারে ইসলামাতঙ্কের কারণ

বাংলাদেশে ইসলামের অগ্রগতির একটা চিত্র প্রবন্ধটিতে তুলে ধরা হয়েছে, যা প্রবন্ধ রচয়িতাদের অন্তরে প্রচণ্ড আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে যেসব তথ্য এতে পরিবেশন করা হয়েছে, এর কোনো সূত্রের উল্লেখ নেই। প্রবন্ধের অন্যতম লেখক সজীব ওয়াজেদই হয়ত এসব তথ্য সংগ্রহ করে থাকবেন।

বাংলাদেশে হলুদ সাংবাদিকতার বদৌলতে এবং সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া যে চরম মিথ্যাচার ও অপপ্রচার চালায় তা থেকেই যে উক্ত তথ্যাবলি যোগাড় করা হয়েছে তা সহজেই ধরা পড়ে। নিম্নের তথ্যাবলি এ জাতীয় মিথ্যাচারেরই প্রমাণ।

তথ্যাবলি নিম্নরূপ

১. সামরিক শাসনের দু বছর ও বিএনপি শাসনের পাঁচ বছরে ইসলামী চরমপন্থিদের উত্থানে উৎসাহ পাওয়ার ফলে আগামী নির্বাচনের আগে ও পরে আওয়ামী লীগকে ইসলামী আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য অত্যন্ত কঠিন যুদ্ধের মুকাবিলা করতে হবে। ২০০১ সালে বিএনপি জামায়াতে ইসলামীকে জাতীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করার ফলেই ইসলামপন্থিদের উত্থান সম্ভব হয়েছে। বিএনপি জামায়াতে ইসলামীকে কোয়ালিশন সরকারে শামিল করায় সরকারি পর্যায়ে ইসলামের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. জামায়াতে ইসলামীর উগ্র ইসলামী মৌলবাদী অবস্থানের উপর বিএনপি অত্যন্ত নির্ভরশীল। ইসলামপন্থিরা পাকিস্তানের সাথে আবার যুক্ত হতে চায়। (এর প্রমাণ কী তা বলা হয়নি)।

৩. ২০০৫ সালে ইসলামী জঙ্গিবাদীরা যে সারা বাংলাদেশে ৫০০ বোমা একসাথে বিস্ফোরণ ঘটায়, তার সাথে জামায়াতে ইসলামী ও বিএনপি'র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। এসব জঙ্গিবাদী গ্রুপ জামায়াতে ইসলামীরই সশস্ত্র বাহিনী। এরা

শাসনতন্ত্রকে অস্বীকার করে এবং গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে উৎখাত করে শরীয়া আইনের সরকার কায়েম করতে চায়।

(অথচ বিএনপি-জামায়াত কোয়ালিশন সরকারই জঙ্গিদেরকে সফলভাবে দমন করেছে এবং এর ৬ জন প্রধান ব্যক্তিকে আদালতে বিচার করে ফাঁসি দিতে সক্ষম হয়েছে। শেখ হাসিনার আমলে যশোর, পল্টন ময়দান ও রমনা বটমূলের তিনটি বোমা হামলায় ৩৫ জন লোক নিহত হলো। কিন্তু বিচার তো দূরের কথা কোনো তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়নি।)

৪. বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীতে ইসলামী চরমপন্থিদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। মাদরাসাসমূহে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, যাতে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মাদরাসার ছাত্ররা সেনাবাহিনীতে ঢুকতে পারে। ২০০১ সাল পর্যন্ত তারা মাত্র শতকরা ৫ জন ঢুকতে পেয়েছে। কিন্তু ২০০৬ সালে বিএনপি'র শাসনামলে শতকরা ৩৫ জন ঢুকেছে। (এসব আজব তথ্যের কোনো সূত্রের উল্লেখ করা হয়নি)।

৫. বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ সরকার পদ্ধতির উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান গোটা রাজনৈতিক ব্যবস্থাই অরক্ষিত হয়ে পড়েছে। আওয়ামী লীগ কি ইসলামের অগ্রগতি রোধ করতে সক্ষম হবে? গত পাঁচ বছরে বোরকার বিক্রয়ের হার শতকরা ৫০ বেড়ে গেছে। (কারা কবে এ জরিপ করল তার উল্লেখ নেই)।

ক্ষমতাসীন হলে আওয়ামী লীগের প্রধান করণীয়

প্রবন্ধে আওয়ামী লীগের জন্য মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে সেনা কর্মকর্তার দেওয়া যে বিরাট কর্মসূচি রয়েছে, এর সারমর্ম নম্বর দিয়ে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে, যা নিম্নে উদ্ধৃত করছি :

১. মাদরাসার সিলেবাসকে আধুনিকায়ন করতে হবে, যাতে সেখানেও সেক্যুলার লোক তৈরি হয়।
২. প্রাথমিক শিক্ষাকে ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং (ইসলামপন্থিদের হাসপাতালের মুকাবিলায়) সেক্যুলার হাসপাতাল কায়েম করতে হবে।
৩. সশস্ত্র বাহিনীতে সেক্যুলার মনোভাবের ছাত্রদেরকে বেশি সংখ্যায় ভর্তি করতে হবে।
৪. বিশিষ্ট ধর্মনেতাদেরকে চাকরি দিয়ে পুনর্বাসন করতে হবে।
৫. দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার অবসান করতে হবে।

এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রগতি রোধ করা সম্ভব হবে এবং বাংলাদেশ এর ধর্মনিরপেক্ষতার মূলে ফিরে আসবে।

পরাশক্তি একমাত্র জামায়াতে ইসলামীকেই আপদ মনে করে

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের নিকট ইসলামও অন্য ধর্মের মতোই একটি অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম। তাই যারা ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের কথা বলে, তাদেরকে ইসলামী চরমপন্থি মনে করে। সে কারণেই জামায়াতে ইসলামীর অগ্রগতিকে তারা স্বাভাবিক কারণেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের জন্য মহাবিপদ গণ্য করে।

বাংলাদেশে অনেক ইসলামী রাজনৈতিক দল রয়েছে; কিন্তু বিদেশি যারা বাংলাদেশে আসে তারা একমাত্র জামায়াতে ইসলামীকেই ইসলামী চরমপন্থি মনে করে। তাই আমেরিকা, ইউরোপ ও জাতিসংঘ থেকে যেসব ডেলিগেশন আসে তারা রাজনৈতিক নেতা হিসেবে বেগম জিয়া, শেখ হাসিনা ও জেনারেল এরশাদের সাথে দেখা করে। আর ইসলামী দলের নেতা হিসেবে একমাত্র আমীরে জামায়াত মাওলানা মুতিউর রহমান নিজামীর সাথে সাক্ষাৎ করে।

৩৫২.

শেখ হাসিনার শাসনকাল

১৯৯৬ সালের জুন থেকে ২০০১ সালের জুন পর্যন্ত পূর্ণ পাঁচ বছর শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার শাসনকাল সম্পর্কেই বেশ কয়েক কিস্তি লিখতে চাই।

২৬৮ নং কিস্তি লেখার সময় 'বাংলাদেশে গণতন্ত্র' শিরোনামে লিখতে গিয়ে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর শেখ হাসিনার আসল রূপ সম্পর্কে কিছু কথা লেখা হয়েছে, যা ৭ম খণ্ডের ১৪৮ পৃষ্ঠায় আছে।

২৮৮ নং কিস্তি লেখার সময় 'শেখ হাসিনার হিংস্র রাজনীতি' শিরোনামে কিছু কথা লেখা হয়েছে, যা ৭ম খণ্ডের ২২৭ থেকে ২২৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশ পেয়েছে।

ইতঃপূর্বে উপরিউক্ত তিনটি কিস্তিতে প্রসঙ্গক্রমে শেখ হাসিনার শাসনকালের কিছু বিবরণ সংক্ষেপে এসে গেছে। এখন ধারাবাহিকভাবে তাঁর শাসনকাল সম্পর্কে বিস্তারিত লিখছি। এতে কোথাও কোথাও পুনরাবৃত্তি হওয়া অসম্ভব নয়। চেষ্টা করব যাতে তা বেশি পরিমাণে না হয়।

তার পাঁচ বছরের শাসনকালের ঘটনাবলি বছর হিসেবে ধারাবাহিক বিবরণের পরিবর্তে তার গোটা শাসনকালে তিনি যা কিছু করেছেন এর মধ্যে বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর কার্যাবলির বিবরণ দিচ্ছি। তিনি জনগণ ও দেশের জন্য কল্যাণকর

তেমন কিছু করেছেন বলে আমার ধারণা জন্মেনি। তার নেতিবাচক কার্যাবলি এতটা মারাত্মক যে, তার ইতিবাচক কিছু থাকলেও তা আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

দুর্ভাগ্যের পাঁচ বছর

শেখ হাসিনার পাঁচ বছরের শাসনকালকে আমি দুর্ভাগ্যের পাঁচ বছর বলতে বাধ্য হচ্ছি। তার শাসনকালে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আদর্শিক ও ধর্মীয় দিকের একটিতেও ইতিবাচক ও কল্যাণকর কোন ভূমিকা তালাশ করে পাচ্ছি না। দেশকে গড়ে তোলার কোন উদ্যোগ তিনি নেননি। গড়ার বদলে ভাঙার গানই তিনি গেয়েছেন। এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধানের নামে দেশের স্বাধীনতাকেই বিপন্ন করেছেন।

আগস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে যারা দেশবাসীকে স্বৈরশাসন থেকে মুক্ত করে স্বাধীন দেশের নাগরিকত্বের মর্যাদা পুনর্বহাল করলেন তাদেরকে প্রহসনমূলক বিচারের মাধ্যমে ফাঁসি দেবার অপচেষ্টা করে জনগণকে তিনি চরমভাবে অপমান করেছেন। যে বিপ্লবকে গোটা জাতি স্বাগত জানাল— তিন সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ বাহিনী ও বেসামরিক প্রশাসন পূর্ণ সমর্থন দান করল, এমনকি আওয়ামী লীগের নেতা ও এমপিগণ পর্যন্ত মুশতাক সরকারে শরীক হলেন এবং মুজিব আমলের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণ মুশতাকের মন্ত্রিসভায় যোগদান করলেন, শেখ হাসিনা ঐ বিপ্লবীদেরকে ফৌজদারি আইনের আওতায় সাধারণ খুনী হিসেবে বিচার করে জনগণের অন্তরে কঠোর আঘাত হানলেন। তার শাসনামলের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন শিরোনামে উল্লেখ করছি :

১. বাংলাদেশকে পৈতৃক সম্পত্তির মতো ব্যবহার করা

গত পাঁচ বছর শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে তার পৈতৃক সম্পত্তির মতো ব্যবহার করে তিন ধরনের কর্মসূচি পালন করেন :

১. শেখ মুজিবকে জাতির পিতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।
২. দেশে যত রকম প্রতিষ্ঠান, স্থাপনা ও সংস্থা রয়েছে, যা কোন ব্যক্তির নামের সাথে যুক্ত নয়, সেসবের সাথে তার পিতা-মাতা, ভাইবোন ও আত্মীয়দের নাম সম্পৃক্ত করা।
৩. দেশের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হল, হাটবাজার, ঘাট, ব্যাংক, বীমা, সরকারি খাস জমি ও বস্তি এলাকা দলীয় লোকদের দখলে আনা এবং সকল প্রকার পেশাজীবী সমিতির কর্তৃত্ব দলীয় লোকদের হাতে তুলে দেওয়া। জাতির পিতার ইস্যু—কোন ব্যক্তিকে জাতির পিতার মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টি জনগণের আবেগের সাথে জড়িত ; শক্তি প্রয়োগ করে বা আইনের দাপটে ঐ আবেগ সৃষ্টি করা যায় না।

প্রথম কর্মসূচি : জাতির পিতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে শেখ মুজিবের নেতৃত্ব জনগণের কাছে অবশ্য স্বীকৃত। ১৯৭২ সালে শেখ মুজিব ক্ষমতাসীন হওয়ার সময় তিনি নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। তারই নেতৃত্বে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়। তখন আওয়ামী লীগের একদলীয় শাসনই কায়েম ছিল। দলীয় লোকেরা শেখ মুজিবকে জাতির পিতা বললেও দেশের সংবিধান জনগণকে জাতির পিতা বলতে বাধ্য করেনি। তিন বছরের মধ্যে শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। তার শাসনামলে জনগণ চরম হতাশায় পতিত হয়। '৭৪-এর দুর্ভিক্ষে লাখ লাখ লোক মারা যায়। তার দলের লোকেরা রিলিফের মাল লুটপাট করায় জনগণের দুর্দশা চরমে পৌঁছে। শেখ মুজিব নিজেই তার দলকে 'চোরের খনি' অভিধায় উল্লেখ করেন। রিলিফ থেকে নিজের ভাগের কম্বলটিও উদ্ধার করতে তিনি ব্যর্থ হন। আওয়ামী লীগ বিরোধী রাজনীতি সচেতন লোকেরা মেজর জলিলের নেতৃত্বে জাসদের সাথে জড়িত হয়ে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং বিকল্প শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এ পরিস্থিতি মোকাবেলার উদ্দেশ্যে '৭৫-এর জানুয়ারিতে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করে গণতন্ত্র ধ্বংস করা হয় এবং একদলীয় স্বৈরশাসন কায়েমের ব্যবস্থা করা হয়। দেশে স্লোগান চালু করা হয়- 'এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ'।

এভাবে শেখ মুজিব দেশের মহারাজা হয়ে চরম একনায়কত্ব কায়েম করেন। আয়তনে খুব ছোট এ বাংলাদেশটিতে ৬১ জন আওয়ামী লীগ নেতাকে গভর্নর (রাজা) নিযুক্ত করেন। তিনি সকল রাজনৈতিক দলকে বেআইনী ঘোষণা করে বাকশাল নামে একটি দল গঠন করেন। সেনাবাহিনী, পুলিশ ও প্রশাসন কর্মকর্তা, অধ্যাপক, সাংবাদিক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতিসহ সকল পেশার লোকদের বাকশালে যোগদান করতে নির্দেশ দেন।

১৫ আগস্টের পর পরই ৬১ জন গভর্নরের শপথ গ্রহণ করার কথা ছিল, প্রত্যেক এলাকার সেনাবাহিনী, পুলিশ ও সরকারি কর্মচারী এবং বাকশাল দলটি একজন গভর্নরের নিয়ন্ত্রণে থাকার কথা ছিল। যদি রুশমার্কা এ ব্যবস্থা চালু হয়ে যেত, তাহলে এ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোন পথই আর থাকত না। শেখ মুজিবের বংশীয় রাজতন্ত্রই কায়েম হয়ে যেত। নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের সকল পথ এভাবেই বন্ধ করার ষড়যন্ত্র করা হয়। এ মারাত্মক ব্যবস্থাটি চালু হওয়ার পূর্বক্ষণে যদি '৭৫-এর ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান না ঘটত তাহলে আজও এ দেশ শেখ বংশীয় গোলামির জিঞ্জিরেই আবদ্ধ থাকত।

দ্বিতীয় কর্মসূচি : সব প্রতিষ্ঠানের সাথে নামযুক্ত করা

দেশের যত প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও স্থাপনার সাথে কোন মানুষের নাম যুক্ত নেই, সেসবের সাথে শেখ হাসিনার পিতা, মাতা, ভাই, বোন ও আত্মীয়-স্বজনের নাম যুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

'যমুনা সেতু'র নাম 'বঙ্গবন্ধু সেতু' হওয়ার বহু আগে থেকেই লোকের মুখে মুখে ছিল। এর সাথে বঙ্গবন্ধু শব্দ জুড়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু নামকরণ করা হয়, কিন্তু জনগণ এটাকে 'যমুনা সেতু'ই বলে। তাই যমুনা শব্দ বাদ দিয়ে শুধু 'বঙ্গবন্ধু সেতু'ই নামফলকে লাগিয়ে এ নাম বলতে বাধ্য করার চেষ্টা করা হলো। কিন্তু আমি উত্তরবঙ্গে বহু জনসভা ও পথসভায় লোকদের এ সেতুর নাম জিজ্ঞেস করায় তারা সবাই 'যমুনা সেতু'ই বলল। মানুষের মনের উপর জোর-জবরদস্তি চলে না। পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিকেল ইনস্টিটিউটকে বহু বছর থেকে সবাই পিজি হাসপাতালই বলে এসেছে। এটাকে বিশ্ববিদ্যালয় মানে উন্নীত করে বঙ্গবন্ধু নাম এতে যুক্ত করা হলো। নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি করে এ নাম যুক্ত করলে অযৌক্তিক হয় না। কিন্তু পুরাতন প্রতিষ্ঠানের একটা পরিচিত নাম বদলিয়ে শেখ হাসিনার পিতার উপাধি যুক্ত করা কি শোভন হয়েছে? নমুনাস্বরূপ এ দুটো উদাহরণ দেওয়া হলো। অগণিত প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও স্থাপনার সাথে শেখ হাসিনার পিতা, মাতা ও ভাইবোনের নাম যুক্ত করা দ্বারা দেশের বা জনগণের কোন খেদমত বা কল্যাণ হয়েছে? বাংলাদেশটা যেন তার পৈতৃক সম্পত্তি, তাই সর্বত্র তাদের নাম কায়েম রাখতে হবে।

তার শাসনের শেষ তিন মাসে এমন অগণিত প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে, যার নির্মাণকাজ কবে শুরু হবে তা অনিশ্চিত। শেষ ১৫ দিনে তো দৈনিক তিন-চারটি করে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এমনকি তার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও দু'দিন জোর করেই ক্ষমতা আঁকড়ে রেখে আরও কয়েকটি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এর উদ্দেশ্য একটাই, তার নামফলকের কারণে নতুন সরকারের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জায়গা যাতে তেমন অবশিষ্ট না থাকে।

সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন হতে হবে। প্রশাসন ও পুলিশকে তিনি চরম দলীয়করণের ভিত্তিতে যেভাবে সাজিয়ে রেখে গেলেন সে আবর্জনা অপসারণ করতেই কেয়ার-টেকার সরকারের দু'মাস লেগে যাওয়ার কথা। অথচ তিনি চরম স্বেচ্ছাচারিতা করে দু'দিন বিনষ্ট করে কেয়ার-টেকার সরকারের জন্য ৮৮ দিন সময় দিলেন। ১৫ তারিখে আওয়ামী লীগের জনসভায় প্রধানমন্ত্রীর দাপট দেখিয়ে রেডিও ও টিভিকে অপব্যবহারের মহৎ উদ্দেশ্যেই ঐ দু'দিন জোর করে ক্ষমতায় থাকলেন। দেশটা তার পৈতৃক সম্পত্তি। তাই মহামান্য প্রেসিডেন্টও তার এ স্বেচ্ছাচার রোধ করার সাহস পাননি। এমনকি

কেয়ার-টেকার সরকারপ্রধানের শপথ অনুষ্ঠানের সময়টুকু পর্যন্ত তার নির্দেশে বঙ্গভবনের মুদ্রিত দাওয়াতপত্রে পরিবর্তন করতে হয়। তার সে দাপট এখনও অব্যাহত আছে। তার সেট করা প্রশাসন ও পুলিশ কর্মকর্তাদের বদলি করায় তিনি কেয়ার-টেকার সরকারের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে যা তা বলে চলেছেন। তার দাবি এই যে, নির্বাচিত সরকার হিসেবে তার এমনই মর্যাদা যে, তার মনোনীত সরকারি কর্মকর্তাদের বদলি করার কোন অধিকারই অনির্বাচিত সরকারের থাকতে পারে না।

তৃতীয় কর্মসূচি : পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে দেশের সব কিছুতে দখলিস্বত্ব চাই

শেখ হাসিনার পাঁচ বছর দুই দিনের শাসনকালে দেশের সব কিছু তার আত্মীয় ও দলীয় লোকদের মৌরসী-পাট্টা। এ বিষয়ে সারাদেশের ফিরিস্তি এক সময় হয়তো তৈরি হবে– অন্যায় দখল উচ্ছেদের প্রয়োজনে। এখানে স্বল্পপরিসরে কিছু উদাহরণই যথেষ্ট মনে করি।

১. সেনাবাহিনীতে অনেক যোগ্য জেনারেল থাকা সত্ত্বেও শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হওয়ার কারণে একজন অবসরপ্রাপ্ত অযোগ্য জেনারেলকে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি সেনাবাহিনীর মান বৃদ্ধি করেছেন, না হ্রাস করেছেন তা পরবর্তী সরকার তদন্ত করলেই বিস্তারিত জানা যাবে। তিনি আওয়ামী লীগের সবচেয়ে বিরাট একটি খেদমত করেছেন। সকল ক্যান্টনমেন্টে আওয়ামীপন্থি কয়েকটি পত্রিকা ছাড়া সকল পত্রিকার প্রবেশ নিষিদ্ধ করে সেনাবাহিনীর লক্ষাধিক জনশক্তিকে হাসিনাপন্থি বানানোর অপচেষ্টা করেছেন। ঐ জঘন্য নিষেধাজ্ঞা এখনও বলবৎ রয়েছে বলে জানলাম।

২. সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরকে অপসারণ করে শেখ হাসিনার বংশবদ লোকদের বসানো হয়েছে। গত পাঁচ বছরে তারা সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসেবে দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতেই নিয়োগের ব্যবস্থা করেছেন। শেখ হাসিনার নিয়োজিত ভাইস চ্যান্সেলরদের উপর সবচেয়ে বড় ও মহান দায়িত্ব ছিল, শেখ হাসিনার সোনার ছেলেদের হল ও ইউনিভার্সিটিতে পূর্ণ দখলিস্বত্ব দান করা এবং অন্যান্য ছাত্র সংগঠনকে উৎখাত করে ছাত্রলীগকে একচেটিয়া কর্তৃত্ব দেওয়া।

৩. দেশের সকল কলেজ গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ও স্কুল কমিটির চেয়ারম্যান পদে দলীয় নির্ভরযোগ্য লোকদের বসিয়ে দেওয়া, যাতে দলীয় আনুগত্যের নিশ্চয়তা ছাড়া কোন শিক্ষক নিয়োগ না পায়।

৪. যত পেশাজীবী সমিতি রয়েছে তাতে নেতৃত্বের পদে দলীয় লোকদের বসানোর জন্য সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করে যত রকম ষড়যন্ত্র ও নির্লজ্জ ভূমিকা পালন করা সম্ভব তা করতে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সুপ্রীম কোর্ট বার সমিতি

ও জেলা বার সমিতি, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি সমিতি থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রেই দলীয়করণের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে ত্রুটি করেননি।

৫ সম্পদ দখলের ব্যাপারটা বিরাট। ব্যাংক, বীমা, গাড়ি, সরকারি খাস জমি, বস্তি, হাট-বাজার ও ঘাটের ইজারা, দুর্বল লোকদের বাড়ি-ঘর ও জমিজমা দখল ইত্যাদির জন্য শেখ হাসিনা তার দলের সবাইকে অবাধ লাইসেন্স দিয়েছেন। মন্ত্রী ও মন্ত্রিপুত্র, প্রভাবশালী আওয়ামী নেতা ও দলীয় ক্যাডার হলে তো পুলিশের বাপেরও সাধ্য নেই বাধা দেওয়ার। থানার দারোগা আসল দারোগা নয়। দলীয় নেতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দারোগার কিছুই করার সাধ্য ছিল না। তাই কোন দখলি কেসই থানা গ্রহণ করেনি। এভাবে গোটা দেশে আওয়ামী লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করা হয়। কেউ মামলা করলে সে বাদীকেই পালিয়ে জান বাঁচাতে হয়। শেখ মুজিবের সাড়ে তিন বছরের শাসনে আওয়ামী লীগ দলীয় বিরাটসংখ্যক নতুন ধনপতি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। হাজার হাজার কোটি টাকার রিলিফের সম্পদও তারা দখল করে। শেখ হাসিনার পাঁচ বছর শাসনামলে তার দলের কোন কর্মী হয়তো সম্পদ আহরণে বঞ্চিত হয়নি। একটি বিরাট ধনিক শ্রেণী সৃষ্টি করে শেখ হাসিনা এমন একটি অবস্থান অর্জন করেছেন যে, আগামী নির্বাচনে ক্ষমতাসীন হতে না পারলে বিরাট শক্তি প্রদর্শনের যোগ্যতা প্রয়োগ করে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা কায়েম করতে পারবেন।

৬. দখলের তালিকায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো শেখ হাসিনার গণভবন দখল। তিনি জাতির পিতার কন্যা, আওয়ামী লীগ প্রধান ও সর্বাপেক্ষা শক্তিধর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ছোট-খাটো কোন সম্পত্তি দখল করলে মোটেই মানায় না। তিনি দাপটের সাথেই সাংবাদিকদের কাছে পূর্ণ আস্থাসহকারে দাবি করেছেন যে, যদ্দিন তিনি রাজনীতি করবেন তদ্দিন গণভবনেই থাকবেন।

পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার নিশ্চিত ব্যবস্থা করেই তো তিনি অল্পদিনের জন্য ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন। তাই তিন মাস পরই আবার তাকে যখন গণভবনে আসতেই হবে, তখন খামাখা তল্পিতল্পা নিয়ে যাওয়া-আসার প্রয়োজন কি? কিন্তু শেখ হাসিনা বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে দেখলেন যে, তারই সুপারিশকৃত প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে। যে প্রধান বিচারপতি তার মন্ত্রীদের লাঠির ভয়ে চুপ থাকতে বাধ্য ছিলেন, তিনি কেয়ার-টেকার সরকারপ্রধান হয়ে তার লোকদের বদলি করার দুঃসাহস দেখাচ্ছেন। এ অবস্থায় নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর সকল রাজনৈতিক দলের দাবিতে এবং কেয়ার-টেকার সরকারের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করার জন্য তাকে গণভবন ত্যাগ করতে বাধ্য করাও অসম্ভব নয়। তাই ইজ্জত

থাকতেই সরে পড়া উচিত মনে করে হয়তো তিনি গণভবন ছেড়ে দিলেন। কিন্তু গণভবন দখল করে যে কলঙ্কের ভাগী হলেন তা তো স্থায়ীভাবে তার কপালে লিখিত থাকবে।

২. গণতন্ত্র হত্যার অপচেষ্টা

'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন' প্রবচনটি মনে আসে, যখন শেখ হাসিনাকে 'গণতন্ত্রের মানসকন্যা' বলা হয়। তার কথা, কাজ, মেজাজ ও আচরণে গণতান্ত্রিকতার সামান্য গন্ধও যে পাওয়া যায় না, সে কথা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই লিখছি। এ দেশকে সোনার বাংলা বানানোর জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন এর সকল স্বপ্নই তার পিতা দেখতেন বলে তিনি দাবি করেন। যমুনা সেতু নাকি তারই পিতার স্বপ্ন। মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ও তারই স্বপ্ন। শেখ হাসিনা তার পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যই গত পাঁচ বছর সব কিছু করেছেন। আবার ক্ষমতায় যেতে পারলে অবশিষ্ট স্বপ্ন বাস্তবে রূপদান করার অভিলাষ রাখেন। সত্যি সত্যিই তার পিতা এতসব স্বপ্ন দেখেছিলেন কি-না তা দেশবাসীর জানার সুযোগ হয়নি। তবে একটি মহাস্বপ্ন যে তিনি দেখেছিলেন এবং তা কার্যকর করার আইনগত ও প্রশাসনগত প্রস্তুতি যে তিনি সম্পন্ন করেছিলেন, সে কথা দেশ-বিদেশের সবার জানার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি এ দেশের একচ্ছত্র বাদশাহ হতে চেয়েছিলেন। ৬১ জন গভর্নরের গভর্নর জেনারেল হওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এর জন্য প্রথমত ১৯৭৫-এর জানুয়ারিতে জাতীয় সংসদে শাসনতন্ত্রের ৪র্থ সংশোধনী মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে পাস করিয়ে দিলেন।

আওয়ামী লীগের বিশাল পার্লামেন্টারি পার্টি পরম উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদর্শন করে আদর্শ গণতান্ত্রিক দলের গৌরব অর্জন করে। বিনা আলোচনায় ও বিনা প্রতিবাদে সংসদে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির শাসনতন্ত্রকে তথাকথিত প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতিতে পরিণত করা হলো এবং আওয়ামী লীগসহ সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে 'বাকশাল' নামক একটি মাত্র দলে সেনাবাহিনী ও সরকারি কর্মকর্তাসহ দেশবাসী সবাইকে ঐ দলে যোগদান করার নির্দেশ দেওয়া হলো। "এক নেতা, এক দেশ, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ" শ্লোগান চালু করে গণতন্ত্রের বাংলাদেশী সংস্করণ আবিষ্কার করা হলো। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী ও ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন এর প্রতিবাদে সংসদ থেকে পদত্যাগ করার ধৃষ্টতা প্রদর্শনের সাহস কোত্থেকে পেলেন তা ঐ সময় ও পরিবেশে অবশ্য বিস্ময়েরই বিষয়। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, শেখ হাসিনা যা কিছু করেছেন সবই তার পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই করছেন। তাহলে শেখ মুজিবের বাকশাল পদ্ধতির শাসনও, যা তার মহাস্বপ্ন ছিল, তা কায়েমের জন্য মুজিবকন্যার সর্বশক্তি প্রয়োগ করাই স্বাভাবিক। কারণ এটাই ছিল শেখ মুজিবের সেরা স্বপ্ন। কিন্তু ঐ পদ্ধতি জনগণের কাছে এতটা ঘৃণিত ছিল যে, শেখ হাসিনা তার পিতার দেওয়া প্রিয় 'বাকশাল' নামটি বহাল করা কৌশলের খেলাপ মনে

করতে বাধ্য হয়েছেন। তবে শেখ হাসিনার গোটা শাসনামলে তার যাবতীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপে বাকশালী মনোবৃত্তি স্পষ্ট। তিনি সংসদকে পাশ কাটিয়ে এবং বিরোধী দলের মতামতের কোন তোয়াক্কা না করে দেশের এক-দশমাংশ এলাকা (পার্বত্য তিনটি জেলা) সম্পর্কে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, যা সর্বদিক দিয়ে মারাত্মক ক্ষতিকর বলে দেশবাসী মনে করে। বিশেষ করে অউপজাতি বাংলাদেশীদের ঐ তিন জেলায় নিজ দেশে পরবাসী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং জেলাগুলোকে উপজাতি এলাকা ঘোষণা করে বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য দেশের ঐ অংশে সম্পত্তির মালিক হওয়া ও ধনবান করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একইভাবে ভারতের সাথে জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে পানিচুক্তি করা হয়েছে।

বাকশালী সংসদ

জাতীয় সংসদকে বাকশালী পদ্ধতিতে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে বিরোধী দল সংসদ বর্জন করতে বাধ্য হয় এবং বিনা বাধায় স্বেচ্ছাচারমূলক আইন পাস করা যায়।

স্পিকারকে শেখ হাসিনা পূর্ণ আজ্ঞাবহ হতে বাধ্য করেছেন। তিনি স্বয়ং এবং তার মন্ত্রীগণ বিরোধীদলীয় নেত্রীসহ বিরোধী দলের প্রতি চরম অশালীন ভাষা ও আপত্তিকর আচরণ করে সংসদ বর্জন করতে বাধ্য করেছেন। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে বিরোধী দলকে সংসদে উপস্থিত রাখার আসল দায়িত্ব সরকারের। এতে অক্ষম হলে সরকার চরম ব্যর্থ বলে বিশ্বে গণ্য হয়। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি সামান্যতম আস্থাও যে শেখ হাসিনার নেই, তা এতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে। শেখ হাসিনার আচরণে সে কথাই বোঝা গেল যে, তিনি বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে পরম স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন, যাতে বাকশালী পদ্ধতিতে যে আইন খুশি তা বিনা বাধায় পাস করিয়ে দিতে পারেন। তথাকথিত জননিরাপত্তা আইন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য চরম কলঙ্কের পরিচায়ক। ১৯৭৪ সালে শেখ মুজিব বিরোধী দলীয় নেতাদেরকে বিনা বিচারে আটক করে গণতন্ত্রের যে সর্বনাশ করে গেছেন, শেখ হাসিনা ঐটুকুকেও যথেষ্ট মনে করেননি। কারণ ঐ আইনে যত লোককে গ্রেপ্তার করা হয়, হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস মামলা করলে সবার আটকাদেশই অবৈধ ঘোষণা হয়ে যায়। তাই রাজনৈতিক বিরোধীদের অন্যায়ভাবে আটক রাখার বাকশালী প্রয়োজন পূরণের জন্য এমন আইন তার দরকার, যাতে হেবিয়াস কর্পাসের সুযোগ পাওয়া তো দূরের কথা, জামিন পর্যন্ত যেন না পায়। তাই একদলীয় সংসদে 'জননিরাপত্তা আইন' নামে এক জঘন্য কালাকানুন পাস করা হয়। শেখ হাসিনা আইন-শৃঙ্খলার উন্নতির দোহাই দিয়ে সন্ত্রাস দমনের মহান উদ্দেশ্যেই এ আইন করা হচ্ছে বলে দাবি করেন। বিরোধী দল সংসদের বাইরে থেকে আপত্তি জানায় যে, এ আইন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে।

নিশ্চয়তা দিয়ে শেখ হাসিনা এ আশঙ্কা অমূলক বলে জনগণকে আশ্বাস দিলেন। এ কালাকানুন পাস হওয়ার পর পরই দেখা গেল একদিকে সরকারি দলের মস্তানদের সন্ত্রাস ব্যাপকভাবে বেড়ে গেল, অপরদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঐ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে পুলিশ বাহিনীকে সন্ত্রাসীর ভূমিকায় অবতীর্ণ করে বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের পাইকারি হারে আসামি করার ব্যবস্থা নিলেন। ছাত্রদের উপরও এ আইন প্রয়োগ করা হলো। এমনকি মাদরাসার নিরীহ ছাত্র ও আলেম সামাজের ওপরে পর্যন্ত সন্ত্রাসী হিসেবে এ আইন প্রয়োগ করে নির্যাতন চালাল।

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে বিনা ওয়ারেন্টে রাত ১২ টায় গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশ ডাকাতের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। বায়তুল মোকাররম মসজিদে লোকেরা আশ্রয় নিলে পুলিশ সেখানেও হামলা করে ৫/৬শ' লোককে (সাধারণ মুসল্লীসহ) গ্রেপ্তার করে বাকশালী গণতন্ত্রের নমুনা দেখাল। এ আইনের দাপটে এখনও লক্ষাধিক লোক হয় পলাতক, আর না হয় বিনা বিচারে আটকা পড়ে আছে।

বিচার বিভাগের উপর জঘন্য হামলা

আমাদের দেশে কোন সরকারের আমলেই বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের প্রভাবমুক্ত করার শাসনতান্ত্রিক দাবি পূরণের চেষ্টা করা না হলেও ইতঃপূর্বে কখনও বিচার বিভাগের উপর প্রকাশ্য হামলা করা হয়নি।

স্বাধীন বিচার বিভাগ গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের অন্যতম ভিত্তি। শাসন বিভাগের যুলুম-নির্যাতন থেকে রেহাই পাওয়ার আইনগত আশ্রয়ই হলো বিচার বিভাগ। শেখ হাসিনার আমলেই সর্বপ্রথম হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের উপর জঘন্য হামলা শুরু হয়। এ হামলার উদ্বোধন করেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মিথ্যা মামলা দিয়ে যাদের গ্রেপ্তার করা হয় হাইকোর্টে তাদের জামিন দেওয়ায় বিক্ষুব্ধ প্রধানমন্ত্রী বিচারপতিদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত অশালীন ভাষায় মন্তব্য করেন। বিচারপতিদের কাছে সন্ত্রাসীরা আশ্রয় পায় বলে তিনি অভিযোগ করেন। তার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা হলে সুপ্রীম কোর্ট তাকে সতর্ক ও সংযত হয়ে কথা বলার পরামর্শ দেন। একজন প্রধানমন্ত্রীর জন্য এটা বড়ই লজ্জার বিষয় যে, আদালত থেকে এমন ভর্ৎসনা শুনতে হলো।

আদালত তো অশালীন ভাষা ব্যবহার করতে অভ্যস্ত নয়। তাই শেখ হাসিনার মতো কটুভাষীর মনে আদালতের সতর্কবাণী সামান্য লজ্জাবোধও সৃষ্টি করতে পারেনি। তিনি আবারও বিচারকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। আদালত আবারও তাকে ভর্ৎসনা করলেন। আদালতের উপর মনের ঝাল ঝাড়ার জন্য সংসদীয় নিরাপত্তার

সুযোগ নিয়ে সংসদ অধিবেশনেই তিনি বিচারপতিদের কঠোর সমালোচনা করলেন। এ বিষয়ে তিনিই বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করতে সক্ষম হলেন।

শেখ মুজিব হত্যা মামলায় কয়েকজন বিচারপতি বিব্রতবোধ করায় মহাবীর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও অন্যান্য কয়েকজন মন্ত্রীর নেতৃত্বে এক বিরাট জঙ্গি লাঠি মিছিল হয়। তাতে বিচারকদের হুমকি দেওয়া হয় যে, সঠিক বিচার না করলে কোথায় লাঠি মারতে হবে তা আওয়ামী লীগ জানে।

বিচারপতিদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয় যে, অমুক মাসের মধ্যে মামলার চূড়ান্ত রায় দিতে হবে। কী রায় দিতে হবে সে কথা ঘোষণা করতেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দ্বিধা করেননি। শেখ মুজিব বাকশালী ব্যবস্থায় বিচারপতিদের যে অসহায় অবস্থান নির্ধারণ করেছিলেন, তা-ই শেখ হাসিনার কাছে আদর্শ বলে মনে হওয়ার কারণেই তিনি এবং তার নির্দেশে মন্ত্রীগণ এ ভূমিকা পালন করা কর্তব্য মনে করলেন। চরম স্বৈরশাসকদের দেশেও বিচারপতিদের প্রতি এমন পাশবিক আচরণের কোন নজির নেই।

সরকারি কর্মকর্তাদের মর্যাদা

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচিত সরকার সাময়িক সরকার হিসেবে গণ্য। দলীয় মেনিফেস্টোর ভিত্তিতে নির্বাচনে বিজয়ী দল ক্ষমতাসীন হয়। আমলারা স্থায়ী সরকার। তারা কোন দলের পক্ষ বা বিপক্ষ শক্তির নয়; তারা সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্বশীল। নির্বাচিত সরকার পরিবর্তন হয়। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ জনগণের সেবক। যে দলই ক্ষমতাসীন হয় সে দলের মেনিফেস্টো অনুযায়ী সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব তারা পালন করে—এটাই গণতান্ত্রিক রীতি।

গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচিত সরকারের সাথে স্থায়ী সরকারের সম্পর্ক

নির্বাচিত সরকার দলীয় মেনিফেস্টোর পক্ষে জনগণের কাছ থেকে যে ম্যান্ডেট পেয়েছে সে অনুযায়ী সরকার যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা আমলা ও কর্মকর্তারা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করছে কিনা সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। এর ব্যতিক্রম যাতে না হয় সরকার এর তদারকি করবে।

নির্বাচিত সরকার আরও একটা বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য যেসব 'রুলস অব সার্ভিস' এবং 'কোড অব কন্ডাক্ট' রয়েছে তা তারা যথাযথভাবে মেনে চলছে কিনা তা দেখার দায়িত্বও নির্বাচিত সরকারের। সরকারি কর্মকর্তারা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ পায়। কোন রাজনৈতিক পরিচয় সেখানে ধর্তব্য নয়। নিয়োগ পাওয়ার পর তাদের প্রয়োজনীয় যত রকম ট্রেনিং দেওয়া হয় এর মধ্যে তাদের রাজনীতি নিরপেক্ষ থাকাও অন্যতম।

নির্বাচিত সরকার স্থায়ী সরকারকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেবে এবং উপরিউক্ত দুটো নীতি অনুযায়ী তদারকি করবে। আমাদের দেশে এ মানের গণতন্ত্র এখনই আশা করা যায় না। কিন্তু আমলাদের ব্যাপারে সামান্য যেটুকু মান চালু ছিল শেখ হাসিনা তা ধ্বংস করে দিয়ে গেলেন।

চরম স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরশাসন চালু করে সরকারি কর্মচারীদের বাকশালী মন্ত্রে দীক্ষিত করার যে মারাত্মক রীতি শেখ হাসিনা চালু করলেন তারই ফলে কেয়ার-টেকার সরকার বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হলো। 'সার্ভিস রুল' ও 'কোড অব কন্ডাক্ট' অমান্য করে সরকারের দেশ ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের পক্ষে কাজ করার জন্য শেখ হাসিনা তাদের বাধ্য করায় তাদের নিরপেক্ষ চরিত্র ধ্বংস হয়েছে। এতে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতে দেশের সর্বনাশ হয়েছে। পরবর্তী নির্বাচিত সরকার যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে সক্ষম হন তাহলে এসব মেধাবী ও যোগ্য কর্মকর্তাদের আবার দল-নিরপেক্ষ হিসেবে সংশোধন করা সম্ভব হতে পারে। এরা জাতির সম্পদ। এদের ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করা নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা দেশকে শেখ হাসিনার মতো গণতন্ত্রের দুশমনদের থেকে রক্ষা করুন।

রাজনৈতিক দলের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ

গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই জনসভা, মিছিল, হরতাল ও প্রতিবাদ করার অধিকার স্বীকৃত। শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে এসব অধিকার তিনি ভোগ করে এসেছেন। ১৯৮৩ সাল থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত দেশে এসব অধিকার মোটামুটি বহাল ছিল। অবশ্যই মাঝে মাঝে অধিকার হরণ করাও হয়েছে।

বিগত হাসিনা সরকারের আমলে দলীয় সন্ত্রাসীদের নেতৃত্বে এবং পুলিশ ও প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় এসব অধিকার ব্যাপকভাবে হরণ করা হয়। বিরোধী দলের আহূত জনসভার স্থলে একই সময় পাল্টা জনসভা ডেকে প্রশাসনকে ১৪৪ ধারা জারির পরিবেশ সৃষ্টি করা একটি জঘন্য পদ্ধতির প্রচলন। এটা শেখ হাসিনারই অনন্য অবদান। আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার আগেও জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাথে তাদের ছাত্র সংগঠন এ আচরণ বহু এলাকায় করেছে।

প্রত্যেক সরকারের আমলেই বিরোধী দল হরতাল ডেকেছে। হরতাল চলাকালে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বহাল রাখার উদ্দেশ্যে রাজপথে পুলিশ ও বিডিআর মোতায়েন করাতেও হরতাল পালনকারীরা কখনও আপত্তি করেনি। পুলিশ কোন বাড়াবাড়ি না করলে শান্তিপূর্ণভাবেই হরতাল পালনের ঐতিহ্য এ দেশে চালু ছিল।

শেখ হাসিনার আমলে হরতালের বিরুদ্ধে দলীয় ক্যাডারদের নেতৃত্বে এবং পুলিশের ছত্রছায়ায় রাজপথ দখলের বাকশালী পদ্ধতি নতুন করে চালু করা হয়েছে। বিরোধী

দলের মিছিলে হামলা, পুলিশের সামনে প্রকাশ্যে গুলী করে হত্যা করা ও মহিলাদের শাড়ি নিয়ে টানা-হেঁচড়া করার মতো ঘটনা পূর্ববর্তী কোন সরকারের আমলেই ঘটেনি। শেখ হাসিনার সশস্ত্র ক্যাডারদের জঙ্গি মিছিলে অত্যন্ত আক্রমণাত্মক মনোভাব লক্ষণীয় ছিল। বাকশালী গণতন্ত্র চালুর এ অপচেষ্টা ইতিহাস হয়েই রইল।

গড়ার নয়, ধ্বংসের যোগ্যতা

গণতান্ত্রিক বিশ্বে এ কথা স্বীকৃত যে, সরকারের কাজ আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের কর্মক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করা, এর এক বিভাগকে অপর বিভাগের উপর হস্তক্ষেপ করতে না দেওয়া, কোন বিভাগ যাতে ক্ষমতা ব্যবহারে বাড়াবাড়ি করতে না পারে সেজন্য এই তিন বিভাগের সম্পর্কে ভারসাম্য বজায় রাখা; সর্বোপরি বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাখা গণতন্ত্রের অবাধ বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হওয়ার আগেও দেশে উপরিউক্ত গণতান্ত্রিক মান যথাযথভাবে কায়েম ছিল না। মাত্র ১৯৯১ সাল থেকে নতুন করে গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু হয়। '৯৬ সাল থেকে আমাদের এ পথে অগ্রসর হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এ ব্যাপারে সামান্য যেটুকু মান ছিল তাও শেখ হাসিনা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে গেলেন। তিনি আইনসভাকে একদলীয় (বাকশালী) সংস্থায় পরিণত করলেন। শাসন ক্ষমতাকে স্বৈর পদ্ধতিতে পরিচালনা করে জাতীয় সংসদকে দলীয় রাজনীতির আখড়ায় পরিণত করেন। পল্টনী ভাষায় বক্তৃতা করে সংসদের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করলেন।

প্রশাসন ও পুলিশ বাহিনীকে শেখ হাসিনা দলীয় ক্যাডার হিসেবে ব্যবহার করে শাসন বিভাগের মান চরমভাবে বিনষ্ট করেছেন। আর বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের আজ্ঞাবহ বানানোর অপচেষ্টার ফলে আইনের শাসন বলতে আর কিছু অবশিষ্ট রইল না। এসব কথাই প্রমাণ করে যে, শেখ মুজিব ও শেখ কন্যা দেশ গড়ার কাজে কোন যোগ্যতার পরিচয় দিতে সক্ষম হননি। তারা ভাঙার যোগ্যতা নিয়েই রাজনীতি করেছেন।

ঘনিষ্ঠতম দীনী ভাই চলে গেলেন

ইসলামী আন্দোলনে যোগদানের পরপর আমার একান্ত ঘনিষ্ঠ সহকর্মী মাওলানা আবদুর রহমান ফকীরের ইন্তিকালে আমি এমন এক দীনী ভাইকে হারালাম, যিনি শুধু ময়দানেই নয়, জেলেও দীর্ঘ দিন সাথী ছিলেন।

মাত্র মাসখানেক আগে জনাব শামসুর রহমানের ইন্তিকাল উপলক্ষে দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত আমার বক্তব্যে উল্লেখ করেছিলাম যে, এখন আমার চেয়ে বেশি বয়সের মাওলানা আবদুর রহমান ছাড়া জামায়াতে বয়সে বড় আর কেউ নেই। মাত্র ৩৫ দিন পর তিনিও চলে গেলেন।

০৭.১২.'০৮ সন্ধ্যার পর ফোনে বগুড়ায় তাঁর জামাতা জনাব গোলাম রাব্বানি থেকে জানা গেল যে, তিনি শ্বাসকষ্টে দীর্ঘদিন থেকে এক অবস্থায়ই ছিলেন। হঠাৎ গতকাল অবস্থার অবনতি হয়। তার নিকট থেকে জানলাম যে, জনাব শামসুর রহমান সম্পর্কে পত্রিকায় প্রকাশিত আমার বক্তব্য তিনি পড়ে নাকি বলেছিলেন যে, তিনি আমার চেয়ে দু বছর বড়, তিন বছর নয়। তাঁর জন্ম নাকি ১৯২০ সালে। সে হিসেবে তিনি ৮৮ বছর বয়স পেলেন।

১৯৫৪ সালের এপ্রিলে আমি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করি। তিনি আমার আগেই বগুড়ায় বসবাসকারী বিহারী মুহাজির শায়খ আমিনুদ্দীনের দাওয়াতে জামায়াতে শামিল হন। আমার জামায়াতে যোগদানের ব্যাপারেও শায়খ আমিনুদ্দীনের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। 'জীবনে যা দেখলাম' দ্বিতীয় খণ্ডের ৫৪ থেকে ৫৬ পৃষ্ঠায় এর বিবরণ রয়েছে।

আমি যখন গাইবান্ধায় জামায়াতে যোগদান করি, তখন উত্তরবঙ্গে পাঞ্জাবের জনাব আসাদ গিলানী দায়িত্বে ছিলেন। তারই সহ-সংগঠক ছিলেন মাওলানা আবদুর রহমান ফকীর। ১৯৫৪ সালেই নওগাঁয় ফকীর সাহেবের সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়।

আমার শ্বশুর সাহেব নওগাঁ ডিগ্রি কলেজে অধ্যাপনা করতেন। মাওলানা আবদুর রহমান ফকীর ও তাঁর স্ত্রী নওগাঁ বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। উত্তরবঙ্গে তিনিই প্রথম বাংলাভাষী জামায়াতকর্মী। আসাদ গিলানী সাহেব তাঁকে জামায়াতের সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য শিক্ষকতার চাকরি থেকে পদত্যাগ করেন। জামায়াতের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করার প্রয়োজনে বগুড়াকে স্টেশন হিসেবে গ্রহণ করায় তাঁর স্ত্রীকেও চাকরি ছাড়তে হয়।

দুজনে চাকরি করে বেশ সচ্ছল জীবন যাপন করছিলেন। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার ফলে দীনের স্বার্থে দারিদ্র্যকে বরণ করে নিলেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর মধ্যে এতসব গুণের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন যে, তিনি নিজ এলাকায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে যখন সারা দেশে জামায়াতের কোনো প্রার্থী বিজয়ী হতে পারেনি, তখন একমাত্র তিনিই এম.এল.এ নির্বাচিত হন (প্রাদেশিক আইন পরিষদে)। তাঁর এ জনপ্রিয়তা সাময়িক ছিল না; ১৯৮৬ সালেও তিনি জাতীয় সংসদে এমপি নির্বাচিত হন।

রাজশাহী বিভাগে জামায়াতে ইসলামীর অগ্রগতিতে তাঁর বিরাট অবদান রয়েছে। চাকরি থেকে পদত্যাগের পর তিনি ইসলামী আন্দোলনেই জীবন অতিবাহিত করেছেন।

আল্লাহর নিকট আন্তরিক আবেদন জানাই, যেন তিনি তাঁর দীনী খিদমত ও দীনের জন্য কুরবানী কবুল করে তাঁকে মুকাররাব বান্দাহর মর্যাদা দান করেন।

৩৫৩.

৩. ইসলামকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র

শেখ হাসিনা হজ্জ ও ওমরাহ্ করেন বলে পত্র-পত্রিকা ও টেলিভিশন থেকে তা জানা যায়। হজ্জ-ওমরাহ্ করলে তো নামায অবশ্যই পড়তে হয়। তিনি হয়তো পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও পড়েন এবং রোযাও রাখেন।

আমার প্রশ্ন হলো, তিনি নামায-রোযা-হজ্জ করেন কার হুকুমে? নিশ্চয়ই আল্লাহর হুকুম পালনের উদ্দেশ্যেই এসব করেন। এসব হুকুম তিনি কোথায় পেলেন? নিশ্চয়ই তিনি বলবেন যে, কুরআন থেকে পেয়েছেন। এখন আমার প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তাআলা কুরআনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেসব হুকুম করেছেন সেসব মানতে তিনি অস্বীকার করেন কোন যুক্তিতে? তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী বলে দাবি করেন। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে কী? গোটা বিশ্বে এর অর্থ নিম্নরূপ– ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার। যার যে ধর্ম খুশি পালন করুক। ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে আনা চলবে না। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, শাসন পদ্ধতি, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদির সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ অতীত অভিজ্ঞতা ও বর্তমান জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। এসব ব্যাপারের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই।

শেখ হাসিনা যে এ ধর্মনিরপেক্ষ মতাবাদেই বিশ্বাসী তা তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবেই ঘোষণা করেছেন। শেখ মুজিব আমলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ শাসনতন্ত্রে জাতীয় আদর্শ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হলেও ১৯৭৭ সালে গণভোটের মাধ্যমে তা উৎখাত হয়ে যায়।

ধর্মনিরপেক্ষতা সংবিধানবিরোধী, অথচ শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসেই শাসনতন্ত্রবিরোধী এ মতবাদকে জবরদস্তিমূলকভাবে জাতির উপর চাপিয়ে দেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের সরাসরি সাহায্য এবং রাশিয়ার পরোক্ষ সহযোগিতার ফলে শেখ মুজিব হয়তো বাধ্য হয়ে ভারতের চাপে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে এবং রাশিয়ার চাপে সমাজতন্ত্রকে শাসনতন্ত্রে জাতীয় আদর্শ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হন। এদেশের মাটিতে চরম ইসলামবিরোধী এ দুটো মতবাদের কোন শিকড় না থাকায় ১৯৭৭ সালে এ দুটোই শাসনতন্ত্র থেকে উচ্ছেদ হয়ে যায়। শেখ হাসিনার দলের ম্যানিফেস্টোতে এ দুটো মতবাদ না থাকলেও জনগণকে ধোঁকা দিয়ে তিনি ক্ষমতায় এসে ধর্মনিরপেক্ষতা চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চালান।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ চরম কুফরী মতবাদ। ইবলিস আল্লাহর একটি হুকুমকে মানতে অস্বীকার করায় আল্লাহ তাকে কাফের ও অভিশপ্ত ঘোষণা করলেন। আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আল্লাহর অগণিত হুকুমকে মানতে অস্বীকার করার নামান্তর। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যত হুকুম কুরআনের আছে তা সবই মানতে অস্বীকার করা হচ্ছে ঐ মতবাদে। এর চাইতে বড় কুফরী মতবাদ আর কী হতে পারে? শেখ হাসিনা যদি কুরআনে বিশ্বাসী বলে দাবি করেন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল বলে স্বীকার করেন, তাহলে কেমন করে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাস করতে পারেন?

শুধু নামায-রোযা-হজ্জের হুকুম মেনে চলা, আর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নির্দেশনাকে মান্য করতে অস্বীকার করার অধিকার তিনি কোথায় পেলেন? তার তা জানা উচিত যে, আল্লাহর একটি হুকুম মানতে অস্বীকার করাও কুফরী।

তাহলে তার হজ্জ ও ওমরাহ কি রাজনৈতিক অভিনয়?

আল্লাহ পাক কুরআনে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ ও রাসূলের কোন নির্দেশ মানতে অস্বীকার করার কোন অধিকার কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর নেই। হুকুম হিসেবে স্বীকার করে কোন দুর্বলতার কারণে না মানলে কাফের হয় না, ফাসেক হয়। কিন্তু মানতে অস্বীকার করলে অবশ্যই কাফের হয়।

যদি অজ্ঞতার কারণে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে গ্রহণ করে থাকেন তাহলে ঈমানের স্বার্থে তা অবিলম্বে ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু আল্লাহর সকল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক হুকুমকে মানতে অস্বীকার করে শুধু ধর্মীয় কয়েকটি হুকুম পালন করা হলে এ কথা না বলে উপায় নেই যে, তিনি রাজনৈতিক অভিনয় হিসেবেই হজ্জ ও ওমরাহ পালন করেন। ১৯৯৬-এর নির্বাচনের আগে হজ্জ করে তিনি ইহরামের পট্টি মাথায় বেঁধে এবং হাতে তসবীহ নিয়ে বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। গোটা নির্বাচনী অভিযানে তিনি পট্টির প্রদর্শনী করেন। প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণের সময়ও হাতে তসবীহ ও মাথায় পট্টি ছিল।

শেখ হাসিনার এ ভূমিকাকে জনগণ কিভাবে গ্রহণ করবে? যদি আল্লাহর নির্দেশ হিসেবেই তিনি হজ্জ ও ওমরাহ পালন করেন তাহলে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী শাসন করতে অস্বীকার কেন করেন? সূরা মায়েদায় আল্লাহ বলেছেন যে, 'যারা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী শাসন করে না তারা যালেম, ফাসেক ও কাফের।' এ অবস্থায় তার হজ্জ ও ওমরাহ পালনকে রাজনৈতিক অভিনয় বলা ছাড়া উপায় থাকে না।

শেখ হাসিনা মাদরাসা ও আলেমসমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলেন কেন?

শেখ হাসিনা ভালোভাবেই উপলব্ধি করেন যে, মাদরাসায় যারা কুরআন-হাদীস-ফেকাহ থেকে ইসলামের জ্ঞান অর্জন করে, তারা কখনো ধর্মনিরপেক্ষ হতে রাজি হবে না। তাই মাদরাসা পাস ছাত্রদেরকে সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা হবার সুযোগ দেওয়া হয় না। তাদেরকে প্রতিযোগতামূলক পরীক্ষার সুযোগও দেওয়া হচ্ছে না। তাদের উচ্চ ডিগ্রিকে বিএ ও এমএ ডিগ্রির সমমর্যাদা দেওয়া হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় সকল বিষয়ে তাদেরকে ডিগ্রি নিতে দেয় না। কারণ মাদরাসায় পড়া ছাত্ররা যদি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হয় এবং সামরিক ও বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী হয় তাহলে তারা কোনদিন ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ গ্রহণ করবে না।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মতে, মাদরাসা শিক্ষা তাদের তথাকথিত আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। সাধারণ শিক্ষা তো ইংরেজ আমল থেকেই ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে চলে এসেছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ ও ইসলামী ইতিহাস বিভাগকে শেখ হাসিনার শাসনামলে অনেক সংকুচিত করা হয়েছে। নানা অজুহাত সৃষ্টি করে অনেক মাদরাসার অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মাদরাসার অঙ্গনে কখনো সন্ত্রাস ছিল না। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে যে মারামারি লেগেই থাকে মাদরাসায় এর কোন অস্তিত্বই নেই। বোমার সামান্য চর্চাও কোন মাদরাসায় হয়েছে বলে প্রমাণ নেই। অথচ বিভিন্ন স্থানে বোমা বিস্ফোরণ ও বোমা পুঁতে রাখার ঘটনাকে অজুহাত বানিয়ে মাদরাসায় তালেবান বাহিনী, লাদেন বাহিনী ও হারকাতুল জিহাদ আবিষ্কার করে মাদরাসা ও আলেম সমাজের বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এসবের একমাত্র উদ্দেশ্য ইসলামী শিক্ষা ধ্বংস করা ও জনগণের মধ্যে আলেম সমাজের ভাবমর্যাদা বিনষ্ট করা। অথচ আজ পর্যন্ত কোথাও কোন প্রমাণ বের করতে পারেনি যে, মাদরাসা ও আলেমগণ এসবের সাথে জড়িত।

তথাকথিত মৌলবাদী গালি

জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামী দল যারা আল্লাহর আইন বা ইসলামী খিলাফত কায়েম করে রাসূল (স) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শে বাংলাদেশে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েমের আন্দোলনে সক্রিয়, তাদের সবাইকে প্রতিহত করার হীন উদ্দেশ্যে তাদেরকে মৌলবাদী আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ পরিভাষাটি খ্রিস্টধর্মের সাথে সম্পর্কিত। অথচ এটা একটা গালি হিসেবে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে। ইসলামের স্বার্থে যা কিছুই করা হোক, তাকে সাম্প্রদায়িকতা অভিধায় নিন্দা করা হয়। যারা এ দেশকে বিভক্ত করে হিন্দু রাষ্ট্র কায়েমের হুমকি দেয় এবং মা কালীর দরবারে 'ফতোয়াবাজ'দেরকে বলি দিতে চায়, তারা শেখ হাসিনার প্রশ্রয়ে চরম সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ড চালিয়েছে। অথচ ইসলামী দলগুলোকে ঐসব সাম্প্রদায়িক শক্তির মুখেই সাম্প্রদায়িক গালি শুনতে হয়েছে।

শেখ হাসিনার ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের পথে সবচেয়ে বড় বাধাই হলো ইসলামী আন্দোলন। এ আন্দোলনের কারণেই ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ জনগণের মধ্যে শেকড় গাঁড়তে পারছে না। তাই শেখ হাসিনা তথাকথিত জননিরাপত্তা আইনের যাঁতাকলে ইসলামী আন্দোলনকে পিষে মারার চেষ্টা করেছেন।

ফতোয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ

ইসলামে ফতোয়ার মর্যাদা, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তথা ইসলাম সম্পর্কে মূর্খ এক বিচারপতি ফতোয়ার একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুয়োমটো মামলা দায়ের করে চরম ইসলামবিরোধী রায় দিয়ে শেখ হাসিনার মন জয় করে ফেললেন। এর পুরস্কারস্বরূপ ঐ বিচারককে সিনিয়র যোগ্যতর বিচারপতিকে ডিঙিয়ে সুপ্রিম কোর্টে প্রমোশন দিয়ে শেখ হাসিনা সর্বোচ্চ আদালতে এবং আইনজীবীদের মধ্যে বিরাট বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করলেন। ঐ বিচারপতির ইসলামবিরোধী রায়ের প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র আলেম সমাজ চরমভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ইসলামের জন্য জান কুরবান করতে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ফলে জনগণের নিকট শেখ হাসিনা ইসলামের দুশমন হিসেবেই পরিচিত হলেন। বিচারপতির ঐ রায় অবশ্য বর্তমানে স্থগিত আছে। এখনো বাতিল হয়নি। তাই এ রায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনও বন্ধ হতে পারেনি। শেখ হাসিনা ফতোয়া নিয়ে এভাবে বাড়াবাড়ি করে এ কথাই প্রমাণ করলেন যে, যদি আবার ক্ষমতায় আসতে পারেন তাহলে এ দেশ থেকে ইসলামী আন্দোলনকে উৎখাত করে এখানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদই কায়েম করে ছাড়বেন। যদি কেয়ার-টেকার সরকার আগামী নির্বাচন সন্ত্রাসমুক্ত, অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান করতে পারেন তাহলে ইসলামে বিশ্বাসীদের ভোট তিনি পাবেন না। আল্লাহ তাআলা ইসলামের দুশমন থেকে এ দেশকে হেফাজত করুন।

৪. আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ধ্বংস করা

একথা বিশ্বে সর্বজন স্বীকৃত যে, জনগণের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর হেফাযতের উদ্দেশ্যে আইন-শৃঙ্খলা কঠোরভাবে বহাল রাখাই সরকারের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। যে সরকার এ প্রাথমিক কর্তব্য পালন করে না এমন সরকারের কোন দরকার থাকতে পারে না।

শেখ হাসিনার অন্ধ ভক্তদের কথা আলাদা। তাদের কথা বাদ দিয়ে দেশের কোটি কোটি মানুষ এ কথার প্রত্যক্ষ সাক্ষী যে, দেশে যতটুকু আইন-শৃঙ্খলা কায়েম ছিল তা হাসিনা সরকার সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছেন। সকলেই এর সরাসরি ভুক্তভোগী বলে একথা প্রমাণ করার জন্য দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন নেই। এ কথার প্রমাণ হিসেবে একটি উদাহরণই যথেষ্ট।

কেয়ার-টেকার সরকারপ্রধান শপথ নেবার পরদিন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে রেডিও-টেলিভিশনে যে ভাষণ দিয়েছেন তাতে তিনি দেশে আইন-শৃঙ্খলা পুনর্বহাল করার উপরই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে বিরাট দায়িত্ব তিনি নিলেন তা পালনে সফল হতে হলে আইনশৃঙ্খলা কায়েম করাই সর্বপ্রথম প্রয়োজন। কূটনীতিকবৃন্দ ও দাতা দেশসমূহ আইন-শৃঙ্খলা বহাল করার ব্যাপারে আগ থেকেই তাগিদ দিচ্ছেন। ১৫ জুলাই (২০০১) সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহণের মুহূর্ত পর্যন্ত শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এর ২৪ ঘন্টা পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান হিসেবে প্রধান উপদেষ্টাকে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তার প্রথম ভাষণেই আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে এত গুরুত্বের সাথে বক্তব্য রাখতে হলো কেন? তাকে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে এত পেরেশান হতে হলো কেন? শেখ হাসিনার সফল গণতান্ত্রিক সরকারের সুশাসনের কোন স্বীকৃতি কেউ দিচ্ছে না কেন? প্রধান নির্বাচন কমিশনার অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসীদের পাকড়াও করার জন্য মাসখানেক আগে পুলিশ ও প্রশাসন কর্মকর্তাদের নিকট দাবি জানালে তারা কেয়ার-টেকার সরকার কায়েমের পূর্বে তা সম্ভব নয় বলে কেন মন্তব্য করলেন? কেয়ার-টেকার সরকারপ্রধান শপথ নেবার পরই সাংবাদিকদের প্রশ্নের জওয়াবে বললেন, 'আইন-শৃঙ্খলা বহাল করার উপরই আমি সর্বপ্রথম গুরুত্ব দেব।

শেখ হাসিনা সবসময় দাবি করে এসেছেন যে, তিনি সন্ত্রাস দমন করে আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি সাধন করেছেন। তিনি এবং তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সকল বোমাবাজি, হত্যা ও সন্ত্রাসের জন্য চারদলীয় জোটকে দায়ী করে প্রতিটি সন্ত্রাসী ঘটনা থেকে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের হীন উদ্দেশ্যে বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদেরকে আসামি করে মামলা দিয়ে হয়রানি করেছেন। সকল মহলের অবিরাম দাবি সত্ত্বেও এতগুলো নৃশংস বোমা বিস্ফোরণের কোনটিরই বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হলো না কেন? সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতা হত্যার একটি ঘটনারও তদন্ত করে অপরাধীদেরকে শনাক্ত করতে সক্ষম হলেন না কেন?

দেশের সবাই জানে যে, যাদেরকে মৌলবাদী বলে গালি দেওয়া হয় তারা বোমাবাজি দূরের কথা, রাজনৈতিক সংঘাতের ধারে-কাছেও যান না। অথচ সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটার সাথে সাথে শেখ হাসিনা ও তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মৌলবাদীদেরকে দায়ী ঘোষণা করেন। নিরপরাধ লোকদেরকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের বর্বর প্রচেষ্টা চলে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীকে শেখ হাসিনা সন্ত্রাস দমনের জন্য ব্যবহার না করে তার সন্ত্রাসী গডফাদারদের নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য করেছেন। হাজারী, তাহের ও শামীম মার্কা যোগ্য গডফাদার যোগাড় করতে পারলে সব জেলা শহরেই ডিসি ও এসপিদেরকে

ফেনী, লক্ষ্মীপুর ও নারায়ণগঞ্জের মতোই ব্যবহার করার ব্যবস্থা তিনি করতেন। শেখ হাসিনা এ জাতীয় গডফাদারদের প্রকাশ্য পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, তাদের পিঠ চাপড়িয়ে জনসভায় বাহবা দিয়েছেন এবং তাদের মতো যোগ্য লেফটেন্যান্ট পেয়ে গর্ববোধ করেছেন।

তার কুশাসনের শেষ ক'মাসে তিনি তার সন্ত্রাসী বাহিনীকে বৈধ অস্ত্রেও সুসজ্জিত করার ব্যবস্থা করেছেন। ছাত্র ও যুবকদেরকে লাইসেন্স দিয়ে অস্ত্রধারণ করার মত জঘন্য ব্যবস্থা কি আইন-শৃঙ্খলা ধ্বংসের নীলনকশা নয়? শেখ হাসিনা কেয়ার-টেকার সরকারের জন্য অত্যন্ত কঠিন পরিবেশ রেখে গেলেন। মনে হয়, তার ধারণা ছিল যে, পুলিশ ও প্রশাসনকে তিনি ব্যালট ডাকাতির উদ্দেশ্যে যেভাবে বিন্যস্ত করেছেন, কেয়ার-টেকার সরকার সে ছক মোতাবেকই কাজ করতে বাধ্য। এ ধারণা করার কারণেই নির্বাচনে তিনি ও তার বশংবদ মন্ত্রীরা এত জোর দিয়ে দাবি করেছেন যে, নির্বাচনে তারা অবশ্যই বিজয়ী হবেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান দীর্ঘকাল বিচারপতি ছিলেন। প্রধান বিচারপতির দায়িত্বও পালন করেছেন। দেশের সংবিধান তার উপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছে তা যথাযথভাবে পালন করার উপরই যে জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তা উপলব্ধি করা তার জন্য খুবই স্বাভাবিক।

তার এ মহান দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগকে তার মতো করে সাজানো অপরিহার্য। শেখ হাসিনা তার কুমতলবে সচিবের পদে যাকে যেখানে বসিয়ে গেছেন তাদেরকে বদলি করার সাথে সাথে তিনি যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তা থেকেই তার মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি দাবি করেছেন যে, নির্বাচিত সরকার হিসেবে তিনি যা করেছেন এর উপর হাত দেবার কোন অধিকার কেয়ার-টেকার সরকারের নেই। এমনকি সচিবদেরকে বদলি করাকেও তিনি বেসামরিক অভ্যুত্থান বলতে পারলেন।

সারাদেশের পরিস্থিতি কী বলে? কেয়ার-টেকার সরকার প্রধানের ১৫ জুলাই সন্ধ্যায় শপথগ্রহণের একঘণ্টার মধ্যে ১৩ জন সচিবকে বদলি করা, এর ১৪ ঘণ্টা পরই ১০ জন নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ উপদেষ্টা নিয়োগের ব্যবস্থা করা, এর মাত্র নয় ঘণ্টা পর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে চমৎকার ভাষণদান এবং উপদেষ্টাদের শপথের পরপর প্রথম বৈঠকেই কতক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে হাসিনার মন্ত্রিসভায় গৃহীত শেষ তিন মাসের সিদ্ধান্তসমূহ স্থগিত করাও একটি। এ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আওয়ামী মহল ছাড়া সকলকেই আশ্বস্ত করেছে। জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। আইন-শৃঙ্খলার উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়েছে। ৫ বছর আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে থাকার শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে মুক্তি

পেয়ে উল্লসিত হয়ে গ্রামেগঞ্জে পর্যন্ত জনগণ নাজাতের উৎসব পালন করেছে। সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো জাতির গর্দানে চেপে বসা অপশক্তির অপসারণে গোটা পরিবেশে পরিবর্তনের সুবাতাস বইতে শুরু করেছে। দেশবাসী বিটিভির সংবাদ কয়েক বছর পর ১৫ জুলাই থেকে দেখার যোগ্য মনে করেছে।

শেখ হাসিনা নির্বাচিত সরকার ও কেয়ার-টেকার সরকারের মর্যাদা ও ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্যের যে বাহানা তালাশ করছেন তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। নির্বাচিত সরকারের মতোই কেয়ার-টেকার সরকারও সাংবিধানিক মর্যাদার অধিকারী। এ সরকারের উপর মাত্র ৮৮ দিনের মধ্যে (দু'দিন হাসিনা অন্যায়ভাবে নষ্ট করেছেন) অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সংবিধান যে পবিত্র দায়িত্ব অর্পণ করেছে তা যথাযথরূপে পালনের জন্য সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণের বৈধ অধিকার এর আছে। যদি এ সরকারের কোন সিদ্ধান্ত সংবিধানবিরোধী হয় তা হলে উচ্চ আদালতে অভিযোগ করার অধিকারও হাসিনার আছে এবং পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের তা বাতিল করারও ক্ষমতা থাকবে।

শেখ হাসিনা হুমকি দিয়েছেন যে, তার মর্জির খেলাফ কেয়ার-টেকার সরকার কিছু করলে তিনি মেনে নেবেন না। তিনি বর্তমানে যে অবস্থানে আছেন সেখান থেকে হুমকি দেওয়া যে হাস্যকর সে কথা উপলব্ধি করার যোগ্যতাও তিনি হারিয়েছেন। তার এ দাম্ভিকতা প্রদর্শন কৌতুকের বিষয় হয়েই থাকবে।

এক দীনী ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হারালাম

মুফাস্সিরে কুরআন, জনপ্রিয় ওয়ায়েয, লালবাগ শাহী মসজিদের খতিব মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম ২০০৭ সালের ১৯ নভেম্বর হাসপাতালে ৭৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তিনি চমৎকার সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। অসুস্থ হওয়ার মাত্র তিন দিনের মধ্যেই তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

'জীবনে যা দেখলাম'-এর বিভিন্ন পর্যায়ে আত্মীয়-স্বজনের ইন্তিকাল সম্পর্কে যেমন লিখেছি, যে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে তাদের ইন্তিকালেও তেমনি লিখেছি। মাওলানা আমিনুল ইসলামের ইন্তিকালের কিছু দিন পরই দৈনিক সংগ্রামে আমার এ লেখা মুলতবি হয়ে যায়। ফলে তাঁর সম্পর্কে যথাসময়ে লেখা সম্ভব হয়নি। অবশ্য ২১ নভেম্বর সংখ্যায় দৈনিক সংগ্রামে তাঁর সম্পর্কে আমার বিবৃতি প্রকাশিত হয়।

১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি আমি যখন জামায়াতে ইসলামী পূর্ব-পাকিস্তানের সেক্রেটারি, তখন মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম নেযামে ইসলাম পার্টির ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি। ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ও যুক্ত নির্বাচনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে আমরা একসাথে সংগ্রাম করি। এভাবে আমাদের মধ্যে আন্তরিক বন্ধুত্ব জন্মে।

১৯৫৮-৬২ সালে যখন জেনারেল আইয়ূব খানের সামরিক শাসন চলে, তখন রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ ছিল। ঐ সময় মাওলানা আমিনুল ইসলাম বেশ কয়টি ইসলামী পুস্তক রচনা করেন। তিনি পাণ্ডুলিপি নিয়ে মগবাজার এসে আমাকে পড়ে শোনাতেন। তিনি উন্নতমানের বাংলাভাষায় লিখতে সক্ষম ছিলেন। তখন তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর সাথে ফোনে আমার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। তাই তাঁর ইন্তিকালে আমি এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হারানোর তীব্র বেদনাবোধ করেছি।

২০০৭ সালের মে মাসে তাঁর মুহাম্মদপুরস্থ বাসভবনে তাঁর লেখা তাফসীর 'নূরুল কুরআন' সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলাম। জানতে চাইলাম, বহু তাফসীরের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও আপনি তাফসীর রচনার প্রয়োজনীয়তা কেন বোধ করলেন। বললেন, বাংলায় কেউ পূর্ণাঙ্গ তাফসীর রচনা করেনি। আমার প্রিয় মাতৃভাষায় কুরআনের বিস্তারিত তাফসীর লেখা আমি এক পবিত্র দায়িত্ব মনে করেছি।

তাঁর ছেলেদের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যে ও সমবেদনা জানানোর জন্য তাঁর মুহাম্মদপুরস্থ বাড়িতে গিয়েছিলাম। মাইকের ব্যবস্থা থাকায় তাঁর পুত্র, কন্যা, জামাতাসহ পরিবারের সকলের নিকটই বক্তব্য রাখার পর সবাইকে নিয়ে তাঁর জন্য দু'আ করেছি।

সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য ইতঃপূর্বে কয়েকবার ঐ বাড়িতে যাওয়ায় তাঁর কোনো কোনো ছেলের সাথে পরিচয় ছিল। উপরিউক্ত দিন আমাকে তাঁরা পিতার বন্ধুর মর্যাদা দিয়েই সাদরে গ্রহণ করেছে।

তাঁর সম্পর্কে আলাদা করে কিছু না লিখে সংগ্রামে প্রকাশিত আমার বিবৃতিটিই এখানে উদ্ধৃত করছি :

'প্রখ্যাত আলেম, জনপ্রিয় খতীব ও বিশিষ্ট মুফাসসিরে কুরআন মাওলানা আমিনুল ইসলাম-এর ইন্তিকালে বাংলাদেশ দীনের একজন মহান খাদেমের খিদমত থেকে বঞ্চিত হলো। আমি একজন দীনী ভাই ও দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হারালাম। দেশবাসী একজন জনপ্রিয় ওয়ায়েয থেকে বঞ্চিত হলো এবং মুসল্লিগণ তার আকর্ষণীয় খুতবা থেকে মাহরূম হলো। তাঁর আকস্মিক ইন্তিকালে আমি মর্মাহত। কয়দিন আগেও তাকে টিভিতে কুরআনের তাফসীর পেশ করতে দেখলাম। হঠাৎ করে তাঁর চলে যাওয়ায় সত্যিই গভীর বেদনাবোধ করছি।

বাংলা ভাষায় অনেক তাফসীরের অনুবাদ হয়েছে। একমাত্র তিনিই পূর্ণাঙ্গ তাফসীর রচনা করেছেন। তিনি ইসলাম ও কুরআন সম্পর্কে অনেক মূল্যবান পুস্তক জাতিকে উপহার দিয়েছেন। তিনি উন্নত সাহিত্যিক মানের ভাষায় লিখেছেন এবং তাঁর লেখা তেমনি সুখপাঠ্য, যেমন তাঁর ভাষণ সুমধুর, তাঁর সুমধুর তিলাওয়াত উপভোগ্য।

বিগত পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি যখন তিনি নেযামে ইসলাম পার্টির যুবক নেতা ছিলেন, তখন থেকে তার সাথে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠে। ঐ দশকের শেষ দিকে তিনি মাঝে মাঝে মগবাজার রমনা থানা মসজিদে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর রচিত বইয়ের খসড়া শোনাতেন এবং আমার সাথে মতবিনিময় করতেন।

যাদের সাথে আমি নিয়মিত যোগাযোগ রাখতাম তিনি তাদেরই একজন। রমাদান মুবারক ও ঈদ মুবারক ছাড়াও বিদেশে যাওয়ার আগে ও দেশে ফিরে এসে তাদের সাথে যোগাযোগ করতাম।

আন্তরিকভাবে আল্লাহ্ তাআলার নিকট আবেদন জানাই, তিনি যেন তাঁর সকল দীনী খিদমত কবুল করে তাঁকে জান্নাতে উচ্চমর্যাদা দান করেন। দু'আ করি তার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে যেন আল্লাহ্ তাআলা সান্ত্বনা দান করেন। বিশেষ করে হঠাৎ মৃত্যুতে পরিবার যে গভীর বেদনাবোধ করে তাতে সবর করা অত্যন্ত কঠিন। আল্লাহ ছাড়া এ বেদনা লাঘব করার ক্ষমতা কারো নেই।'

৩৫৪.

শেখ হাসিনার শাসনামলে রাজনৈতিক বড় ঘটনা

১৯৯৬-এর জুন থেকে ২০০১ সালের জুন পর্যন্ত পাঁচ বছর শেখ হাসিনার শাসনামল। ঐ সময়কার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা হলো বিএনপি-জামায়াত-ইসলামী ঐক্যজোট ও জাতীয় পার্টির সমন্বয়ে চার দলীয় জোট গঠন।

শেখ হাসিনার দুঃশাসনের দাপটে জনগণ যখন অস্থির, সরকারের চরম অগণতান্ত্রিক আচরণে রাজনৈতিক দলগুলো যখন বিক্ষুব্ধ, আলেম সমাজ ও মাদরাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে সরকারি কার্যক্রম যখন তুঙ্গে তখন জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তি অতিষ্ঠ হয়ে এসবের প্রতিরোধের তীব্র প্রয়োজনবোধ করে।

ঐক্যপ্রচেষ্টার সূচনা

১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে বিএনপি নেতা জনাব এম মোরশেদ খান (জোট সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী)-এর সাথে বিমানে পাশাপাশি বসায় অনেক আলাপ হলো। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আগামী নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার কি কোনো পরিকল্পনা আপনাদের আছে, নাকি এখনকার মতো বিরোধী দলে থেকেই সন্তুষ্ট থাকবেন? তিনি বললেন, বলেন কি? জিততে না পারলে দলকে টিকিয়ে রাখাই কঠিন হবে। বললাম, গত নির্বাচনের মতো একলাই নির্বাচন করবেন, না জোট বাঁধার চিন্তা আছে? তিনি বললেন, ঢাকা ফিরে গিয়ে আপনার সাথে দেখা করব।

বললাম, আপনি সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সাথে যোগাযোগ করুন। তিনি বললেন, আরে! তিনি তো আমার বন্ধু মানুষ। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একসময়েরই ছাত্র ছিলাম। তিনি কয়েক দিন পরই মাওলানা নিজামীর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। এভাবেই বিএনপির সাথে যোগাযোগের সূচনা হয়ে গেল।

ইসলামী ঐক্যজোটের সাথে যোগাযোগ-প্রচেষ্টা

শেখ হাসিনার দুঃশাসনে দেশের সকল মহল বিশেষ করে ইসলামী মহলে চরম অস্থিরতা দেখা দেয়। ফলে হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগবিরোধী সকল শক্তির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তীব্র প্রয়োজন অনুভূত হয়। জামায়াত সিদ্ধান্ত নিল যে, ইসলামী ঐক্যজোটের সাথে এ ব্যাপারে প্রথম যোগাযোগ করা দরকার। আর এ জন্য জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোটকে প্রথমে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একসাথে বিএনপির সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

জামায়াত ১৯৯৭ সালের শুরুতেই চিন্তা করল যে, ইসলামী কল্যাণরাষ্ট্র কায়েমের উদ্দেশ্যে ইসলামী ইস্যুগুলোর তালিকা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। ইসলামী ঐক্যজোটকেও এই তালিকা রচনার পরামর্শ দিতে হবে। এরপর উভয় তালিকা সামনে রেখে জামায়াত ও ইসলামী ঐক্যজোট একটা সমন্বিত তালিকা তৈরি করবে। একমঞ্চ থেকে সমন্বিত তালিকা প্রচার করা সম্ভব না হলে যুগপৎ পদ্ধতিতে প্রচার করা হলেও ইসলামী ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। সাথে সাথে জনগণের মধ্যেও উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হবে।

আমি তীব্রভাবে অনুভব করলাম যে, বিএনপির সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধির পূর্বে ইসলামী ঐক্যজোটের সাথে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। কর্মপরিষদে এ বিষয়ে পরামর্শ চাইলাম। কেমন করে এ সুযোগ করা যায়, সে ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে কর্মপরিষদ সদস্য জনাব মীর কাসেম আলী দায়িত্ব নিয়ে বললেন যে, ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হকের সাথে তাঁর পরিবারের ঘনিষ্ঠতা আছে; পারিবারিক পর্যায়ে আসা-যাওয়াও আছে। এ কথা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। অবিলম্বে আমার সাথে তাঁর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার জন্য মীর সাহেবকে আমি বারবার তাকিদ দিতে থাকলাম।

শায়খুল হাদীসের সাথে প্রতীক্ষিত সাক্ষাৎ

১৯৯৮ সালের মে মাসের কোনো এক দিন জনাব মীর কাসেম আলীর মীরপুরস্থ বাড়িতে গেলাম। এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলামও সেখানে হাজির ছিলেন। জানতে পারলাম, তিনি অতি গোপনে ও সতর্কতার সাথে এসেছেন। নিজের গাড়িতে আসেননি, যাতে তাঁর ড্রাইভার ওখানে আসার খবর জানতে না পারে। বাড়িতেও কাউকে জানাননি যে তিনি ওখানে আসবেন। মীর কাসেমের ছেলে সালমান গাড়ি চালিয়ে তাঁকে নিয়ে এসেছে।

যাহোক, ওখানে শায়খুল হাদীসের সাথে আমার একান্তে আলাপ শুরু হলো। ঐ পক্ষে তিনি একা, আর এ পক্ষে আমরা দু'জন। কথা শুরু করে আমি বললাম, 'শেখ হাসিনার শাসনামলে যাকিছু হচ্ছে তাতে আওয়ামী লীগবিরোধী সকল রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে আমরা যোগাযোগও শুরু করেছি। আমরা মনে করি, ইসলামী ঐক্যজোট ও জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে প্রথম ঐক্য হওয়া প্রয়োজন, যাতে আমরা একসাথে একসুরে বিএনপির সাথে দর কষাকষি করতে পারি। রাজনৈতিক ঐক্যের স্বার্থে এবং আন্দোলনের প্রয়োজনেই দাবি-দাওয়ার দফাওয়ারি তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। সে তালিকায় ইসলামী ইস্যুগুলো আমরা একসাথে পেশ করলে দাবির তালিকায় তা অন্তর্ভুক্ত করা সহজ হবে। তাই আমাদের মধ্যে প্রথমে ঐক্য হওয়া প্রয়োজন।'

তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে পরে বললেন, বিষয়টা অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ। আমরা কয়েক দল মিলে ঐক্যজোট করেছি। এ ব্যাপারে জোটের শরীক দলের মতামত জোগাড় করার আগে আমি কোনো মতামত দিতে পারছি না।

তাঁর এ বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত বলে স্বীকার করে বললাম, 'আমাদের মধ্যে ঐক্য অবশ্যই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার; কিন্তু আমরা কি এমন একটা কাজ করতে পারি না, যা ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্টি করবে এবং জনগণও তাতে উৎসাহবোধ করবে?'

যুগপৎ আন্দোলনের প্রস্তাব

আমি বললাম, রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজনে একমঞ্চে না গিয়েও একই কর্মসূচির ভিত্তিতে যুগপৎ আন্দোলন করা যেতে পারে। আমরা কেয়ারকেটার সরকারের দাবিতে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির সাথে বিগত সরকারের আমলে যুগপৎ আন্দোলন করেছি। ইসলামবিরোধী দলের সাথেও যদি কোনো রাজনৈতিক ইস্যুতে যুগপৎ আন্দোলন করা যায়, তাহলে আমরা ইসলামী দলগুলো ইসলামী ইস্যুতে কি যুগপৎ আন্দোলন করতে পারি না? ইসলামী ঐক্যজোট ও জামায়াতে ইসলামী যদি কতক ইসলামী ইস্যু নিয়ে যুগপৎ আন্দোলন করে তাহলে কেমন হয়?

তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সাথে বললেন, এটা তো করা-ই যায়। তাঁর সম্মতি জেনে আমিও উৎসাহবোধ করে বললাম, তাহলে আপনার পক্ষ থেকে তিন জনের নাম ঠিক করেন, জামায়াতের পক্ষ থেকেও তিন জন লোক ঠিক করা হবে। এ ছয়জন একত্রে বসে ইসলামী ইস্যুগুলোর তালিকা তৈরি করবেন। তাঁরা যুগপৎ আন্দোলনের দাবিনামা হিসেবে একটা প্রস্তাব প্রণয়ন করবেন। এ প্রস্তাব ইসলামী ঐক্যজোট ও জামায়াত নিজ নিজ ফোরামে অনুমোদন করলে অথবা সংশোধন করে অনুমোদন দিলে যুগপৎ আন্দোলনের কর্মসূচি শুরু হতে পারে।

আমার প্রস্তাবিত এ পদ্ধতির সাথে একমত হয়ে তিনি তাঁর জোটের পক্ষ থেকে তিন জনের নামও জানিয়ে দিলেন। আমি বললাম, জামায়াতের পক্ষ থেকে তিন জনের নাম আমি ফোরামে পরামর্শ করে পরে জানাব।

এরপর তিনি প্রস্তাব দিলেন, আপনি এটা কারো কাছে প্রকাশ করবেন না। যুগপৎ আন্দোলনের লক্ষ্যে ইসলামী ইস্যুর তালিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ইসলামী ঐক্যজোটের পক্ষ থেকে আপনার নিকট একটা লিখিত প্রস্তাব পাঠানো হবে, যাতে ইসলামী ঐক্যজোটের পক্ষ থেকেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে বোঝা যায়। আমি বিনা দ্বিধায় তাঁর এ কথা মেনে নিলাম। আমি চাই যে, কাজটা হোক। জামায়াতের কৃতিত্বের প্রয়োজন নেই। অন্য কেউ কৃতিত্ব দাবি করলেও আপত্তি নেই।

আমি জানতে চাইলাম, আপনাদের পক্ষ থেকে কতদিন পর লিখিত প্রস্তাব আশা করতে পারি? তিনি বললেন, এক সপ্তাহের মধ্যেই পাবেন। সপ্তাহ পার হয়ে ১৫ দিন চলে গেল। মীর কাসেম সাহেবকে জানালাম, কোনো সাড়া পাওয়া গেল না; আর কত অপেক্ষা করা যায়?

শায়খুল হাদীস সাহেব চেয়েছিলেন, আমি যেন আমাদের দু'জনের আলোচনার বিষয় কারো কাছে প্রকাশ না করি। যাতে এ কথা প্রমাণ হয় যে, তাঁরই উদ্যোগে যুগপৎ আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে। তাঁর এ দাবি মেনে নিয়ে আমি সত্যিই কারো কাছে পূর্বেকার ঐ সাক্ষাতের খবর প্রকাশ করিনি। এমনকি আমার নিকটতম সাথী জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল নিজামী সাহেবকেও জানাইনি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত জানাতে হলো।

শায়খুল হাদীসের সাথে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ

১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিএনপির সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ার পর আবার শেষ চেষ্টা হিসেবে পুনরায় জনাব মীর কাসেমকে তাঁর বাড়িতে শায়খুল হাদীস সাহেবের সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার জন্য বললাম। শেষ পর্যন্ত সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ হয়। এ সাক্ষাতের সময় জামায়াতের নায়েবে আমীর মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথমেই আমি চার মাস আগে ঐ বাড়িতে আমাদের যে বৈঠক হয়েছে, সে কথা উল্লেখ করি। কিন্তু যখন তাঁর পক্ষ থেকে আমার কাছে চিঠি পাঠানোর কথা মনে করিয়ে দিলাম তখন তিনি কিছুতেই তা স্মরণ করতে পারলেন না। আমি বিস্মিত ও হতভম্ব হয়ে গেলাম। তিনিই দাবি করেছিলেন যে, উদ্যোগী ভূমিকা তাঁর হবে এবং অনুরোধ করেছিলেন, আমি যে উদ্যোগ নিয়েছি সে কথা যাতে কাউকে না বলি। অথচ তিনিই বিষয়টি ভুলে গেলেন। তিনি সে কথা মনে করতেই পারলেন না– এটা বিশ্বাস করা অস্বাভাবিক হলেও বিশ্বাস না করে উপায় কী? তাই নতুন করে ঐ পুরাতন কথাই তাঁকে আবার বললাম।

মাওলানা ইউসুফ সাহেব ১৯৫১ সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় ৩১ জন আলেমের ঐতিহাসিক ২২ দফার কথা উল্লেখ করে ঐক্যের গুরুত্ব তুলে ধরলেন। শায়খুল হাদীস সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ ২২ দফার কপি আছে কি না? মাওলানা জবাবে বললেন, মূল উর্দু কপি এবং এর বাংলা অনুবাদ আমরা প্রচার করি।

আমার আগের কথার জের ধরে বললাম, এবার বলুন আপনার পক্ষ থেকে যুগপৎ আন্দোলনের প্রস্তাব দিয়ে কবে চিঠি পাঠাবেন? তিনি বললেন, পাঠাতে দেরি হবে না; তবে চিঠির ড্রাফট তৈরি করে দিলে ভালো হয়। বিস্ময়ের কথা, তিনি চিঠি দেওয়ার ড্রাফটাও করতে অক্ষম; তবু রাজি হলাম। তিনি বললেন, ঐ ২২ দফার কপিও সাথে পাঠাবেন। বললাম, আমরা ইসলামী ও জাতীয় ইস্যু নিয়ে ১৭ দফা প্রণয়ন করেছি। বললেন, এর কপিও পাঠাবেন। বললাম, চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই এসব মীর কাসেম সাহেবের হাতে পৌঁছে যাবে। তিনি আপনাকে পৌঁছাবেন।

যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র মীর কাসেম সাহেবের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে ফোনে খবর নিলাম, তা যথাস্থানে পৌঁছানো হলো কি না। তিনি জানালেন, শায়খুল হাদীস সাহেব সফরে থাকায় তা কিছুটা বিলম্বে পৌঁছেছে।

দুই সপ্তাহ পরও আমার কাছে চিঠি না আসায় মীর কাসেম সাহেবকে খবর নিতে বললাম। তিনি আমাকে জানালেন, শায়খুল হাদীস সাহেব আপনাকে ফোন করবেন। দুই দিন পর ফোন এল। যিনি ফোন ধরলেন তিনি আমাকে জানালেন, মীর কাসেম সাহেব ফোন করেছেন। আমি ফোন ধরে আওয়াজ থেকে বুঝলাম, শায়খুল হাদীস সাহেব কথা বলছেন। বোঝা গেল, আমার বাড়িতে যিনি ফোন ধরলেন তিনিও যাতে জানতে না পারেন যে শাইখুল হাদীস সাহেব তিনি আমাকে ফোন করেছেন। তিনি জানালেন যে, তাঁর আরো সময় প্রয়োজন। আমি আর চাপাচাপি করা সমীচীন মনে করলাম না। কত সময় প্রয়োজন– জিজ্ঞাসা করাও ঠিক মনে করিনি। বুঝতে পারলাম যে, তিনি আর এগুবেন না। এরপর আর তাঁকে বিরক্ত করিনি।

পরিকল্পনা সফল হলো না

বিএনপির সাথে রাজনৈতিক ঐক্যের পূর্বে ইসলামী ঐক্যজোটের সাথে ঐক্যের প্রচেষ্টা সফল হলো না। জামায়াতের পরিকল্পনা ছিল যে, ইসলামী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী শক্তির প্রতিনিধি হিসেবে বিএনপির সাথে ঐক্যের আলোচনা করতে পারলে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ইসলাম সমান মর্যাদা পেত। তাহলে আন্দোলনের ইস্যু হিসেবে কতক ইসলামী ইস্যুকে শামিল করা সহজ হতো। আফসোসের বিষয় যে, ঐ পরিকল্পনা সফল হলো না।

জানা গেল যে, আমাদের আগেই মুফতী ফযলুল হক আমিনীর নেতৃত্বে ইসলামী ঐক্যজোট বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। ফলে

বিএনপিকে প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে গণ্য করা হলো এবং ইসলামী শক্তি সমান মর্যাদা পেল না। বিএনপির নেতৃত্ব মেনেই রাজনৈতিক জোটে শামিল হতে হলো।

মজলিসে শূরার জরুরি অধিবেশন

১৯৯৭ সালের ৯ থেকে ১১ এপ্রিল কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার জরুরি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী ভাষণে আমীরে জামায়াত হিসেবে আমি শূরার সদস্যগণের নিকট এ অধিবেশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বললাম, 'আওয়ামী লীগ সরকারের অপকর্মের বিরুদ্ধে অতিষ্ঠ হয়ে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি ইতোমধ্যে ময়দানে নেমে গেছে। এ অবস্থায় জামায়াত কী করবে? রাজনৈতিক ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চুপ থাকা যায় না। ইসলামী ও জাতীয় ইস্যুর ভিত্তিতে অন্যান্য ইসলামী দলের সাথে যৌথ আন্দোলনে যাওয়া উচিত কি না? কোনো প্রোগ্রাম নিয়ে আন্দোলনে যাওয়া যায় কি না? প্রোগ্রামই বা কী হওয়া উচিত? ইসলামী দলের সাথে ঐক্য না হলে কী করা যাবে? এসব বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যই এ অধিবেশন ডাকা হয়েছে।'

দীর্ঘ আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত হয় যে–

১. ইসলামী, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুর ভিত্তিতে জামায়াত আন্দোলনে যাবে।
২. আন্দোলনের ১৪ দফা কর্মপরিষদ চূড়ান্ত করবে।
৩. জামায়াত কোনো ঐক্যজোটে যাবে কি না সে বিষয়ে মজলিসে শূরার পরবর্তী অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইসলামী ঐক্যজোটের সাথে যোগাযোগের যে প্রচেষ্টা চলেছে তা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। বিএনপির সাথে যোগাযোগ অব্যাহত থাকে; কিন্তু যুগপৎ আন্দোলনের পরিবেশ তখনো সৃষ্টি হয়নি।

ইতোমধ্যে ইসলামী ইস্যু, দেশের স্বাধীনতা রক্ষা ও অন্যান্য জাতীয় ইস্যু নিয়ে আন্দোলন করার জন্য জামায়াত ১৭ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করে। সংগঠনের মাধ্যমে হ্যান্ডবিল আকারে এ কর্মসূচি সারা দেশে প্রচার করা হয়।

অক্টোবরে আবার মজলিসে শূরার জরুরি অধিবেশন

১৯৯৭ সালের ১ থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত মজলিসে শূরার জরুরি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী বক্তব্যে আমীরে জামায়াতের পক্ষ থেকে দেশের পরিস্থিতির ভয়াবহতার নিম্নরূপ বিবরণ দেওয়া হয় :

'দেশ আজ এক চরম অস্থিরতা তথা বিপর্যয়কর অবস্থায় নিপতিত হয়েছে। তথাকথিত শান্তিচুক্তির নামে পার্বত্য চট্টগ্রামকে সন্ত্রাসীদের হাতে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র, রেডিও-টেলিভিশনে ইসলামবিরোধী প্রচারণা, রাজপথে জনসভা নিষিদ্ধ করে

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ কর্মীদের উপর পুলিশ ও দলীয় সন্ত্রাসীদের লেলিয়ে দিয়ে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতা, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, দেশকে ভারতের বাজার বানানো, ব্যাংকে তারল্য সংকট, বিদেশি বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টিতে ব্যর্থতা, আলেম-ওলামাদের হেয় করার অপচেষ্টা, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের চারপাশে ১৪৪ ধারা জারি করে নামাযীদেরকেও পেটানো, তেলের দাম বৃদ্ধি এবং দেশময় বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে চর দখলের ন্যায় সন্ত্রাসীদের লেলিয়ে দিয়ে সরকার সর্বক্ষেত্রে চরম অশান্ত ও দুর্বিষহ অবস্থা সৃষ্টি করেছে।'

প্রধান আলোচ্য বিষয়

১৯৯৭ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত মজলিসে শূরার জরুরি অধিবেশনে ইসলামী দলগুলোর সাথে যুগপৎ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়; কিন্তু ইসলামী ঐক্যজোটের সাথে সমঝোতা সম্ভব না হওয়ায় এবং ময়দানে বিএনপি সরকারবিরোধী আন্দোলন শুরু করায় জামায়াত কি একাই পৃথকভাবে আন্দোলন করবে, না বিএনপির সাথে যৌথভাবে আন্দোলন করবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যই দ্বিতীয় জরুরি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

মজলিসে শূরার ১০৪ জন সদস্য ঐ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করায় তিন দিন পর্যন্ত বৈঠক চলে। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে একা আন্দোলন করে কোনো সুফল আশা করা যায় না বলে বিএনপির সাথেই যুগপৎ আন্দোলনে যাওয়া প্রয়োজন।

কবে, কিভাবে ও কী শর্তে জামায়াত যুগপৎ আন্দোলনে শরীক হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কর্মপরিষদকে এখতিয়ার দেওয়া হয়।

মজলিসে শূরার বৈঠক চলাকালেই বিএনপি ০৫.১০.'৯৭ তারিখে রাজপথ ও রেলপথ অবরোধের ঘোষণা দেয় এবং জামায়াতকে এ কর্মসূচি সমর্থন করার অনুরোধ জানায়। মজলিসে শূরা বিএনপির সাথে যুগপৎ আন্দোলনে যাওয়ার সূচনা হিসেবে উক্ত অনুরোধে সাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

তথাকথিত পার্বত্য শান্তি চুক্তি

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরে গিয়ে সকল উপজাতিকে বাঙালি হিসেবে পরিচয় দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। উপজাতিরা নিজেদের পৃথক সত্তার ব্যাপারে অত্যন্ত সংবেদনশীল থাকায় এ আহ্বানের তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তারা নতুন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশি নাগরিক হওয়ার বিরোধী ছিল না; কিন্তু তারা নিজেদেরকে বাঙালি

হিসেবে পরিচয় দিতে সম্মত হয়নি। এর প্রতিক্রিয়ায় তারা বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে। শেখ মুজিবের বন্ধুরাষ্ট্র ভারত বিদ্রোহীদেরকে অস্ত্র ও ট্রেনিং দিয়ে সন্ত্রাসী ভূমিকা পালনে অব্যাহতভাবে সাহায্য করতে থাকে।

এ বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে বাংলাদেশ সরকার সেনাবাহিনী নিয়োগ করতে বাধ্য হয়। ২০ বছরে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষার বিশাল অংক তো ব্যয় হয়-ই, কতক অফিসার ও বহু সৈনিক পর্যন্ত বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন; তারা বহু বাঙালিকেও হত্যা করে।

শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হয়ে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর বিদ্রোহীদের সাথে এক অসম চুক্তি করে বিদ্রোহীদের সব দাবি মেনে নেন। ভারতের আস্কারা পেয়ে বিদ্রোহীরা এমন সব দাবি মানতে বাধ্য করে, যা বাংলাদেশের সার্বভৌম মর্যাদার বিরোধী এবং যা অ-উপজাতি বাংলাদেশিদেরকে নিজ দেশে পরবাসী বানিয়ে দেয়। এ চুক্তি অনুযায়ী উপজাতিরাই পার্বত্য চট্টগ্রামের আসল মালিক। তারাই ঐ এলাকা শাসন করবে। সেখানে বসবাসরত অ-উপজাতি বাঙালিরা সেখানে জমির মালিকানাও ভোগ করতে পারবে না।

এ চুক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ঐক্য

যেসব রাজনৈতিক দল ভারত-প্রেমিক নয়, সেসব দল ঐ চুক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করার এক পর্যায়ে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করার সিদ্ধান্ত নেয়। বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর), বিএনপি, জাগপা, ডিএল ও এনপিএ মিলে জোট গঠন করে ১১ নভেম্বর (১৯৯৭) চট্টগ্রাম লালদিঘী ময়দানে বিশাল জনসভায় নেতৃবৃন্দ তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। ২ ডিসেম্বর ঐ চুক্তির প্রতিবাদে সারা দেশে হরতাল পালন করা হয়।

১৯৯৮ সালের ৯ জুন সকল দল মিলে ঢাকা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে লংমার্চ করা হয়। পথে পথে কুমিল্লা, ফেনীসহ বহু জায়গায় জনসমাবেশ লংমার্চকে স্বাগত জানায় এবং অনেক লোক লংমার্চে শরীক হয়। চট্টগ্রাম পৌছতে পৌছতে রাত হয়ে যায়। পরের দিন লংমার্চ পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় পৌছে। বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দকে জেলাগুলোর মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়, যাতে প্রত্যেক জেলায়ই সমাবেশ সফল হয়।

চার দলীয় জোট গঠন

১৯৯৮ সালে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে কখনো একসাথে, আবার কখনো যুগপৎ সরকারবিরোধী আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯৯৯ সালের ৬ জানুয়ারি বেগম খালেদা জিয়া, শাইখুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও অধ্যাপক

গোলাম আযম এক যুক্ত ঘোষণা দিয়ে চার দলীয় জোট গঠন করেন। ঘোষণায় এক মাসের মধ্যে সরকারকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানানো হয়। ১৯৯৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত চার দলীয় নেতৃবৃন্দ সারা দেশে বহু জেলা শহরে সম্মিলিতভাবে বিরাট বিরাট জনসমাবেশে বক্তব্য রাখেন। অত্যন্ত জোরেশোরে সরকারকে পদত্যাগ করতে চাপ দেওয়া হয়।

ট্রানজিট ষড়যন্ত্র

শেখ হাসিনার শাসনামলেই ভারতের ট্রানজিট দাবি পূরণের পাঁয়তারা চলে। বাংলাদেশের তিন পাশে ভারতের যে ৭টি রাজ্য (প্রদেশ) রয়েছে সেখানে বিশেষ করে আসামে দিল্লির শাসন থেকে স্বাধীন হওয়ার আন্দোলন অব্যাহতভাবে এগুচ্ছে। এ বিদ্রোহ দমন করার জন্য ভারত সরকারের সামরিক অভিযান পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের উপর দিয়ে তাদের সড়কপথ প্রয়োজন। কম সময়ে এবং কম খরচে অভিযান পরিচালনা করতে হলে এটাই একমাত্র উপায় মনে করেই ভারত সব সময় এ বিষয়ে প্রতিটি সরকারের উপর চাপ দিয়ে আসছে। কোনো সরকারই এ চাপে নতি স্বীকার না করায় ভারত সরকার রীতিমতো ক্ষুব্ধ। আওয়ামী লীগ সরকার ছাড়া এ দাবি বিবেচনা করার যোগ্য বলে অন্য কোনো সরকারকেই মনে করা হয়নি।

হাসিনা সরকার যাতে ভারতের এ অন্যায় দাবি মেনে নিতে সাহস না পায় সেজন্য এর বিরুদ্ধে প্রবল জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১৯৯৯ সালের ১২ আগস্ট জামায়াতের পক্ষ থেকে একটি হ্যান্ডবিল ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। এর শিরোনাম ছিল 'আধিপত্যবাদী ভারতকে ট্রান্সশিপমেন্টের নামে ট্রানজিট বা করিডোর দেওয়ার ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করুন।

চার পৃষ্ঠাব্যাপী ঐ হ্যান্ড বিলে মারাত্মক কুফল সম্পর্কে জাতিকে সতর্ক করা হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় ৬টি পয়েন্ট বড় অক্ষরে এবং বাকি তিন পৃষ্ঠায় এসবের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। পয়েন্টগুলো হলো –

১. বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জের বাজার পর্যন্ত ভারত দখল করে নেবে।

২. ভারতের এ দেশীয় এজেন্টদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র এলে তারা দেশে গৃহযুদ্ধ বাধাবে।

৩. উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাত রাজ্যের স্বাধীনতাকামীরা ভারতের কনভয়ের উপর বাংলাদেশের রাজপথে হামলা চালাবে।

৪. দিল্লি আর সাত রাজ্যের গেরিলাদের যুদ্ধক্ষেত্র হবে বাংলাদেশ।

৫. ভারতীয় সৈন্যরা নিরাপত্তার অজুহাতে বাংলাদেশে অবস্থান নেবে।

৬. বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।

৩৫৫.

চার দলীয় জোটের ঐতিহাসিক ঘোষণা

চার দলীয় জোট নেতৃবৃন্দের একমঞ্চে পরিবেশিত বক্তব্য আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সারা দেশে যে প্রবল জনমত সৃষ্টি করেছে তার সুফল যাতে পরবর্তী সংসদ নির্বাচনে যথাযথভাবে প্রকাশ পায় সে উদ্দেশ্যে নেতৃবৃন্দ একটি যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে জনগণকে আশ্বস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

অধ্যাপক ডা. বদরুদ্দোজার নেতৃত্বে একটি সাবকমিটি ঘোষণাপত্রের খসড়া রচনা করে চার দলীয় শীর্ষ নেতাদের নিকট পেশ করে। খসড়াটি যথেষ্ট সময় নিয়ে ভালোভাবে বিবেচনা করার পর প্রয়োজনীয় সংশোধনীর পর চূড়ান্ত হয়। ঘোষণাপত্রে ১৯৯৯ সালের ৩০ নভেম্বর সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ২৯ নং মিন্টো রোডস্থিত সরকারি অফিসে ৪ জন শীর্ষ নেতা দস্তখত করেন। বেগম খালেদা জিয়া, হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ, গোলাম আযম ও মাওলানা আজিযুল হক নিজ দলের পক্ষ থেকে স্বাক্ষর দান করেন।

চার দলীয় ঐক্যজোটের ঐতিহাসিক ঘোষণা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে গণতন্ত্রকে সংহত করার জন্য ঐ ঘোষণা যে বিরাট অবদান রেখেছে এর কারণে ঐতিহাসিক ঘোষণা হিসেবে সংরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে এখানে তা উদ্ধৃত করা প্রয়োজনবোধ করছি। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত স্বৈরাচারী সরকারের সকল পরিকল্পনা ব্যর্থ করে নির্বাচনে জনগণকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রায় দেওয়ার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে ঐ ঘোষণারই প্রাপ্য।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমরা বাংলাদেশের চারটি রাজনৈতিক দলপ্রধান, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর গোলাম আযম ও ইসলামী ঐক্য জোটের চেয়ারম্যান আজিজুল হক আমাদের নিজ নিজ দল, জোট ও সমমনা অন্যান্য রাজনৈতিক দল এবং আর্থসামাজিক সংগঠনগুলোর মধ্যে ব্যাপক আলোচনার ভিত্তিতে সম্মিলিতভাবে দেশবাসীর পক্ষে ঘোষণা দিচ্ছি যে, একের পর এক জনস্বার্থ বিরোধী, রাষ্ট্রঘাতী, সংবিধানবিরোধী, জনগণের ধর্মবিশ্বাস বিরোধী, স্বৈরাচারী ও অমানবিক কর্মকাণ্ড এবং সরকার পরিচালনায় ব্যর্থতার দায়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত ক্ষমতাসীন সরকার রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সকল বৈধতা হারিয়েছে।

আমরা সম্মিলিতভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছি,

যেহেতু আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা বিপন্ন এবং

যেহেতু এই সরকার প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতির সুষ্ঠু ও অবাধ পরিবেশ ধ্বংস করে দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও দলীয় অস্ত্রবাজির এক সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, সকল নাগরিকের জীবন, জীবিকা, সম্পদ এবং নারীর সম্ভ্রম বিপন্ন করেছে, এবং

যেহেতু সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আজ চরম হুমকির সম্মুখীন, এবং

যেহেতু আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং রাষ্ট্রক্ষমতার অপব্যবহার, ভয়-ভীতি ও নির্যাতনের মাধ্যমে একদলীয় ফ্যাসিবাদী কায়দায় রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য সরকার রাজপথ দখলের নামে সরাসরি সংঘাতের পথ বেছে নিয়েছে, সমগ্র জাতিকে সরকারের মদদপুষ্ট দলীয় লোকদের দ্বারা সৃষ্ট সন্ত্রাসের কাছে জিম্মি করেছে এবং এই সরকারের অত্যাচার-অনাচার, জেল, যুলুম, নির্যাতন, হয়রানি ও মিথ্যা মামলার কারণে মানবাধিকার লঙ্ঘন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং হাজার হাজার বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের কারাবন্দী করা হয়েছে এবং তিন 'শর ও বেশি রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে এবং

যেহেতু শুধু নিরস্ত্র মিছিলের উপরেই নয়, সম্মানিত সংসদ সদস্যদের উপরও পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে সরকার গণতান্ত্রিক নীতিবোধের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে, এমনকি সম্মানিত সংসদ সদস্যদের উপর গুলি চালিয়ে হত্যার অপচেষ্টা করতেও সরকার দ্বিধা করেন, এবং

যেহেতু এ সরকার তাদের একান্ত বশংবদ প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়ার পবিত্রতা সম্পূর্ণভাবে কলুষিত করেছে, এ সরকারের আমলে জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচনসহ কোনো নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি, ক্ষমতাসীন দল জনগণের ভোটাধিকার ছিনতাই করে নির্বাচনকে কী নিদারুণ প্রহসনে পরিণত করতে পারে লক্ষ্মীপুর, মিরেরসরাই, পাবনা, ফরিদপুর এবং টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচন তার সর্বশেষ জঘন্য উদাহরণ। বিরোধী দলসমূহের ৪-দফা দাবি উপেক্ষা করে একদলীয় একতরফা ভোটবিহীন পৌরসভা নির্বাচন করে জনগণকে ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। ভোটার তালিকা প্রণয়ণ এবং ভোটার পরিচয়পত্র প্রদান হীনতম দলীয়করণের শিকারে পরিণত করেছে; এবং

যেহেতু জাতীয় সংসদকে সম্পূর্ণভাবে অকার্যকর করে দেওয়া হয়েছে এবং আইনের শাসনকে আজ দলীয় শাসনে পরিণত করা হয়েছে, এবং

যেহেতু একটি বিশেষ রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল পররাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি অনুসরণের কারণে আজ আমাদের নিজস্ব জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ার দরুন

অর্থনীতি চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন এবং সরকারের আত্মঘাতী নীতির কারণে দেশে জাতীয় এবং বিদেশি নতুন পুঁজি বিনিয়োগ স্থবির হয়ে গেছে, এবং

যেহেতু ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং

যেহেতু সরকারের প্রভু-তোষণ নীতির ফলে বাংলাদেশ ভারতীয় পণ্যের চোরাবাজারে পরিণত হওয়ায় দেশের অধিকাংশ শিল্পখাতে একের পর এক কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে আর বিপুলসংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারী বেকার হয়েছে, এবং

যেহেতু সরকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে এবং বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনায় চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, এবং

যেহেতু একদিকে সার, বিদ্যুৎ ও কীটনাশক ওষুধসহ সকল কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি এবং অন্যদিক উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত না করার ফলে কৃষক সমাজ এবং কৃষি খাত আজ এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন এবং গ্রামের মানুষ অপুষ্টি, অভাব ও আয়ের অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে দিন যাপন করছে, এবং

যেহেতু আজ তিন কোটি কর্মক্ষম বেকার যুবকের জন্য সরকার কর্মসংস্থানের জন্য কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি, এবং

যেহেতু শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার ও প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করার নানা অপচেষ্টায় সরকারের যোগসাজশ সুস্পষ্ট, এবং মজুরি কমিশনের সুপারিশ প্রনয়ণ ও শ্রমিকদের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের কোনই উদ্যোগ নেই, এবং

যেহেতু সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, তাদের প্রতিনিধিদের ভয়ভীতি প্রদর্শন, চাকুরিচ্যুত ও জেলে পুরে সরকার তাদের ন্যায্য দাবি থেকে বঞ্চিত করছে, এবং তিন বছর ধরে পে-কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে কর্মচারীদের সাথে শঠতা করছে, এবং যেহেতু ক্ষমতায় এসেই এ সরকার শেয়ার মার্কেটে ফটকাবাজারির সুযোগ ও ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ক্ষমতাসীনদের দেশিয় দোসর ও বিদেশি মহাজনরা সাধারণ মধ্যবিত্ত হাজার হাজার পরিবারের আজীবনের সঞ্চয় লুণ্ঠন করে নিয়েছে। পুঁজি বাজারের সংকটে শিল্পোন্নতির সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছে, এবং

যেহেতু এ সরকার রাষ্ট্রঘাতী লক্ষ্যে আমাদের জাতিগঠনমূলক সকল প্রতিষ্ঠান যথা বিচার বিভাগ, প্রশাসন, পুলিশ, প্রতিরক্ষা বাহিনী, শিল্প ও বাণিজ্যিক কাঠামোসমূহকে একে একে পঙ্গু করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে, এবং

যেহেতু সরকার উচ্চ আদালতকে আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করেছে। বিচারকদের জবাবদিহিতার ভুয়া প্রশ্ন তুলে বিচারকগণকে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ও মর্যাদাহীন করতে চাইছে, এবং

যেহেতু সংবাদপত্রকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যে সরকার সংবাদপত্রের জবাবদিহিতার ধুয়া তুলে পর্দার অন্তরালে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের অপচেষ্টা করছে।

সমালোচনাকারী সাংবাদিকদের বেছে বেছে জীবননাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে, তাদের মিথ্যা মামলায় জড়ানো হচ্ছে, আর যেসব সংবাদপত্র সরকারের দুর্নীতির কাহিনী প্রকাশ করছে ও সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরছে তাদের বিজ্ঞাপনের প্রাপ্য কোটা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, এবং

যেহেতু জাতীয় রেডিও এবং টেলিভিশনকে সরকার দলীয় প্রচার, বিরোধীদের চরিত্র হনন ও নির্লজ্জ মিথ্যাচারে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করছে, এবং

যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে সরকার সংবিধান লঙ্ঘন করে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি ও নতুন অশান্তির বীজ বপন করেছে এবং দেশের এক-দশমাংশ ভূখণ্ড রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত করার ষড়যন্ত্রের অংশীদার হয়েছে, এবং

যেহেতু তথাকথিত পানি চুক্তিতে গঙ্গার পানির হিস্যার গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তার কোনো বিধান এবং চুক্তিভঙ্গের বিষয়ে কোনো সালিশের ব্যবস্থা না রেখে সরকার বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং

যেহেতু দলীয়করণ ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান ও পরিবেশ ধ্বংস করা হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, অসহায় মানুষকে জিম্মি এবং ছাত্রীদের সম্ভ্রমহানির হীন ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছে, এবং

যেহেতু সরকার ইসলামী মূল্যবোধ এবং সকল ধর্মবিশ্বাস, আচার-আচরণ ও আলেম সমাজের উপর ক্রমাগত আঘাত হেনে চলেছে এবং দেশের ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দেওয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে, এবং

যেহেতু সরকারের মন্ত্রী, এমপি, উপদেষ্টা, দলীয় মদদপুষ্ট দালাল এবং অসৎ ব্যক্তিদের সীমাহীন দুর্নীতি ও অস্ত্রধারীদের চাঁদাবাজি দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ বিপন্ন ও দুঃসহ করে তুলেছে, এবং

যেহেতু ট্রান্সশিপমেন্টের নামে বাংলাদেশের উপর দিয়ে ভারতকে করিডোর দেওয়ার উদ্যোগ নিয়ে সরকার জাতীয় স্বার্থ ও অস্তিত্বের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এবং

যেহেতু সরকার আমাদের সীমান্তে ভারতীয় সেনাদের আক্রমণ, বিডিআর সদস্য ও নাগরিকদের হত্যা, জমি এবং সম্পদ দখলের প্রক্রিয়াকে বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে;

সেহেতু আজ সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, কৃষিজীবী, প্রকৌশলী, শিক্ষক, আলেম-ওলামা, ডাক্তার, আইনজীবী, ছাত্র-যুবক, শ্রমিক, মহিলা সংস্কৃতিসেবী ও অন্যান্য সকল শ্রেণীর জনসাধারণের একটি মাত্র দাবি, আর তা হলো, বর্তমান সরকারকে অবিলম্বে পদত্যাগ করে সাংবিধানিক নিয়ম মোতাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে।

আমাদের স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও জাতীয় অর্থনীতি, আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ রক্ষার এটাই আজ একমাত্র শান্তিপূর্ণ সাংবিধানিক পথ।

একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে আমরা এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। ন্যূনতম পর্যায়ের উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে জাতি গঠন প্রক্রিয়াকে সমুন্নত রেখে ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে আমাদের বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় শামিল হতে হবে। তাই আমাদের চার দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এই যে, 'যথাসত্বর ব্যাপক ঐক্যের ভিত্তিতে একটি দেশপ্রেমিক ও সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল শক্তিশালী সরকার গঠন করে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা।

এই ভবিষ্যৎ সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার' সাংবিধানের এই মূলনীতি সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন; কঠোরহস্তে দুর্নীতি দমন; প্রশাসনিক শৃঙ্খলার পুনরুদ্ধার; সর্বস্তরে মেধা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি; অস্ত্রধারী চাঁদাবাজ দমন ও সকল নাগরিকের জানমালের নিরাপত্তা বিধান; আইনের শাসন পুনরুদ্ধার ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা; বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল; শিক্ষার মান ও পরিবেশ পুনরুদ্ধার; সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সহনশীলতা প্রতিষ্ঠা; রেডিও টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন প্রদান; দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ; সর্বক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক মান ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা; মানবসম্পদ উন্নয়ন; সংবিধান, সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের মূলনীতিগুলির বাস্তবায়ন ও সুরক্ষা; কৃষক-শ্রমিকের ভাগ্যোন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচন; বিপুল বেকার যুবসমাজের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান, মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রেখে সকল জনগণের সঞ্চয় ও জীবন মানের সুরক্ষা; নারী সমাজের অধিকার, মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া এবং শিশুদের সুন্দরতম জীবন বিকাশের সুযোগ নিশ্চিতকরণ, জাতীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণ, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও বহুমুখী শক্তি সঞ্চয়; প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার ও সুনিয়ন্ত্রণ; সংবিধানের মূলনীতি পরিপন্থী সকল আইন সংশোধন; সর্বসম্প্রদায়ের নাগরিকের জন্য আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বিধান; এবং জাতীয় স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ গতিশীল পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা।

আমাদের সমগ্র জনগণ আজ ঐক্যবদ্ধ। আমাদের অপ্রতিরোধ্য আন্দোলনের জয় হবেই, ইনশাহ আল্লাহ।

সরকারের মনে রাখা উচিত, জনগণের ইচ্ছা প্রতিফলনের মধ্যে দিয়েই সামাজিক শান্তি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হতে পারে। সংঘাতের পথ বিপর্যয়ই ডেকে আনে। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা।

আমরা সম্মিলিতভাবে ঘোষণা করছি, চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত চলমান এক দফা আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। চক্রান্ত যত কুটিলই হোক, নির্যাতন যত বর্বরই হোক, জনজোয়ার কখনও স্তব্ধ হয় না।

আমরা দেশের সকল জাতীয়তাবাদী, গণতন্ত্রকামী, ইসলামী দল, গ্রুপ, কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র, সকল পেশাজীবী, সংস্কৃতিসেবী সংগঠন ও ব্যক্তিকে চলমান গণআন্দোলনে শামিল হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

আমাদের আন্দোলনের বিজয় ত্বরান্বিত করার জন্য আমরা দেশজুড়ে সকল মহল্লায়, গ্রামে, শহরে ও বন্দরে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।

বেগম খালেদা জিয়া	হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	গোলাম আযম	আজিজুল হক
চেয়ারপার্সন	চেয়ারম্যান	আমীর	চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	জাতীয় পার্টি	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	ইসলামী ঐক্যজোট

শেখ হাসিনার শাসনামলে দ্বিতীয় বড় ঘটনা

শেখ হাসিনার শাসনামলে সবচেয়ে বড় ঘটনা হলো সরকারের বিরুদ্ধে চার দলীয় ঐক্যজোট গঠন এবং জোটবদ্ধভাবে আন্দোলন, নির্বাচন ও সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত। এ বিষয়ে গত দু কিস্তিতে আলোচনা করা হয়েছে। ঐ আমলে আরো একটি বড় ঘটনা হলো জাতীয় শরী'আ কাউন্সিল নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা, যার মধ্যে দেশের সকল দীনী মহলই শরীক থাকবেন এ সংগঠন অবশ্য অরাজনৈতিক। সকল ইসলামী রাজনৈতিক দল এতে শরীক আছে। এ ছাড়া অরাজনৈতিক বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্বও এতে শামিল আছেন।

জাতীয় শরী'আ কাউন্সিল গঠনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

নৈরাশ্যের ঐ অন্ধকারে ১৯৯৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ঝালকাঠি থেকে ঐক্যের এক প্রচেষ্টা শুরু হওয়ার খবর পেলাম। এরই ধারাবাহিকতায় ঐ বছর ১১ জুলাই মীরপুরস্থ ফুরফুরা দরবার শরীফ, দারুস সালামের বৈঠকে সকল মহলের (চরমোনাইর পীর সাহেব ছাড়া) নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি দেখে আমার মনে ঐক্যের ব্যাপারে আশার সঞ্চার হলো। ১৯৯৮ সালের ১৮ নভেম্বর সারাদেশের ৬৩ জন নেতৃস্থানীয় ওলামা-মাশায়েখের যুক্ত-বিবৃতি জাতীয় দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত হওয়ার পর ঐক্যের সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল মনে হলো।

ঐ বছর ১৫ ডিসেম্বর ফুরফুরা দরবার– মারকাযে ইশাআতে ইসলাম দারুস সালাম, মীরপুরে উক্ত স্বাক্ষরকারীগণের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ মাওলানা আযীযুর রহমান কায়েদ সাহেবের সভাপতিত্বে 'জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিল' গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের আহ্বায়ক কমিটি

১৯৯৮ সালের ১৫ ডিসেম্বরের সম্মেলনেই জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা উবায়দুল হক সাহেবকে প্রধান আহ্বায়ক করে নিম্নলিখিত ওলামা-মাশায়েখকে নিয়ে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়।

১. মাওলানা উবায়দুল হক (খতীব, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ)।

২. শায়খুল হাদীস আল্লামা আযীযুল হক।

৩. মাওলানা আহমাদ শফী' (মুহতামিম, হাটহাজারী মাদরাসা, চট্টগ্রাম)।

৪. মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (কায়েদ সাহেব)।

৫. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান (অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

৬. মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ।

৭. মাওলানা আবদুল মান্নান (শায়খুল হাদীস, গাওহারডাঙ্গা)।

৮. মাওলানা আবদুস সুবহান।

৯. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (সম্পাদক, মাসিক মদীনা)।

১০. মাওলানা হারুন ইসলামাবাদী (মুহতামিম, জামেয়ায়ে ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম)।

১১. মাওলানা মুফতী ফজলুল হক আমিনী, (প্রিন্সিপ্যাল, জামেয়া কুরআনিয়া, লালবাগ)।

১২. মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, এমপি।

১৩. মাওলানা শাহ মুহিব্বুল্লাহ (ছারছীনা)।

১৪. মাওলানা আনোয়ার হোসাইন তাহের আল জাবেরী (খতীব, শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম)।

১৫. মাওলানা কুতুবুদ্দিন (পীর সাহেব, বায়তুশ শরফ)।

১৬. মাওলানা সাইয়্যেদ নজর ইমাম মুহাম্মদ (পীর সাহেব, নারিন্দা)।

১৭. মাওলানা আব্দুল লতিফ (পীর সাহেব, ফুলতলী, সিলেট)।

১৮. মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন আহমদ আবু বকর মিয়া (পীর সাহেব, বাহাদুরপুর)।

তাছাড়া মুফতী সাঈদ আহমদ সাহেবকে প্রধান করে নিম্নলিখিত সদস্যগণকে নিয়ে একটি লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করা হয়।

লিয়াজোঁ কমিটির সদস্যবৃন্দ

১. মুফতী সাঈদ আহমদ মুজাদ্দেদী (প্রধান, লিয়াজোঁ কমিটি)।

২. মাওলানা প্রিন্সিপ্যাল সাইয়েদ কামাল উদ্দীন জাফরী।

৩. ড. আ. ন. ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর।

৪. অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক।

৫. এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলাম।

৬. মাওলানা আব্দুল মতিন।

৭. মাওলানা আতাউর রহমান খান (সাবেক এমপি)।

৮. মাওলানা কবি রুহুল আমিন খান (নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব)।

৯. মাওলানা আবুল কালাম আজাদ।

নতুন ঐক্যপ্রচেষ্টায় ফুরফুরার পীর সাহেবের অব্যাহত অবদান

১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঝালকাঠিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ফুরফুরার পীর মুহতারাম মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহ্হার সিদ্দীকী উপস্থিত ছিলেন। ঐ বছর ১১ জুলাই সর্বদলীয় যে বৈঠকে আমি উপস্থিত ছিলাম, তা মীরপুরস্থ ফুরফুরার দরবার শরীফেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৯৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিল গঠনের সিদ্ধান্ত ঐ দরবার শরীফে অনুষ্ঠিত সম্মেলনেই গৃহীত হয়।

প্রতি বছরই মীরপুরস্থ মারকাযে ইশায়াতে ইসলাম দারুস সালামে ফুরফুরা শরীফের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলন ৩ থেকে ৫ দিনব্যাপী চলে। এ সম্মেলনের সময়ই পীর সাহেব সেখানে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের বার্ষিক সম্মেলন করার সুযোগ করে দেন। পীর সাহেবের সম্মেলনের জন্য তৈরি মঞ্চ ও প্যান্ডেলই শরীয়াহ্ কাউন্সিল ব্যবহার করে। আপ্যায়নের সকল ব্যয়ভার পীর সাহেবই বহন করেন। শরীয়াহ্ কাউন্সিলের এমন আর্থিক সঙ্গতি এখনও হয়নি যে, তারা প্রতি বছর সম্মেলনের আয়োজন করতে পারবেন। এ দিক দিয়ে ইসলামী ঐক্যের ব্যাপারে পীর সাহেবের অবদান অব্যাহতভাবে চলছে।

জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের ২০০৩ সালের বার্ষিক সম্মেলন

২০০৩ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে ফুরফুরার পীর সাহেবের মীরপুরস্থ দারুস সালামে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের বার্ষিক সম্মেলনে একটি রিপোর্ট পেশ করা হয়। ঐ রিপোর্টে ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঝালকাঠিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলন থেকে ক্রমে ক্রমে কিভাবে এবং কখন জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিল বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয় এর পূর্ণ বিবরণ রয়েছে। ঐ রিপোর্ট থেকে প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১৬.১০.২০০০ তারিখ জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের বৈঠক মুহতারাম মাওলানা উবায়দুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে ৫৫ বি, পুরানা পল্টনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলকে একটি স্থায়ী কমিটিতে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত এবং সেই সাথে নিম্নের প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়–

১. পূর্বঘোষিত জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের আহ্বায়ক ও লিয়াজোঁ কমিটির সম্মানিত সকল সদস্যকে মূল কমিটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২. সভায় মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবের প্রস্তাবক্রমে মাওলানা উবায়দুল হক সাহেবকে স্থায়ীভাবে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মনোনীত করা হয়।

৩. সভায় মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে ভাইস-চেয়ারম্যান, মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমাদ মোজাদ্দেদী সাহেবকে মহাসচিব ও মাওলানা হারুনুর রশিদ খানকে যুগ্ম-মহাসচিব মনোনীত করা হয়।

জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের পৃষ্ঠপোষকগণ–

শায়খুল হাদীস মাওলানা আযীযুল হক।

হযরত মাওলানা আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী (পীর সাহেব, ফুরফুরা)।

হযরত মাওলানা আহমদ শফী (মুহতামিম, হাটহাজারী)।

হযরত মাওলানা আযীযুর রহমান (কায়েদ সাহেব)।

হযরত মাওলানা মুফতী আবদুল মান্নান (শায়খুল হাদীস ও মুহতামিম, গাওহারডাঙ্গা মাদরাসা)।

সভায় মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নের বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।

১০.০৭.২০০১ তারিখ পুরানা পল্টনে মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবের সভাপতিত্বে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি মজলিসে আমেলা (কর্ম-পরিষদ) গঠিত হয়।

মজলিসে আমেলার সদস্যগণ হলেন–

মাওলানা উবায়দুল হক, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মুফতী সাইদ আহমদ, মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, মাওলানা আবদুস সুবহান, মাওলানা ফজলুর রহমান, মাওলানা যাইনুল আবেদীন, মাওলানা মুসলেহ উদ্দিন আহমদ আবু বকর মিয়া, এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলাম।

০৯.০৮.২০০১ তারিখ শরীয়াহ্ কাউন্সিলের বৈঠক মুহতারাম মাওলানা উবায়দুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রেডিও-টিভিতে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধ করা, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা, ভাস্কর্যের নামে মূর্তি নির্মাণ বন্ধ করা ও যে সকল আলেম এখনও জেলে রয়েছেন তাঁদেরকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা জোরদার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১০.০৯.২০০২ তারিখ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবের সভাপতিত্বে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিল, বাংলাদেশের উদ্যোগে একটি জাতীয়ভিত্তিক ওলামা-মাশায়েখ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের

প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং এজন্য মুফতী সাঈদ আহমদ, মাওলানা যাইনুল আবেদীন, মুফতী আব্দুল কুদ্দুস ও মাওলানা আব্দুল লতিফ নেযামীর সমন্বয়ে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়।

জাতীয় ওলামা-মাশায়েখ সম্মেলন

২০০৩ সালের ১ জানুয়ারি সকাল ১০টায় মারকাযে ইশায়াতে ইসলামে (দারুস সালাম) জাতীয় শরীয়া কাউন্সিলের উদ্যোগে জাতীয় ওলামা-মাশায়েখ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। চেয়ারম্যান মাওলানা উবায়দুল হক সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে দেশবরেণ্য ৬৭ জন ওলামা ও মাশায়েখ অংশগ্রহণ করেন। স্বাগত ভাষণ দেন মাওলানা আবদুস সুবহান। জাতীয় শরীয়া কাউন্সিলের রিপোর্ট পেশ করে সেক্রেটারি জেনারেল মুফতী মাওলানা সাঈদ আহমদ। ঘোষাণাপত্র পাঠ করেন ভাইস-চেয়ারম্যান মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।

এরপর থেকে প্রতি বছর ডিসেম্বরে উক্ত স্থানে জাতীয় শরীয়া কাউন্সিলের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে।

চেয়ারম্যানের আকস্মিক ইন্তিকাল

২০০৭... (২৩ রমাদান) রাতে হঠাৎ মাওলানা উবায়দুল হক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর ডিসেম্বরে জাতীয় শরীয়া কাউন্সিলের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে শরীয়া কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবে সর্বজনগ্রাহ্য ও সকল দীনীমহলের আস্থাভাজন এমন কোনো ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। মরহুম মাওলানা উবায়দুল হকের সমকক্ষ ব্যক্তিত্বের অভাবে মাজলিসে সাদারাত গঠন করার বিষয় বিবেচনা করার চিন্তা-ভাবনা চলছে।

ঐ সম্মেলনের পর থেকে জাতীয় শরীয়া কাউন্সিল সক্রিয় নেই বললেই চলে। সকল দীনী মহলের সমন্বয়ে জাতীয় শরীয়া কাউন্সিল যে মর্যাদা লাভ করেছিল তা সক্রিয় না হলে ইসলামী ঐক্যমঞ্চের অভাব অনুভূব হবে। চেয়ারম্যান করার যোগ্য কোনো ব্যক্তি যোগাড় না হলে শরীয়া কাউন্সিল বাস্তবে সক্রিয় হওয়া অবম্ভব। মাজলিসে সাদারাত দিয়ে চেয়ারম্যানের অভাব পূরণ হতে পারে না বলেই আমার ধারণা।

৩৫৬.

গত কয়েকটি কিস্তিতে শেখ হাসিনার শাসনামলের (১৯৯৬-২০০১ সালের জুন) সময়কার ঘটনাবলি আলোচনা করা হয়েছে। ৩৫২ নং কিস্তি পর্যন্ত সে আমলের বিবরণ সমাপ্ত হলো।

ঐ সময়ে আরো দুটো বড় ঘটনার বিবরণ ৩৫৩ ও ৩৫৪ নং কিস্তি হিসেবে লিখেছি। কিন্তু তা পত্রিকায় প্রকাশ না করে পুস্তকাকারে নবম খণ্ডে শামিল করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ৩৫৩ নং কিস্তিতে চার দলীয় জোট গঠনের ইতিহাস এবং ৩৫৪ নং কিস্তিতে ইসলামী ঐক্যমঞ্চ হিসেবে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিল গঠনের বিবরণ রয়েছে, যা এ সময়ে পাঠকদের নিকট পরিবেশন করার প্রয়োজন নেই বলে পত্রিকায় দেওয়া হয়নি। আলোচনার ধারাবাহিকতায় তা নবম খণ্ডে রেকর্ড করে রাখার ব্যবস্থা করা হলো।

'জীবন যা দেখলাম' শিরোনামে আমার আত্মজীবনীর আলোচনায় বিংশ শতাব্দীর বিবরণ সমাপ্ত করা হলো।

২০০১ সালের অক্টোবরে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, চার দলীয় জোটের সরকার গঠন, ঐ নির্বাচনের ফলাফল শেখ হাসিনা কর্তৃক প্রত্যাখ্যান এবং এর ফলে তার আজব রাজনীতি, জোট সরকার আমলে শেখ হাসিনার অব্যাহতভাবে সরকার পতনের আন্দোলন, পরবর্তী কেয়ারটেকার সরকার গঠনে অব্যাহতভাবে সমস্যা সৃষ্টি, ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন বানচালের উদ্দেশ্যে হিংস্র ও সন্ত্রাসী কর্মসূচি পালন ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা হয়ে গেছে।

ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে নতুন কেয়ারটেকার সরকার গঠন, এ সরকারের অসাংবিধানিকভাবে দু'বছর ক্ষমতা দখল করে থাকা এবং তাদের অবৈধ কার্যাবলি সম্পর্কেও যথেষ্ট লেখা হয়েছে।

সুতরাং একবিংশ শতাব্দীর বিগত ৮ বছরের ঘটনাবলি ধারাবাহিকভাবে লেখার প্রয়োজন নেই। আমার এ লেখা তো ইতিহাস নয়। পরবর্তী কিস্তিগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ে লেখা হবে। জীবনে আরো কত কিছুই দেখছি, সেসব সম্পর্কে লেখা জারি থাকবে, ইনশাআল্লাহ। এ সময় ২৯ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সম্পর্কে লিখছি।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়ে গেল

২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারির বদলে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর শেষ পর্যন্ত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়ে গেল। যে রকম নির্বাচনই হোক, অনির্বাচিত স্বৈরশাসনের তো অবসান হলো। দু'বছর তো জরুরি অবস্থার যাঁতাকলেই জনগণ

কোনো রকমে বেঁচে ছিল। এখন নির্বাচিত সরকার দেশ পরিচালনা করবে। জরুরি অবস্থা বহাল থাকবে না। সরকার যদি এমন কিছু করে যা জনস্বার্থের বিরোধী, তাহলে তো প্রতিবাদ করা যাবে। সে হিসেবে নির্বাচন হয়ে যাওয়ায় অন্তত গণতন্ত্র তো বহাল হলো।

সরকার যদি নির্বাচনপূর্ব দলীয় মেনিফেস্ট ও দলীয় প্রধান শেখ হাসিনার নির্বাচন অভিযানকালীন বিস্তারিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জনগণের খেদমত করতে সক্ষম হয় তাহলে যারা সরকারি দলকে ভোট দেয়নি তারাও সন্তুষ্ট হবে। যদি এর ব্যতিক্রম হয় তাহলে জাতীয় সংসদে বিরোধী দল জনগণের পক্ষে সরকারের সমালোচনা করবে, সরকারের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি হলে বিভিন্ন দাবিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলনও করা যাবে। গত দু বছরের মতো শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে তো উদ্ধার পাওয়া গেল।

তাই নির্বাচন হওয়াটাই দেশবাসীর জন্য বিরাট স্বস্তির বিষয়। জনগণ এখন সরকারের জনকল্যাণমূলক কাজের আশা নিয়ে দিন গুণতে থাকবে।

কেমন নির্বাচন হলো?

দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষকগণ জোর সার্টিফিকেট দিলেন যে, নির্বাচন অত্যন্ত স্বচ্ছ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনের সময় অনেক সন্ত্রাসী কার্যকলাপের আশঙ্কা থাকে। বিভিন্ন স্থানে কিছু কিছু ঘটনা ঘটলেও নির্বাচন মোটামুটি শান্তিপূর্ণ হয়েছে বলেই মনে হয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যথাযথ ভূমিকা পালন করেছে বলে ধরা যায়। বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারেনি।

ছবিসহ ভোটার তালিকা থাকায় জাল ভোটের আশঙ্কা থাকার কথা নয়; কিন্তু প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট ফটোসহ ভোটার তালিকা থাকলেও পোলিং এজেন্টদেরকে ফটোহীন তালিকা দেওয়ায় জাল ভোটের সুযোগ নেওয়া সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া রঙিন ফটো না থাকায় সাদা-কালো ফটো থেকে সঠিকভাবে শনাক্ত করা যায়নি বলেও সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।

কোথাও কোথাও প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টকে দায়িত্ব পালন করতে না দেওয়ার অভিযোগ আছে। আরো বিভিন্ন রকম অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে; কিন্তু এসব সত্ত্বেও দৃশত নির্বাচনে বড় কোনো বিশৃঙ্খলা হয়নি বলা চলে।

বিজয়ী দল প্রকাশ্যে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করেছে বলেও তেমন একটা দেখা যায়নি।

অবিশ্বাস্য নির্বাচনী ফলাফলের রহস্য

মহাজোটের ২৬৩ আসনে বিজয় এবং চারদলীয় জোটের মাত্র ৩২টি আসন লাভ বিস্ময়কর, অবিশ্বাস্য, অচিন্তনীয় ও অস্বাভাবিক। বিএনপি দেশের বৃহত্তম দল হিসেবে

গণ্য। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিএনপি সরকার একদলীয় নির্বাচন করার পর সরকার গঠন করে ১১ দিন পরই পদত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ায় মর্যাদাহারা হয়েও জুনের নির্বাচনে ১১৬টি আসনে বিজয়ী হয়ে প্রমাণ করেছে যে, দলটি সত্যিই জনপ্রিয়। বেগম জিয়ার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা অতুলনীয়। নির্বাচনী অভিযানে সারা দেশে তাঁর জনসভা ও পথসভার চিত্র এ কথাই প্রমাণ করে। এ অবস্থায় বিএনপির মাত্র ২৯টি আসনে বিজয়ী হওয়া অবশ্যই অবিশ্বাস্য ও অস্বাভাবিক।

ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো আদর্শ গণতান্ত্রিক দেশেও নির্বাচনে ভোটদাতার সংখ্যা শতকরা ৬০-এর বেশি নয়। অথচ এ নির্বাচনে ৮৭.২% ভোটার ভোট প্রদান করেছে। এটা একেবারেই অস্বাভাবিক। কোনো কোনো আসনে ৯৫% ভোট পড়েছে বলে প্রধান নির্বাচন কমিশনারও 'অচিন্তনীয় অস্বাভাবিক' বলে মন্তব্য করেছেন।

বিভিন্ন আসনে প্রদত্ত ভোটের বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। রাজশাহী ৫ আসনের বিবরণে জানা গেল যে, একটি কেন্দ্রে মোট ভোটারের চেয়েও ৪/৫ শ' ভোট বেশি পড়েছে। ঐ কেন্দ্রে ১০৫.৩২% ভোট প্রদত্ত হয়েছে। ঐ আসনে একটি কেন্দ্রে ১০০%, একটিতে ৯৯% ভোট পড়েছে। গড়ে ৯৫% ভোট পড়েছে। সারা দেশে গড়ে ৮৭.২%-এর বেশি ভোট প্রদত্ত হয়েছে। এ ভৌতিক কারবার কেমন করে ঘটল?

আরো আসনের তথ্যাবলি পত্রিকায় আসতে থাকবে। নির্বাচনী ফলাফল মানুষকে হতবাক করে দিয়েছে। বিজয়ী দলও কল্পনা করেনি যে, তারা এত অধিক সংখ্যক আসনে বিজয়ী হবে এবং এত বিরাট সংখ্যায় ভোট পাবে।

রহস্য উদ্ঘাটন

সেনাসমর্থিত ড. ফখরুদ্দীন সরকার যে মোটেই নিরপেক্ষ ছিল না, তা সরকার গঠনের শুরু থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার তো অত্যন্ত নগ্নভাবে আওয়ামী লীগপ্রেমী ও চরম বিএনপিবিদ্বেষী হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন।

সংবিধানে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান রয়েছে ড. ফখরুদ্দীন সরকার সে ধরনের কোনো সরকার ছিল না। যারা জরুরি অবস্থা জারি করার জন্য প্রেসিডেন্টকে বাধ্য করেছেন বলে গোটা বিশ্ব জানে, তারাই এ সরকার গঠন করেছেন।

সংবিধান অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ ৯০ দিন। এ সরকার সেনাসমর্থন পেয়ে দু বছর ক্ষমতাসীন রয়েছে। পূর্বের তিনটি কেয়ারটেকার সরকার নিরপেক্ষ ছিল। কোনো পক্ষকে বিজয়ী করার কোনো প্রয়োজন তাদের ছিল না।

কিন্তু ড. ফখরুদ্দীন সরকারের বিরাট গরজ ছিল এমন একটি নির্বাচিত সরকার, যারা তাদের দু বছরের যাবতীয় অবৈধ কার্যকলাপকে বৈধতা দান করবে। তারা দু বছরে

শতাধিক অধ্যাদেশ জারি করেছে। ব্যারিস্টার রফিক-উল হকের মতে, মাত্র পাঁচটি অধ্যাদেশ নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর সব অধ্যাদেশই অবৈধ ও সংবিধান অনুযায়ী সম্পূর্ণ এখতিয়ারবহির্ভূত।

যে দলটির সন্ত্রাসী আন্দোলনের ফসল হিসেবে এ সরকার ক্ষমতা লাভ করেছে সে দলের নেত্রী সরকার গঠনের পরপরই নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, তার দলকে ক্ষমতাসীন করা হলে এ সরকারের সকল অবৈধ কার্যাবলিকে তারা বৈধতা দান করবেন।

সরকার তো এ ব্যবস্থা করেই ফেলেছিল যে, চারদলীয় জোটকে নির্বাচনের বাইরে থাকতে বাধ্য করা হবে এবং একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের পছন্দের দলকে ক্ষমতাসীন করবে; বেগম জিয়াকে বিদেশে যেতে রাজি করাতে না পারলে তাকে জেলে রেখেই নির্বাচন করবে। কিন্তু সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে জামিন পেয়ে তিনি মুক্ত হওয়ার পর সরকার সমস্যায় পড়ে গেল। চারদলীয় জোটের নির্বাচনে শরিক হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারি টালবাহানার কারণে অনেক বিলম্ব হয়ে গেল।

চারদলীয় জোট বিজয়ী হলে তাদের অবৈধ কার্যাবলিকে বৈধতা দেওয়ার কোনো প্রতিশ্রুতি বেগম জিয়ার নিকট থেকে আদায় করতে সক্ষম না হওয়ায় সরকার প্রমাদ গুনল।

যদি নির্বাচনে চারদলীয় জোট বিজয়ী হয়ে যায় এবং চারদলীয় সরকার তাদের অবৈধ কর্মকাণ্ডকে বৈধ করতে অসম্মত হয় তাহলে তাদেরকে বিচারের আত্মরক্ষার স্বার্থেই আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করতে হবে।

ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং

সরকার ২ বছর ক্ষমতায় থাকার ফলে সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে যারা আওয়ামীপন্থি তাদেরকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে। জেলা প্রশাসক (ডিসি) যারা তারাই রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করে থাকে। তাই নির্বাচনের সময়ে সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী দায়িত্ব বিশ্বস্তরূপে পালনের যোগ্য দেখেই ঐ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাদেরকে ১৯৭০-এর মতো নির্বাচন করার নির্দেশ দিলেন। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসার বাছাই করার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন সরকারের সহযোগিতা পেয়েছে।

ভোটাররা ভোট দিয়ে গেছে। অবশিষ্ট ব্যালট পেপার প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসাররা স্বচ্ছন্দে কাজে লাগিয়েছেন। নৌকার সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য এত ব্যালট ব্যবহার করার প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু উৎসাহী দায়িত্বশীলগণ নৌকার বিজয় নিশ্চিত করার জন্য নিষ্ঠার সাথে এ অপকর্মটি করেছেন।

সরকার আওয়ামী লীগকে বিজয়ের নিশ্চয়তা দিয়ে তাদেরকে ভোটকেন্দ্রে সংযত থাকার পরামর্শ দিয়ে কারচুপি করার এমন চমৎকার কৌশল উদ্ভাবন করেছে, যাতে দেশি ও বিদেশি পর্যবেক্ষকদের নিকট নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও অবাধ বলে প্রমাণিত হয়।

ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর উপরিউক্ত ব্যাখ্যা ছাড়া শতকরা ৯০/৯৫ ভোটারের উপস্থিতির আর কী ব্যাখ্যা থাকতে পারে?

মহাজোট তো ২০০ আসন পেলেই চরম সন্তুষ্টি প্রকাশ করত। সংসদের ৬ ভাগের ৫ ভাগেরও বেশি আসন পাওয়ার প্রয়োজন ছিল না।

বিরোধী দলের গণতান্ত্রিক আচরণ

অত্যন্ত অস্বাভাবিক, বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য নির্বাচনী ফলাফল হওয়া সত্ত্বেও চারদলীয় জোট এ ফলাফলকে প্রত্যাখ্যান না করে প্রশংসনীয় গণতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। কারণ, তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। অগণতান্ত্রিক আচরণে তারা অভ্যস্ত নয়। নির্বাচন ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় সরকার গঠনের বৈধতা তারা স্বীকার করে না। তাদের এ ধৈর্যের সুফল তারা একদিন পাবে। দেশকে গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর করার জন্য কোনো বিকল্প পথ নেই। অগণতান্ত্রিক পন্থায় গণতন্ত্র কায়েম হতে পারে না।

সংসদে বিরোধী দল আদর্শ গণতান্ত্রিক ভূমিকা পালন করে দেশবাসীর আস্থা অর্জন করতে পারলে এর সুফল সকলেই ভোগ করবে। ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জঘন্য পন্থা যারা অবলম্বন করেছেন তারা নিজেদেরকে রক্ষার ব্যবস্থা করে প্রমাণ করেছেন যে, তারা গণতন্ত্রের দুশমন। ড. ফখরুদ্দীন সরকার অন্যায় পন্থায় ক্ষমতা দখল করে দেশকে ২০ বছর পিছিয়ে দিয়ে নির্বাচনে জঘন্য কারচুপি করে নিরাপদ প্রস্থানের ব্যবস্থা করেছেন।

শেখ হাসিনা কি অবাস্তব নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারবেন?

শেখ মুজিব ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে ২৯৩টি আসন দখল করেন। দু বছরের মধ্যেই তার জনপ্রিয়তা শূন্যের কাছাকাছি নেমে আসে। বাকশালী স্বৈরশাসন কায়েম করেও তিনি সফল হতে পারেননি।

শেখ হাসিনার মহাজোট সংসদে ২৬৩ আসন পেয়েছে। যেভাবেই হোক তিনি বিশাল শক্তি নিয়ে ক্ষমতাসীন হলেন; কিন্তু জনপ্রিয়তা ধরে রাখা কি এত সহজ? তিনি ১০ টাকা সের চাল, বিনামূল্যে সার ও প্রতি পরিবারে একজনের কর্মসংস্থানের যে অবাস্তব ওয়াদা নির্বাচনী অভিযানে করলেন তা পূরণ করতে না পারলে কী দশা হবে? পারলে তো জনপ্রিয়তা আরো বৃদ্ধিই পাবে; কিন্তু না পারলে...?

আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদী বাহিনী নির্বাচনের পর সারা দেশে যে তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ন্ত্রণ করতে শেখ হাসিনা জোরালো ভূমিকা পালন করছেন না। এতে তার সন্ত্রাসী ক্যাডাররা প্রশ্রয় পাচ্ছে।

দেশবাসী শেখ হাসিনার বিগত শাসনকালে যে দুঃশাসন দেখেছে, এবার যদি তারা সুশাসন দেখতে পায় তাহলে বিরোধী দলও তাদের সাথে সহযোগিতা করবে। কয়েক মাসের মধ্যেই জনগণ টের পাবে। অতীত তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আমরা শেখ হাসিনার সুশাসন কামনা করি।

৩৫৭.

২০০৮-এর নির্বাচনে ভৌতিক কারবার

এ দেশে এ পর্যন্ত যত নির্বাচন হয়েছে এর কোনোটিতেই গড়ে শতকরা ৭৫-এর বেশি ভোট প্রদত্ত হয়নি। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৮৮টি আসনে গড়ে ৯০% ভোট প্রদত্ত হয়েছে বলে জানা গেল। ২৯৯টি আসনে গড়ে শতকরা ৮৭টি ভোট পড়েছে। কোনো কোনো আসনে ৯৫% ভোটও প্রদত্ত হয়েছে। কোনো কেন্দ্রে ৯৯%, কোনো কেন্দ্রে ১০০% এমনকি কোনো কেন্দ্রে ১০৫%-এরও প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যদি শতকরা ৭৫ জন ভোটারও ভোটাধিকার প্রয়োগ করে থাকে তাহলে কমপক্ষে শতকরা ১২টি ভোট ভৌতিক উপায়ে প্রদত্ত হয়েছে। এ ভৌতিক কারবার কেমন করে সংগঠিত হলো তা নির্বাচন কমিশনেরই তদন্ত করা কর্তব্য। এত ভোট প্রদত্ত হওয়া 'অস্বাভাবিক ও অচিন্তনীয়' বলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মন্তব্য করা সত্ত্বেও এ বিষয়ে তদন্ত করার কোনো উদ্যোগ নির্বাচন কমিশন গ্রহণ করেনি।

বিভিন্ন স্থানে ব্যালট পেপারের মুড়ি পাওয়ার খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। এটাও ভৌতিক কারবার। ধানের শীষে সীলমারা ব্যালটও কোথাও পড়ে থাকার খবর পাওয়া যাচ্ছে। ব্যালট পেপার তো পোলিং অফিসারদের হাতেই থাকার কথা। এগুলো বাইরে কেমন করে গেল। নির্বাচন কমিশন এ সম্পর্কেও কোনো তদন্ত করতে প্রস্তুত নয়; বরং কমিশন তাদেরকেই অপরাধী সাব্যস্ত করতে চায়, যারা ব্যালট পেপারের মুড়ি বা ব্যালট পেপার পাওয়ার অভিযোগ করছে।

নির্বাচন কমিশন কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়ায় পরম স্বস্তিবোধ করেছে। তাই তদন্তের ঝামেলায় যাবে কেন?

ময়দানে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি সুবিধাজনক অবস্থানে

১. মহাজোটের মাঝে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টিই উল্লেখযোগ্য দল। দল দুটি জোট বেঁধে নির্বাচন করায় উভয় দলের সমর্থক ভোটারদের ভোট তাদের সকল আসনেই পেয়েছে। এ সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ ৪টি ও জাতীয় পার্টি ১২টি আসনে জামানত হারিয়েছে।

২. এ দল দুটি সরকারের প্রতি আস্থাবান থাকায় জরুরি অবস্থার মধ্যেও নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিল। কয়েক মাস আগে তারা কতক পৌরসভা নির্বাচনেও অংশ নিয়ে একচেটিয়া বিজয় লাভ করে।

৩. প্রধান নির্বাচন কমিশনার আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সাথে প্রথম সাক্ষাতেই অত্যন্ত আবেগময় ভাষায় দলটির প্রশংসা করেছেন এবং ড. ফখরুদ্দীন আহমদ সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে আওয়ামী লীগের আন্দোলনের ফসল বলে উল্লেখ করে বলেছেন, 'জনগণ আপনাদেরকেই ক্ষমতায় দেখতে চায়।' এতে আওয়ামী লীগ নিশ্চিত হয় যে, এ সরকার ও নির্বাচন কমিশন তাদেরকে ক্ষমতাসীন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে।

৪. আওয়ামী লীগের সিনিয়র কতক নেতা দলের নেতৃত্বে ও গঠনতন্ত্রে শেখ হাসিনাবিরোধী সংস্কারের চেষ্টা শুরু করেও শেখ হাসিনার গ্রেফতারের পর তারা আর অগ্রসর না হওয়ায় দলটির মধ্যে ঐক্য বহাল থাকে। সরকার ও নির্বাচন কমিশন দলটির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির সামান্য চেষ্টাও করেনি।

৫. ক্ষমতায় যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে দলটি শুরু থেকেই নির্বাচনের প্রস্তুতির উদ্যোগ নেয়। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এরশাদ তো সরকারের অন্ধ সমর্থকের ভূমিকা পালন করেন। রাষ্ট্রপতি হওয়ার ইচ্ছা বারবার প্রকাশ করে তিনি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে দলটিকে মাঠ পর্যায়ে প্রস্তুত থাকতে তাকিদ দেন।

৬. ২০০৮ সালের জুন মাসে হঠাৎ নির্বাহী আদেশবলে সরকার প্যারোলে শেখ হাসিনাকে মুক্তি দিয়ে তার দাবি অনুযায়ী চিকিৎসার অজুহাতে বিদেশে যেতে দেয়। তিনি দলীয় নেতৃবৃন্দকে বলে যান যে, আমার অনুপস্থিতিতেও যেন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা হয়। দলের নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত নেন যে, নির্বাচনে সরকার তাদেরকে বিজয়ী করলে তারা সরকার গঠন করে শেখ হাসিনাকে পূর্ণ মুক্ত করবে।

৭. চারদলীয় জোট জরুরি অবস্থার অধীনে পৌর নির্বাচনে সিটি কর্পোরেশন ও সম্মত না হওয়ায় আওয়ামী লীগ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৪টি সিটি কর্পোরেশন ও ৯টি পৌরসভা একচেটিয়া দখল করে নেয়। এভাবেই চারদলীয় জোটকে বাইরে রেখেই জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও বিজয়ী হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল।

৮. সারা দেশে আসন বন্টনের কাজ অনেক আগেই শুরু করায় আওয়ামী লীগ নির্বাচনের প্রাথমিক প্রস্তুতি যথাসময়েই সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়।

৯. মহাজোটের দুটো প্রধান দলই মাঠ পর্যায়ে নির্বাচনী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য দীর্ঘ কয়েক মাস ময়দানে সক্রিয় থাকার সুযোগ গ্রহণ করে।

১০. নির্বাচনী ইশতিহারে ও নির্বাচনী অভিযানে শেখ হাসিনা ১০ টাকা সের চাল, বিনামূল্যে সার, প্রতি পরিবারে অন্তত একজনের জন্য কর্মসংস্থানের অবাস্তব ওয়াদা করে বস্তিবাসী, সাধারণ শ্রমজীবী ও বেকার যুবকদেরকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হন। এ কারণেও মহাজোট বেশ সংখ্যক ভোট পেয়ে থাকবে।

১১. আমেরিকা, ভারত, ইউরোপীয় ইউনিয়ন মত প্রকাশ করেছে যে, তারা বাংলাদেশে সেক্যুলার সরকার কামনা করে। সরকার যাবতীয় কার্যকলাপ এ মনোভাব নিয়েই সম্পাদন করেছে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া সামান্য কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া অবিরাম চারদলীয় জোটের বিরুদ্ধে জঘন্য অপপ্রচার চালিয়ে জনমতকে বিভ্রান্ত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

১২. এত সবের পরও সরকার, প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কৌশল অবলম্বন করে বিপুল ভোটাধিক্যে মহাজোটকে বিজয়ী করার ব্যবস্থা করেন।

ভোট দানের শতকরা হার এমন অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়কর প্রমাণিত হয় যে, গণতন্ত্রের ইতিহাসে বিশ্বে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মর্যাদা অর্জন করেছে। ১৯৭০-এ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দুটো আসন ছাড়া সকল আসনে বিজয়ী হলেও ভোট দানের হার এত বেশি ছিল না।

১৩. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক অগ্রগতিতে আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারত এত আতঙ্কিত এবং এখানে সেক্যুলার শক্তিকে ক্ষমতাসীন দেখতে এতটা ব্যগ্র যে, ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন বানচাল করার জন্য শেখ হাসিনার প্রচেষ্টাকে সফল করার জন্য প্রকাশ্যে তাদের কূটনীতিকরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। যারা জরুরি অবস্থা জারির উদ্যোগ নিয়ে নির্বাচন ভণ্ডুল করেছে তারা একটি সেক্যুলার সরকারই কায়েম করেছে। এ সরকার দু'বছর যা করেছে সবই আওয়ামী লীগের এজেন্ডার বাস্তবায়ন।

১৪. নির্বাচনের পর বিদেশি পর্যবেক্ষকগণ সমস্বরে দাবি করতে থাকেন যে, নির্বাচন আন্তর্জাতিক মানে নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অবাধ হয়েছে। তাদের দেশে শতকরা ৯০-৯৫টি ভোট কোনো নির্বাচনে পড়ে কি না, তারা তা বিবেচনা করার প্রয়োজন মনে করেননি। নির্বাচনে তাদের কামনা পূরণ হওয়ায় তারা এতটা স্বস্তিবোধ করেছেন যে, এ নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নিতে বিরোধী দলকে নসিহত করা প্রয়োজনবোধ করেছেন।

১৫. আওয়ামী লীগ কট্টর ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি হিসেবে গোটা পাশ্চাত্য এমনকি জাতিসংঘের সমর্থন, সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা ভোগ করেছে। এরা সারা বিশ্বে এ নির্বাচনকে আদর্শ উদাহরণ বলে প্রচার করে আওয়ামী লীগকে প্রচণ্ড শক্তি জুগিয়েছে।

১৬. দেশের অভ্যন্তরে এ বিস্ময়কর বিজয় এ ধারণা দিতে চাচ্ছে যে, জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তি আর সহজে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না এবং ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিই স্থায়ীভাবে এ দেশ শাসন করবে।

১৭. নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ায় আওয়ামী লীগ ফলাফল মেনে নেওয়ার সহজ সুযোগ পেয়ে গেছে। পরাজিত হলে তারা কারচুপির অভিযোগ তুলে ফলাফল প্রত্যাখ্যান করার ঝামেলা থেকে বেঁচে গেল।

চারদলীয় জোট চরম সংকটময় অবস্থানে

১. চারদলীয় জোট মূলত মাত্র দু'দলের জোট। বাকি দু'দল জোট গঠনের সময় দল হিসেবে গণ্য হলেও পরে ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে গেছে। তাই নামে মাত্র চারদলীয় জোট।

২. ১১ জানুয়ারি (২০০৭) জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে ২২ জানুয়ারির নির্বাচন বানচাল করে দেওয়ার পর সেনাসমর্থিত বা পরিচালিত সরকার জাতীয়তাবাদী ও ইসলামপন্থি শক্তিকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে বিএনপিকে টারগেট বানায়; বিএনপি নেতাদেরকে ব্যাপক সংখ্যায় গ্রেফতার করে বিশেষ আদালতে বিচার করে সাজা দেয়।

৩. বেগম জিয়াকে গৃহবন্দী দশায় রেখেও দলকে ভাঙা সম্ভব নয় বলে কোনো সুনির্দিষ্ট অপরাধ চিহ্নিত না করেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

৪. দলের সংস্কারপন্থি নেতাদেরকে গোয়েন্দা বিভাগ চাপ দিয়ে বিকল্প বিএনপি গঠন করে এবং আসল বিএনপিকে পাস কাটিয়ে চলে।

৫. সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নির্বাচন কমিশন নকল বিএনপিকেই আসল বিএনপি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের সাথে সংলাপ করে।

৬. মাঠ পর্যায়ে বিএনপি কোথাও বিভক্ত হয়ে পড়ে, কোথাও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

৭. ১১ সেপ্টেম্বর (২০০৮) তারিখে বেগম জিয়া জেল থেকে মুক্ত হয়ে স্থবির ও অসংগঠিত দলকে গোছাতে রাত-দিন পরিশ্রম করতে থাকেন। তাঁকে সাহায্য করার মতো যোগ্য নেতারা জেলে এবং তারেকের মতো যোগ্য সংগঠক বিদেশে চিকিৎসাধীন থাকায় তিনি হিমশিম খান।

৮. অক্টোবর মাসেই আওয়ামী লীগ নির্বাচনের আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলে। বেগম জিয়া বুঝতে পেরেছিলেন যে, আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করার নীল নকশা হয়ে গেছে। তাই পাতানো নির্বাচনে যাবেন কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না; কিন্তু নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই বলে সরকারের উপর কয়েকটি বিষয়ে চাপ সৃষ্টি করেন। বিশেষ করে অবিলম্বে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা, গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশের অত্যন্ত আপত্তিকর কতক ধারা বাতিল বা স্থগিত করা ও দলীয় নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে জোর দাবি জানাতে থাকেন।

সরকার ও নির্বাচন কমিশন ১৮ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠানের দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করতে থাকে। বেগম জিয়া স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন যে, জরুরি অবস্থা বহাল থাকা অবস্থায় কিছুতেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না। শেখ হাসিনা ছাড়া বিদেশি পর্যবেক্ষক ও কূটনীতিকরাও জরুরি অবস্থায় সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না বলে ঘোষণা দিতে থাকেন। অবশ্য এরশাদ জরুরি অবস্থা নির্বাচনকালেও বহাল রাখার দাবি জানান।

সরকার অনুভব করল যে, বেগম জিয়া অংশগ্রহণ না করলে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না এবং জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা না হলে বেগম জিয়া নির্বাচনে যাবেন না। সরকার নির্বাচনের সময় জরুরি অবস্থা বহাল থাকবে না বলে ঘোষণা দিতে থাকলেও গড়িমসি করে চলল। এভাবে ডিসেম্বর মাস এসে যাওয়ার পরও জরুরি অবস্থা তুলে না নেওয়ায় বেগম জিয়া সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে থাকেন। নির্বাচনের তারিখ নিকটবর্তী হয়ে এলে বেগম জিয়া ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়ে বললেন যে, ২৮ ডিসেম্বর নির্বাচন হলে এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের দিন থেকে জরুরি অবস্থা তুলে নিলে তিনি নির্বাচনে যাবেন।

সরকার ও নির্বাচন কমিশন ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচন পিছিয়ে দিল এবং মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার তারিখও পিছিয়ে ৩০ নভেম্বর করল। চারদলীয় জোট যথাসময়ে এ শর্ত আরোপ করে মনোনয়নপত্র জমা দিল যে, জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের তারিখ ঘোষণা না করলে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা হবে।

সরকার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনের আগের দিন ঘোষণা দিল যে, ১৬ ডিসেম্বর জরুরি আইন প্রত্যাহার করা হবে। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ছিল ১১ ডিসেম্বর। অবশ্য ১২ তারিখ থেকেই নির্বাচনী সভা ও মিছিল করা যাবে। সে হিসেবে বেগম জিয়া নির্বাচনে যোগদানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হলেন নির্বাচনের মাত্র ১৯ দিন পূর্বে। এভাবে সরকার গড়িমসি করে চারদলীয় জোটকে নির্বাচনী প্রস্তুতি ও অভিযানের জন্য সময় অত্যন্ত সংকীর্ণ করে দিয়ে চরম বেকায়দায় ফেলে দিল।

৯. এ টানাপোড়েনে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সাথে চারদলীয় জোটের দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়ে তাদের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার শিকার হতে হয়। অপরদিকে আওয়ামী লীগের প্রতি তাদের আস্থা আরো বৃদ্ধি পায়।

১০. ময়দানে বেগম জিয়া অবতীর্ণ হওয়ার পর জনগণের মাঝে ব্যাপক সাড়া দেখা যাওয়ার ফলে সরকার ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পক্ষে আরো অধিক গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজনবোধ করে।

১১. বিএনপি চরম অসংগঠিত এবং যথার্থ প্রস্তুতিহীন অবস্থায় নির্বাচনযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়।

১২. চারদলীয় জোট অনেক বিলম্বে ময়দানে কর্মতৎপর হতে পেরেছে। আওয়ামী লীগ আগেই ময়দানে এগিয়ে ছিল।

১৩. নির্বাচনের পূর্বে যে দলের সরকার ক্ষমতায় থাকে তার ব্যর্থতা ভোটারদের স্মৃতিতে তাজা থাকে। বিএনপির শাসনামলে বিদ্যুৎ সেবার ব্যর্থতা ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার অক্ষমতা জনগণ ভুলতে পারেনি।

১৪. নির্বাচনী অভিযানে শেখ হাসিনা গরিব জনগণকে বোকা বানানোর জন্য যে রকম অবাস্তব ও সস্তা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, বেগম জিয়া তা না করায় একশ্রেণীর মানুষ বিভ্রান্ত হওয়ারই কথা।

১৫. জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তি গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল বলে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অভিযোগ করা সত্ত্বেও নির্বাচনী ফলাফল মেনে নিয়ে সংসদে যাচ্ছে।

নির্বাচনী ফলাফলে জামায়াতের অবস্থান

'যুদ্ধাপরাধী' ধুয়া তুলে নির্বাচনে জামায়াতকে ভোট না দেওয়ার জন্য যারা ব্যাপক প্রচারাভিযান চালিয়েছে তারা জামায়াতের পরাজয়ে উল্লসিত হয়ে তাদের প্রচারের সফলতা নিয়ে গর্ববোধ করছে; কিন্তু এবার শতকরা ১২টি ভোট ভৌতিক পদ্ধতিতে না দিলে জামায়াত বেশ কয়েকটি আসন পেত।

এবার নির্বাচনে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে সকল বড় দলেরই। আওয়ামী লীগের ৪টি, জাতীয় পার্টির ১২টি ও বিএনপির ১৪টি আসনে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। জামায়াত মাত্র ১২০০ ভোট কম পেয়ে একটি আসনে জামানত হারিয়েছে। এ আসনে প্রাপ্ত ভোট ৩২৫২৭।

জামায়াত ৩৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২টি আসনে বিজয়ী, ৩০টি আসনে ২য় ও ৬টি আসনে তৃতীয় হয়েছে।

চারটি আসনে বিএনপি ও জামায়াত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। এ আসনগুলো জামায়াতকে ছেড়ে না দেওয়ায় এ কয়টি আসন মুক্ত রাখা হয়। এর মধ্যে ২টিতে জামায়াত দ্বিতীয় হয়েছে। আর দুটিতে তৃতীয়। এর একটিতে বিএনপি জামানত হারিয়েছে।

দিনাজপুর-৬ আসনে জামায়াত ১,৩২,৭৫২ ভোট পেয়ে মাত্র ৮৫৮ ভোটে পরাজিত হয়েছে। জামায়াত ৩৮টি আসনে লড়ে মোট ৩২,০৯,২২৬ ভোট অর্থাৎ গড়ে ৮৪,৪৫৩ ভোট প্রতি আসনে পেয়েছে।

২০০১ সালে জামায়াত ৩১টি আসনে মোট ২৩,৮৫,৩৬১ ভোট পেয়েছে। গড়ে প্রতি আসনে ৭৬,৯৪৭ ভোট প্রাপ্ত হয়েছিল। সে হিসেবে ২০০৮ সালে প্রতি আসনে গড়ে ৭,৬০৬ ভোট বেশি পেয়েছে।

নির্বাচনে অনিয়মের বিবরণ

১. পোলিং এজেন্টদেরকে ছবিসহ ভোটার তালিকা দেওয়া হয়নি বলে জালভোট রোধ করা যায়নি। কারণ এজেন্টরা ছবির অভাবে জাল ভোটার শনাক্ত করতে পারেনি। অনেক ভোটার ভোটকেন্দ্রে এসে জানতে পারেন যে, তার ভোট আগেই দেওয়া হয়ে গেছে।

২. নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ না হওয়ায় আসনের এলাকা নির্ধারণে আওয়ামী লীগের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছে।

৩. ভোটকেন্দ্র নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ প্রার্থীর সুবিধাজনক স্থান বাছাই করা হয়েছে।

৪. কিছুসংখ্যক ভোটার তালিকায় তাদের নাম খুঁজে না পাওয়ায় ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি।

৫. এক পরিবারের ভোটারদের নাম তালিকায় একসাথে থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদান করতে বাধ্য করা হয়েছে। ফলে কিছুসংখ্যক ভোটার ভোট দিতে সক্ষম হননি।

৬. আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী পোলিং এজেন্টরা বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রতিপক্ষের এজেন্টকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে কেন্দ্রে হাজির হতে দেয়নি। সন্ত্রাসীরা এলাকায় চিহ্নিত বলে তাদের হুমকি কার্যকর হয়েছে।

৭. বিএনপির উপর সরকারি নির্যাতনের ফলে সারা দেশে যেসব দলীয় সংগঠক গ্রেফতার হওয়া থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে এলাকা থেকে সরে গিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন তাদের অনেকেই নির্বাচনের সময় এলাকায় ফিরে এলেও নির্বাচনী তৎপরতায় বাধা দেওয়া হয়েছে।

৮. ভোটকেন্দ্রে প্রশাসন আওয়ামী লীগের নির্বাচনবিধি লঙ্ঘনকে বাধা দেয়নি। চারদলীয় জোটের পক্ষ থেকে অভিযোগ করলেও প্রতিকার পাওয়া যায়নি।

এ নির্বাচনে অন্যান্য ইসলামী দলের অবস্থান

মোট ৩৯টি রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনে রেজিস্ট্রেশন পেয়েছে। এর মধ্যে ১১টি দল ইসলামী। সব কয়টি ইসলামী দলই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। এর মধ্যে একমাত্র জামায়াতে ইসলামীই ২টি আসনে বিজয়ী হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী চারদলীয় জোটভুক্ত হলেও সব সময়ই নির্বাচনে নিজস্ব প্রতীক 'দাঁড়িপাল্লা' নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

চারদলীয় জোটের অপর ইসলামী দল ইসলামী ঐক্যজোট ৪টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে এবং বিএনপির প্রতীক ধানের শীষ নিয়েই নির্বাচন করেছে। চারটি আসনের মধ্যে একটিতে পরাজিত হলেও জামানত বাজেয়াপ্ত হয়নি। বাকি ৩টি আসনে জামানত বাজেয়াপ্ত।

ইসলামী দলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক আসনে ইসলামী আন্দোলন (পূর্বনাম-ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন) প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে। ১৬৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সকল আসনেই জামানত হারিয়েছে।

যাকের পার্টি ৩৬টি, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন ৩১টি, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন ৩০টি, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট ১৮টি ও বাংলাদেশের ইসলামী ফ্রন্ট ১৭টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। কিন্তু এর কোনো একটিতেই জামানত রক্ষা পায়নি।

বাকি তিনটি পার্টি বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ৯টি আসনের মধ্যে ১টিতে এবং জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ৬টির মধ্যে ১টিতে জামানত হারায়নি। বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট ৩টিতে দাঁড়িয়ে সব কয়টিতেই জামানত হারিয়েছে।

জামায়াতের ৩৮টি আসনের ২৮টিতেই কোনো না কোনো ইসলামী দল প্রার্থী দিয়েছে। কোনো ইসলামী দলই কোনো আসনে বিজয়ী হয়নি। জামায়াতের আসনগুলোতে অন্যান্য ইসলামী দল সর্বোচ্চ ৮,৯৪৬ ও সর্বনিম্ন ৪২৫ ভোট পেয়েছে। জামায়াতের ৩০ জন পরাজিত প্রার্থী সর্বোচ্চ ১,৪১,৬৬৩ ও সর্বনিম্ন ২৮,২৭০ ভোট পেয়ে ২য় স্থান অধিকার করেছেন; আর ৬টি আসনে ৩য় স্থান অর্জন করেছেন; এর ১টিতে জামানত হারিয়েছেন।

৩৫৮.

শেখ হাসিনা কত বছরের জন্য ক্ষমতাসীন হলেন?

নির্বাচিত সরকারের মেয়াদ পাঁচ বছর; কিন্তু আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতিহারে ২০২১ সাল পর্যন্ত করণীয় সম্পর্কে কর্মসূচি দেওয়া হয়েছে। শেখ হাসিনা নির্বাচনী অভিযানেও বারবার জনগণকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, ২০২১ সালে তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়বেন। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কথাটির কোনো ব্যাখ্যা তিনি দেননি। এতে বোঝা যায় যে, ইশতিহারে যে পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ 'ডিজিটাল'-এর মর্যাদায় উন্নীত হবে।

নির্বাচনে তিনি পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতা পেলেন; কিন্তু তার ইশতিহারের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে আরো আট বছর বেশি দরকার হবে বলে ধারণা দিলেন। অর্থাৎ ২০২১ সাল পর্যন্ত তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ হওয়ার জন্য জনগণকে অপেক্ষা করতে হবে। পাঁচ বছরের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পালন করা না হলে জনগণের কোনো অভিযোগ করার অধিকার নেই। তিনি কায়দা করে এ অজুহাত দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

পাঁচ বছরের বেশি ক্ষমতায় থাকার পরিকল্পনা

পাঁচ বছরের অতিরিক্ত আরো দু মেয়াদ পরিমাণ দীর্ঘ ১০ বছর ক্ষমতায় থাকার পরিকল্পনা কিভাবে বাস্তবায়িত করতে চান, তা আমাদের জানা নেই; আমরা শুধু অনুমান করতে পারি।

১. আগামী পাঁচ বছর এমন সুশাসন চালাবেন যে, জনগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে আগামী নির্বাচনেও তাকে বিজয়ী করবে বলে তিনি নিশ্চিত।

২. সংসদে শাসনতন্ত্র সংশোধন করার ক্ষমতা প্রয়োগ করে কেয়ারটেকার পদ্ধতি বাতিল করে দেবেন এবং তার সরকারের পরিচালনায় পরবর্তী নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির দাবিতে আবারও আন্দোলন হবে?

কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় এ পর্যন্ত দুবার আন্দোলন হয়েছে। ১৯৯০ সালে এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রথম আন্দোলন হয়। ফলে এরশাদকে বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করতে হয়।

১৯৯৪ থেকে '৯৬ পর্যন্ত বিএনপি সরকারের আমলে দ্বিতীয়বার আন্দোলন করে বিএনপিকে শাসনতন্ত্রে ঐ পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য করা হয়।

শেখ হাসিনার বর্তমান শাসনামলে (২০০৯ থেকে) কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি বহাল রাখার জন্য আবার আন্দোলন করতে হবে, যদি সরকার তা বাতিল করতে চায়। বিএনপি নিশ্চয়ই চাইতে পারে না যে, পরবর্তী নির্বাচন শেখ হাসিনা সরকারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হোক। তাই আবার আন্দোলন হওয়াই স্বাভাবিক।

কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির আবশ্যকতা

দলীয় সরকারের পরিচালনায় নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হয় না বলেই ১৯৯০ সালে সকল উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল কেয়ারটেকার সরকারের পক্ষে একমত হয়ে আন্দোলন করে।

১৯৯১ সালে কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন হওয়ায় বিএনপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়। বিএনপি সরকার দলীয় স্বার্থেই ঐ পদ্ধতিকে আইনে পরিণত করতে অস্বীকার করে।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার যদি দলীয় স্বার্থে ঐ পদ্ধতি বাতিল করতে অপপ্রয়াস চালায় তাহলে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন অনিবার্য।

২০০৯-এর ২২ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত উপজেলা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকায় ঐ নির্বাচন নিরপেক্ষ ও অবাধ হয়নি বলে ইলেকশন কমিশনই ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। তাই নিরপেক্ষ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্দলীয় অরাজনৈতিক সরকার অত্যাবশ্যক। কোনো কোনো দল কেয়ারটেকার পদ্ধতির বিরোধিতা করলেও ১৯৯৬-২০০১-এর আওয়ামী শাসনামলে এবং ২০০১-২০০৬-এর বিএনপি শাসনামলে এ প্রধান দুটো দল এর বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করেনি।

কেয়ারটেকার পদ্ধতির বিরুদ্ধে আপত্তি কী?

কেয়ারটেকার পদ্ধতির সরকার সম্পর্কে যারা আপত্তি করেন তাদের একমাত্র যুক্তি এটাই যে, এ দ্বারা রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি অনাস্থা প্রকাশ পায়। এ যুক্তিটি সঠিক। রাজনৈতিক দলীয় সরকারের পরিচালনায় এ দেশে কোনো সময়ই নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি বলেই তো ১৯৯০ সালে সকল রাজনৈতিক দল কেয়ারটেকার সরকারের পক্ষে ঐকমত্যে পৌঁছেছিল। এ পর্যন্ত সকল নির্বাচিত সরকারই প্রধান দুটো দলের হাতে এসেছে। এ দল দুটো একে অপরের উপর আস্থা স্থাপন করেনি বলেই তো কেয়ারটেকার পদ্ধতির প্রচলন হয়েছে।

এ পদ্ধতির মধ্যে কোনো ত্রুটি প্রমাণিত হয়নি

কেয়ারটেকার সরকার পরিচালিত তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর কোনোটিই নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হয়নি। এর মধ্যে সবচেয়ে সফল নির্বাচন ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত হয়। তখন সরকারপ্রধান ছিলেন কর্মরত প্রধান বিচারপতি, যিনি

নির্বাচনের পর স্বীয় পদে ফিরে যান। ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের নির্বাচনে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সরকারপ্রধান হন।

২০০৭ সালের নির্বাচন বানচাল হওয়ার জন্য কেয়ারটেকার পদ্ধতি দায়ী নয়। আওয়ামী লীগ সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করার কারণেই সমস্যার সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রপতির যোগ্যতা ও বলিষ্ঠতার অভাবে সমস্যার সঠিক সমাধান হয়নি বলেই নির্বাচন বানচাল হয়ে গেল। তাছাড়া দেশি ও বিদেশি ষড়যন্ত্র ঐ নির্বাচন হতে দিল না। শেখ হাসিনার লগি-বৈঠার আন্দোলনই এর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সরকার কি কেয়ারটেকার সরকার ছিল?

নিরীহ প্রফেসর ও অসহায় প্রেসিডেন্ট ড. ইয়াজুদ্দীন আহমদকে যারা জরুরি অবস্থা জারি করতে বাধ্য করেছিলেন, তারাই ড. ফখরুদ্দীন আহমদকে সরকারপ্রধান নিয়োগ করেছেন এবং প্রেসিডেন্টকে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়েছেন। যদি প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা থাকত তাহলে তিনি শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সর্বশেষ প্রধান বিচারপতিকেই প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ দিতেন এবং তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য সকল উপদেষ্টা নিয়োগ করা হতো। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সে সরকার ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করত।

যেহেতু শাসনতন্ত্র বহাল ছিল এবং ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সরকারের জন্য শাসনতন্ত্রে কোনো বিধান ছিল না, সেহেতু এ সরকারকেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ সরকার শাসনতন্ত্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দু বছর ক্ষমতা দখল করে স্বেচ্ছাচার চালিয়েছে এবং তাদের সকল অবৈধ কার্যাবলিকে বৈধতা দেওয়ার যোগ্য রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতাসীন করার সুব্যবস্থা করেছে।

যেহেতু দেশের সশস্ত্র বাহিনী ড. ফখরুদ্দীন সরকারের সমর্থক, সেহেতু সরকারের পরিচালিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অসহায় জনগণ মেনে নিয়েছে। যেসব রাজনৈতিক দল ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে, তারাও নির্বাচনী ফলাফলকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে, যাতে গণতান্ত্রিক ধারা চালু হয়। এ নির্বাচিত সরকার জনগণের জন্য কতটুকু কল্যাণকর হয়েছে তা যথাসময়েই সবাই দেখতে পাবে। এ সরকার যদি জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে তাহলে কোনো সমস্যা হবে না। এর ব্যতিক্রম হলে কী হবে তা ভবিষ্যৎই বলে দেবে।

জাতীয় নির্বাচন ও উপজেলা নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

জাতীয় নির্বাচনের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন সরকার থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনোভাব নিয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন বলে মনে হয়নি। সরকার যা চেয়েছে, নির্বাচন কমিশন তা-ই বাস্তবায়িত করেছে। রাজনৈতিক দলগুলো সম্পর্কে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ছিল না। নির্বাচনী ফলাফল উভয়ের জন্যই সমভাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

কিন্তু উপজেলা নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের চেষ্টা করেছে। তাই সরকারি দলের মন্ত্রী, এমপি ও নেতৃবৃন্দের ভূমিকায় নির্বাচন কমিশন ক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদী। উপজেলা নির্বাচন যে সুষ্ঠু ও অবাধ হয়নি তা নির্বাচন কমিশন উপলব্ধি করেছে।

নবম জাতীয় সংসদে প্রেসিডেন্টের ভাষণ

২০০৯ সালের ২৫ জানুয়ারি নবম জাতীয় সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শাসনতন্ত্রের দাবি পূরণের প্রয়োজনেই প্রেসিডেন্টকে উদ্বোধনী ভাষণ দিতে হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকে জানা গেল যে, এ ভাষণ পূর্বে শেখ হাসিনার কেবিনেটে অনুমোদন করতে হয়েছে।

সংসদীয় সরকার পদ্ধতির মডেল হলো গ্রেট ব্রিটেন। সেখানেও রাষ্ট্রপ্রধান পার্লামেন্টে ভাষণ দেন। কিন্তু সে ভাষণে কেবিনেটের অনুমোদন নেওয়া হয় না। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নিজস্ব বক্তব্য স্বাধীনভাবে পার্লামেন্টে পেশ করা হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের দেশে রাষ্ট্রপ্রধানের নিজস্ব মর্যাদা নেই। সরকারের মরজি মোতাবেকই তাঁকে ভাষণ দিতে হয়।

রাষ্ট্রপ্রধানকে শাসনতন্ত্রের অভিভাবক হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার মতো মর্যাদার আসন না হলে রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও সরকারের উপর সামান্য প্রভাব খাটানোও সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট জাতীয় সংসদের সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত। সরকারি দলের মনোনীত ব্যক্তিই প্রেসিডেন্ট হতে পারেন। অর্থাৎ প্রেসিডেন্টকে প্রধানমন্ত্রীর আস্থাভাজন হতে হবে। যতদিন এ আস্থা বহাল রাখতে সক্ষম হবেন ততদিনই তিনি প্রেসিডেন্ট থাকতে পারবেন। এমন মর্যাদা যার, তিনি সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার যোগ্যও হতে পারেন না। বড় জোর অনুরোধ করতে পারেন।

বিশ্বের সংসদীয় দেশে রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা

বিশ্বে সংসদীয় সরকার পদ্ধতির আদর্শ হিসেবে ব্রিটেনকে গণ্য করা হয়। সেখানে রাষ্ট্রপ্রধান ব্রিটিশ ক্রাউনের অধিকারী। তিনি নির্বাচিত নন। অতীতকালের রাজা বা রানীর ঐতিহ্য অনুযায়ী তাদের রাজবংশ থেকেই রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে থাকে। দলনিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের দীর্ঘ ঐতিহ্য গড়ে ওঠায় কোনো সমস্যা হয় না। পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনের অধিকারী দলকেই ব্রিটিশ ক্রাউন সরকার গঠনের আহ্বান জানায়। তিনি কোনো সময় সরকারি ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করেন না। তাই সরকারের সাথে রাষ্ট্রপ্রধানের কোনো সংঘর্ষ হয় না।

বাংলাদেশে এ ধরনের কোনো ক্রাউন সৃষ্টি করার উপায় নেই বলে এ ব্যাপারে ব্রিটেন আমাদের মডেল হতে পারে না।

ভারত ও পাকিস্তানে ফেডারেল সরকার পদ্ধতি রয়েছে। সরকারি ক্ষমতা কেন্দ্র ও প্রদেশে বিভক্ত। পার্লামেন্ট জনগণের ভোটে নির্বাচিত। প্রদেশেও আইনসভা জনগণের ভোটেই নির্বাচিত। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে থাকে। সকল প্রাদেশিক সরকার ঐ দলের হাতে নাও থাকতে পারে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক আইনসভাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক সরকারকে যে ক্ষমতা দিয়েছে সেখানে প্রদেশ কেন্দ্রের অধীন নয়।

ভারত ও পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যগণের ভোটে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হয়। তাই এ রাষ্ট্রপ্রধান কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন নয়। প্রধানমন্ত্রীর অনুগ্রহভাজনও নয়। প্রধানমন্ত্রী তাকে অপসারণের ক্ষমতা রাখে না। রাষ্ট্রপ্রধান শাসনতন্ত্রে দেওয়া ক্ষমতা প্রয়োগ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে স্বাধীন।

এ পদ্ধতি বাংলাদেশে প্রয়োগ করতে হলে, দেশকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করে ফেডারেল সরকারব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। যদি প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ এ পদ্ধতি চালু করতে একমত হয়, তাহলে এ নিয়মেই রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হতে পারে।

ব্রিটিশ কমনওয়েলথ দেশসমূহের মধ্যে কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া রাষ্ট্রপ্রধান মনোনয়নের ভিন্ন পন্থা গ্রহণ করেছে। এ দুটো দেশে ব্রিটিশ ক্রাউন রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগ করেন। রাষ্ট্রপ্রধানকে গভর্নর জেনারেল বলা হয়। অবশ্য সরকার যাকে গভর্নর জেনারেল হিসেবে ব্রিটিশ ক্রাউনের নিকট সুপারিশ করে তাকেই নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু নিয়োজিত হওয়ার পর গভর্নর জেনারেলকে সরকার অপসারণ করতে পারে না।

এ পদ্ধতি বাংলাদেশের জন্য উপযোগী হিসেবে জনগণ গ্রহণ করবে না বলে আমার ধারণা। বাংলাদেশের জনগণ ১৯৭৮ ও ১৯৮২ সালে দুবার সরাসরি রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের সুযোগ পাওয়ার পর এখন ব্রিটিশ ক্রাউনের নিযুক্ত রাষ্ট্রপ্রধান গ্রহণ করতে সম্মত হতে পারে না।

রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশের উপযোগী পদ্ধতি

বর্তমানে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের যে পদ্ধতি রয়েছে, তাতে প্রেসিডেন্ট সরকারি দলের করুণার পাত্র। সরকারের মরজির অনুগত হয়ে থাকা ছাড়া তার কোনো মর্যাদা নেই। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রপ্রধান যেসব নিয়মে হয়, তা মোটেই বাংলাদেশের উপযোগী নয় বলে উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

আমার ধারণা যে, জনগণের সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হলে তার একটা সম্মানজনক মর্যাদা হবে। তিনি সরকারের আজ্ঞাবহ হতে বাধ্য হবেন না। জনগণের

প্রতিনিধির মর্যাদা নিয়ে তিনি শাসনতন্ত্রের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবেন। শাসনক্ষমতা অবশ্যই জাতীয় সংসদের হাতে থাকবে। শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতা এ পরিমাণ ন্যস্ত রাখা যেতে পারে, যাতে সরকারি ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করতে না পারে। সরকারকে রাষ্ট্রের মুরব্বি হিসেবে তিনি পরামর্শ বা উপদেশ দিতে পারেন, যা গ্রহণ করা সরকারের ওপর বাধ্যতামূলক নয়। রাষ্ট্রপ্রধানের নৈতিক প্রভাবের কারণে তাঁর পরামর্শ বিবেচ্য হবে।

এ পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আপত্তি করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যে বিরাট ব্যয় হবে, তা মর্যাদাবান রাষ্ট্রপ্রধান অর্জনের তুলনায় নগণ্য।

অল্প খরচেও এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সাথেই এ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে পৃথক দুটো ব্যালট বাক্স রাখা হলে প্রত্যেক ভোটার দুটো ব্যালট দুই বাক্সে ফেললে কোনো জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে না।

দুনিয়ার কোথাও সংসদীয় গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয় না। বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে উদাহরণ স্থাপন করতে পারে।

বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তাতে তার পক্ষে স্বৈরশাসকে পরিণত হওয়া সম্ভব। যাতে এমনটা না হতে পারে সে যুক্তিতেই রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে কিছু ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। প্রেসিডেন্ট জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হলেই এ ব্যবস্থা কায়েম হতে পারে।

দক্ষিণ এশীয় সন্ত্রাসবিরোধী টাস্কফোর্স

২০০৫ সালে বাংলাদেশে এক দিনে প্রায় সব জেলায় বোমা হামলা হওয়ার পর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে তা দমন করার পর এ জাতীয় কোনো ঘটনা এ পর্যন্ত আর ঘটেনি। আরো অনেক জঙ্গি ধরা পড়েছে এবং তা অব্যাহত আছে। অভ্যন্তরীণ বাহিনী যদি জঙ্গি দমনে ব্যর্থ হতো তাহলে বিদেশি শক্তির সহযোগিতা চাওয়ার প্রয়োজন হতো।

নির্বাচিত জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলছে। এ বিষয়ে প্রয়োজন হলে আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ২৮ জানুয়ারি (২০০৯) সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে ঘোষণা দিলেন যে, 'সাউথ এশিয়ান এন্টিটেররিস্ট টাস্কফোর্স' গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছি। এ সময় বিরোধী দল সংসদে অনুপস্থিত ছিল। সরকারি দলের কোনো সদস্য প্রধানমন্ত্রীর কথায় আপত্তি তোলার তো প্রশ্নই আসে না।

এক ব্যক্তির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এত বড় একটা কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে, যার পরিণাম দেশের জন্য মারাত্মক হতে বাধ্য।

এ জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন আমেরিকার কর্মসূচি। ভারত– তা অবশ্যই এর সমর্থক। প্রধানমন্ত্রী দেশের ভাগ্য নির্ধারক। এ বিষয়টি সংসদে আলোচনা করার সুযোগ না দিয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন কেমন করে? সরকারি দলের সদস্যরা এ বিষয়ে চুপ করে রইলেন কেমন করে? ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি এভাবেই দলীয় সদস্যরা বিনা আপত্তিতে বাকশাল ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলেন।

দক্ষিণ এশীয় টাস্কফোর্স মানে কয়েকটি দেশের নিরাপত্তা সংস্থার মিলিত বাহিনী, যারা বাংলাদেশে সন্ত্রাস দমনে নিয়োজিত হবে। বিদেশি সৈনিক বা পুলিশকে বাংলাদেশে কর্মরত থাকার ব্যাপারটি কি এমন সামান্য বিষয়, যার ফায়সালা প্রধানমন্ত্রী একাই নিতে পারেন?

এ দেশের জনগণ কি ভারতীয় বাহিনীকে সন্ত্রাস দমনের সুযোগ দিতে সম্মত হতে পারে? ভারতীয় সীমান্ত বাহিনী প্রায়ই সীমান্তের ভেতর অনধিকার প্রবেশ করে এবং বাংলাদেশিদের হত্যা করে। তাদের যদি দেশের ভেতরে অপারেশনের সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের সার্বভৌম মর্যাদার বিরোধী এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিরোধী দল নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করবে।

৩৫৯.

আমীরে জামায়াতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির ইস্যু

প্রতি তিন বছর পর আমীরে জামায়াতের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৮ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত মেয়াদের জন্য আমি নির্বাচিত হই। সে হিসেবে ২০০১ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত মেয়াদের জন্য নির্বাচন ২০০০ সালের শেষ দিকেই অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। জামায়াতের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচনের পূর্বে মজলিসে শূরা তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি প্যানেল নির্বাচন করে দেয়। রুকনগণ এ তিনের যেকোনো একজন বা এর বাইরেও যেকোনো রুকনকে আমীরে জামায়াত হিসেবে নির্বাচিত করার উদ্দেশ্যে ভোট দিতে পারেন। জামায়াতের ঐতিহ্য অনুযায়ী মেয়াদকাল শুরু হওয়ার আগেই মজলিসে শূরার মধ্যবার্ষিক অধিবেশনে প্যানেল নির্বাচন করা হয়। সে হিসেবে ২০০০ সালের মধ্যবার্ষিক অধিবেশনেই প্যানেল তৈরি হওয়ার কথা।

২০০০ সালের ৭ ও ৮ জুলাই মধ্যবার্ষিক অধিবেশন বসে। ৮ জুলাই এজেন্ডা অনুযায়ী প্যানেল নির্বাচন হওয়ার কথা। প্রধান নির্বাচন পরিচালক অধ্যাপক একেএম

নাজির আহমদ প্যানেল নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপার নিয়ে হাজির হন এবং তা সদস্যগণের মধ্যে বিলি করার ব্যবস্থা করেন।

এ পর্যায়ে আমি মজলিসে শূরার নিকট আবেদন জানাই যে, প্যানেলে যেন আমার নাম রাখা না হয়– অর্থাৎ প্যানেল নির্বাচনে আমাকে যেন কেউ ভোট না দেন।

আমার অব্যাহতি চিন্তা

মজলিসে শূরার সদস্যগণের হাবভাব থেকে আমি অনুভব করলাম যে, আমার এ আবেদন তাদের নিকট অপ্রত্যাশিত ও অনভিপ্রেত। তাই আমার আবেদন মঞ্জুর করার জন্য কিছু বক্তব্য রাখা প্রয়োজনবোধ করলাম। এ উদ্দেশ্যে বললাম–

১. মাওলানা মওদূদী (র) ১৯৭২ সালে ৬৯ বছর বয়সে অব্যাহতি নিয়েছেন। আমার বয়স বর্তমানে ৭৮ বছর। বার্ধক্যের কারণেই আমার এ বিরাট দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করার প্রয়োজনবোধ করছি।

২. সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রধানকে সারা দেশে নির্বাচনী অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আমাকে মাত্র ৪০ দিনে সারা দেশে ঝটিকা অভিযানে যে অসাধ্য সাধন করতে হয়েছে, তা আগামীতে কিছুতেই সম্ভব নয়। আগামী ২০০১ সালেই জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ বয়সে আমি নির্বাচনী অভিযানের ধকল সহ্য করার সাহস পাচ্ছি না।

৩. আমীরে জামায়াতের সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব এত ব্যাপক যে, এ দায়িত্ব পালনকালে লেখা-পড়ার জন্য সময় পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। আমি অনেক দিন থেকেই ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজনে কিছু লেখা অত্যাবশ্যক বিবেচনা করছি। আমি এ দায়িত্ব থেকে মুক্তি না পেলে এ উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে না।

তাই আমি আশা করি, মজলিসে শূরার সম্মানিত সদস্যগণ আমার আবেদন মঞ্জুর করবেন।

ব্যালট বিতরণ ও ফলাফল ঘোষণা

বিকালের বৈঠকে প্রধান নির্বাচন পরিচালক নির্বাচিত প্যানেল ঘোষণা করেন। দেখা গেল, প্যানেলে এক নম্বরে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, দুই নম্বরে আমার নাম এবং তিন নম্বরে মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ। আমি যদি অব্যাহতি না চাইতাম তাহলে নিঃসন্দেহে আমার নাম এক নম্বরেই আসত। এতে প্রমাণিত হলো যে, মজলিসে শূরার কিছুসংখ্যক সদস্য আমাকে অব্যাহতি দিতে সম্মত নন।

প্যানেলের এ ফলাফলে আমি বিব্রতবোধ করলাম। মজলিসে শূরাও অস্বস্তিবোধ করল। এ বিষয়ে বেশ কিছু সময় ১৩ জন সদস্যের আলোচনার পর সর্বসম্মতভাবে এ প্যানেল বাতিল করা হয়। এ বিষয়ে মজলিসে শূরা বর্তমান অধিবেশনে সিদ্ধান্ত

না নিয়ে কর্মপরিষদকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, যাতে আরেকটি অধিবেশনে এ বিষয়ে প্রস্তাব পেশ করে।

কর্মপরিষদ বৈঠক

২০০০ সালের ২০ অক্টোবর কর্মপরিষদের বৈঠক হয়। জামায়াতের ঐতিহ্য অনুযায়ী মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময়েই নবনির্বাচিত আমীর ও মজলিসে শূরার সদস্যগণ শপথ গ্রহণ করেন। তাই এর পূর্বেই নির্বাচন সম্পন্ন হতে হয়। মজলিসে শূরার মধ্যবার্ষিক অধিবেশনে প্যানেল গঠন করা সম্ভব হয়নি। তাই কর্মপরিষদ বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন হয়।

মজলিসে শূরার অধিবেশনের পূর্বে ৫০ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের এ বৈঠকে আমার অব্যাহতি পাওয়া সম্পর্কে আলোচনা হয়। সেখানে আমি আমার দীর্ঘ দিনের সহকর্মী ও জামায়াতের সিনিয়রগণের নিকট আমার অব্যাহতির পক্ষে সম্মতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করি। একজন সদস্য অপ্রত্যাশিতভাবে প্রশ্ন করেন যে, আপনি কি আপনার প্রতি জামায়াতের আস্থা যাচাই করার উদ্দেশ্যে অব্যাহতি চাচ্ছেন, না সিরিয়াস হয়েই দাবি জানাচ্ছেন? আমি যেসব কারণে অব্যাহতি চাচ্ছি তা উল্লেখ করে বললাম, আমি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে অব্যাহতি চাচ্ছি। কর্মপরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে আমার আবেদন মঞ্জুর করে এবং প্রস্তাব আকারে তা গ্রহণ করে, যাতে মজলিসে শূরার অধিবেশনে পেশ করা যায়।

মজলিসে শূরার জরুরি অধিবেশন

২০০০ সালের ২১ অক্টোবর আমীরে জামায়াত নির্বাচনের প্যানেল গঠনের উদ্দেশ্যে মজলিসে শূরার জরুরি অধিবেশন ডাকা হয়। উক্ত অধিবেশনে আমি উদ্বোধনী বক্তব্যের শেষে বললাম, মজলিসে শূরার বিগত অধিবেশনে জামায়াতের ইমারতের দায়িত্ব থেকে আমার অব্যাহতির ব্যাপারে কর্মপরিষদকে বিষয়টি সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কর্মপরিষদ সে দায়িত্ব পালন করে আমার অব্যাহতি অনুমোদন করে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইখতিয়ার মজলিসে শূরার। অতঃপর আমি মজলিসে শূরার নিকট ফরমালি অব্যাহতির জন্য আবেদন জানালাম। মজলিসে শূরা আর কোনো আলোচনা ছাড়াই সর্বসম্মতিক্রমে সম্মতি দান করে।

প্রধান নির্বাচন পরিচালক অধ্যাপক একেএম নাজির আহমদ মজলিসে শূরা সদস্যগণের নিকট প্যানেলের জন্য ব্যালট পেপার বিতরণ করেন এবং বিকালের বৈঠকে ফলাফল ঘোষণা করবেন বলে জানালেন।

আসরের নামাযের পর বৈকালিক বৈঠক শুরু হলে প্রধান নির্বাচন পরিচালক প্যানেলের তিন জনের নাম ঘোষণা করেন। এক নম্বরে মাওলানা মতিউর রহমান

নিজামী, দুই মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ ও তিন নম্বরে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী।

অধিবেশনে বিদায়ী ভাষণে অন্যান্য জরুরি বক্তব্য পেশ করার পর আমার আবেদন মঞ্জুর করায় মজলিসে শূরার সদস্যগণের প্রতি শুকরিয়া আদায় করে সকলকে আশ্বাস দিলাম যে, জামায়াতের একজন রুকন হিসেবে আমি দীনের দায়িত্ব পালন করতে থাকব। কারণ, আমি আখিরাতে নাজাতের জন্য এ আন্দোলনকেই আসল পাথেয় বলে বিশ্বাস করি।

আমীরে জামায়াত নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ

২০০০ সালের নভেম্বরেই আমীরে জামায়াতের নির্বাচন সম্পন্ন হয়। নভেম্বরের শেষ দিকে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয় যে, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী তিন বছরের জন্য জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর আমীর নির্বাচিত হলেন।

এ খবর জামায়াতের জনশক্তির নিকট অত্যন্ত স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। কোনো রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব নির্বাচনের মাধ্যমে পরিবর্তন হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ নিয়ে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কোনো মাথাব্যথা থাকার কথা নয়। পত্র-পত্রিকায় এর কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিরও তেমন কোনো কারণ নেই। কিন্তু জামায়াতবিরোধী ও ধর্মনিরপেক্ষতার পতাকাবাহী পত্রিকায় আজব ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। জামায়াতবিদ্বেষী কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতাও বিবৃতি দিতে থাকলেন। আমাকে নিয়ে প্রচুর লেখালেখি চলল। তাদের আলোচনার সারকথা নিম্নরূপ :

গোলাম আযমকে জামায়াতের নেতৃত্ব থেকে অপসারিত করা হয়েছে। তিনি দলের আস্থা হারিয়েছেন। তার নেতৃত্বে জামায়াতের ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে বলেই তিনি প্রত্যাখ্যাত। এসব অপপ্রচারের প্রতিবাদে জামায়াতের পক্ষ থেকে বারবার বিবৃতি দেওয়া সত্ত্বেও এ অপপ্রচার চলতে থাকে।

এ দেশে কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে না। নেতৃত্বের কোন্দলে এক নামে একাধিক দল চালু হয়। এ অবস্থায় জামায়াতের আমীর হিসেবে বহু বছর দায়িত্ব পালনের পর আমি স্বেচ্ছায় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছি। এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ রকম কোনো নজির না থাকায় আমার ভাবমর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে, এ আশঙ্কায়ই অপপ্রচার চালিয়ে বিদ্বেষীরা সান্ত্বনাবোধ করতে চেয়েছে।

মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন

২০০০ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে তিন দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এর পূর্বেই যথাসময়ে আমীরে জামায়াত নির্বাচন সম্পন্ন হয় এবং বার্ষিক অধিবেশনের প্রথম বৈঠকেই মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী নির্বাচিত আমীর হিসেবে পরবর্তী তিন বছরের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

৭ ডিসেম্বর বিকাল তিনটায় প্রধান নির্বাচন পরিচালক অধ্যাপক একেএম নাজির আহমদ নবনির্বাচিত আমীরে জামায়াতকে শপথবাক্য পাঠ করান এবং বিদায়ী আমীর হিসেবে আমি অত্যন্ত আবেগঘন পরিবেশে নতুন আমীরের সাফল্য কামনা করে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করে দু'আ পরিচালনা করি।

দায়িত্ব গ্রহণ উপলক্ষে নবনির্বাচিত আমীরের ভাষণ

নবনির্বাচিত আমীর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ উপলক্ষে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন। এখানে শুধু ঐ অংশটুকু উদ্ধৃত করছি, যা তিনি আমার সম্পর্কে বলেছেন। মজলিসে শূরার কার্যববিরণী থেকে উদ্ধৃত :

> 'অধ্যাপক গোলাম আযম সকলের নেতা হয়েই থাকবেন। যে মহান কাজ আঞ্জাম দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি ইমারতের দায়িত্ব থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নিলেন, আল্লাহ যেন তাঁকে সে দায়িত্ব পালনের তাওফীক দান করেন।'

> 'ছাত্র সংগঠনের প্রধান হিসেবে, ঢাকা মহানগর আমীর হিসেবে ও সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে বিদায়ী আমীরের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও পরামর্শ নিয়ে কাজ করেছি। আজ তাঁর বিদায়ে মনে হচ্ছে, যেন বিরাট মহীরুহের ছায়া থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছি।'

> 'অধ্যাপক গোলাম আযম কোনো ব্যক্তি নন, তিনি একটি প্রতিষ্ঠান। পদ-পদবি ছাড়াই তিনি নেতা হিসেবে থাকবেন।'

> 'জামায়াতের আভ্যন্তরীণ নির্বাচন এর নিজস্ব ব্যাপার হলেও এর খবর নিয়ে পত্র-পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। এতে জনগণের মাঝে জামায়াত সম্পর্কে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। দায়িত্ব থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নিয়ে অধ্যাপক গোলাম আযম যে অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন, একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকা একে কেন্দ্র করেও পানি ঘোলা করার প্রয়াস পেয়েছে।'

বিদায়ী আমীর হিসেবে মজলিসে শূরার অধিবেশনে আমার বক্তব্য

> 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আওয়ামী লীগ সরকার ও দেশের সকল ইসলামবিরোধী শক্তি জামায়াতে ইসলামীকেই তাদের আক্রমণের টার্গেট বানিয়েছে। এর দ্বারা তারা জামায়াতে ইসলামীকেই প্রধান ইসলামী শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।'

> 'জামায়াতের দীর্ঘ ঐতিহ্য অনুযায়ী বিশ্বস্বীকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে রুকনগণ তাদের আমীর নির্বাচিত করেছেন। একজন রুকন হিসেবে আমি নির্বাচিত আমীরের আনুগত্য করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি।'

'বিদায়ী আমীরের অব্যাহতি নিয়ে পত্র-পত্রিকায় ব্যাপক চর্চা হওয়ায় এবারই প্রথম আমীরে জামায়াত নির্বাচনপদ্ধতি সম্পর্কে সকল মহল সঠিক ধারণা লাভ করেছে। একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, জামায়াতে উত্তরাধিকার সূত্রে নেতৃত্বের কোনো অবকাশ নেই। নেতৃত্বের জন্য প্রার্থিতা নেই বলে এখানে নেতৃত্ব নিয়ে প্রতিযোগিতা ও কোন্দলের কোনো সুযোগ নেই। এতে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, জামায়াতের সর্বোচ্চ পদটি কর্মপরিষদ বা মজলিসে শূরার কোনো ক্ষুদ্র অংশের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে না; বরং হাজার হাজার রুকন জামায়াতের গঠনতন্ত্রে বর্ণিত আমীরের গুণাবলি বিবেচনা করে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ভোটদানের মাধ্যমে তাদের আমীর নির্বাচন করে থাকেন।'

পত্র-পত্রিকায় আমার সাক্ষাৎকার

জামায়াতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর সর্বপ্রথম বিবিসি আমার সাক্ষাৎকার প্রচার করে। অনেক পত্রিকাকে আমি সাক্ষাৎকার দিয়েছি। 'মিডিয়ার মুখোমুখি' নামে সেসব সাক্ষাৎকারের ৯৫ পৃষ্ঠার একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক মানবজমিন, দৈনিক ইনকিলাব ও সাপ্তাহিক পূর্ণিমা এসব সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে।

দৈনিক ইনকিলাব যে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার ৫ কিস্তিতে প্রকাশ করেছে, তা 'দৈনিক ইনকিলাবের সাথে অধ্যাপক গোলাম আযমের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার' শিরোনামে পৃথকভাবে ৩২ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

সাক্ষাৎকারে একটি কমন প্রশ্ন

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীরা বহু ধরনের প্রশ্ন করেছেন। একটি প্রশ্নের ব্যাপারে তাদের বিশেষ আগ্রহ লক্ষ করেছি। সে প্রশ্নটি হলো, দায়িত্বমুক্ত হওয়ার পর কেমন বোধ করছেন? এ প্রশ্নের কয়েক রকম জবাব দিয়েছি।

১. যদি একজন মানুষ সারাজীবন চেষ্টা-সাধনা করে একটা বিরাট শিল্পসংস্থা গড়ে তোলে, তার সন্তানদেরকে এ সংস্থাটি পরিচালনার যোগ্য বানায় এবং বার্ধক্যের এক পর্যায়ে সংস্থার দায়িত্ব সন্তানদের হাতে তুলে দিয়ে অবসর গ্রহণ করে তাহলে ঐ লোক কেমন বোধ করবে?

২. জামায়াতে ইসলামীতে সংগঠনের নেতৃত্বে যাতে জেনারেশন গ্যাপ না হয়, সেজন্য পরিকল্পিতভাবেই যোগ্যতাসম্পন্ন ও নিষ্ঠাবান লোকদেরকে চেইন অব লিডারশিপে রাখা হয়। দায়িত্বশীলদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে নয়, সংগঠনের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েই লোক বাছাই করা হয়। তাই আমি নিশ্চিতবোধ করেই অব্যাহতি চেয়েছি যে, ইনশাআল্লাহ নতুন নেতৃত্বে জামায়াত ঐতিহ্য অনুযায়ী চলবে। তাই আমি অত্যন্ত স্বস্তিবোধ করছি।

৩. লেখালেখির যে কাজগুলো আমীরের দায়িত্ব পালনকালে সম্ভব হয়নি সে কাজ করার অবকাশ পেয়ে অত্যন্ত তৃপ্তিবোধ করছি। আমি যাকিছু লিখতে চাই তা হয়তো আর কেউ করবে না। এ কাজগুলো করতে পারলে দীনের স্থায়ী খিদমত হবে বলে আশা রাখি। মৃত্যুর পরও তা সদকায়ে জারিয়াহ্ হিসেবে গণ্য হতে পারে।

আমীরের দায়িত্ব আমি পালন না করলেও অন্য কেউ পালন করতে পারবে। হয়তো আমার চেয়েও ভালোভাবে পারবে; কিন্তু আমি না লিখলে এ লেখাগুলো তো লেখা হবে না।

৪. আমার পর জামায়াত কেমন উন্নতি করছে তা দেখার সুযোগ পাওয়ার আশায় সন্তোষবোধ করছি।

যে কারণে অব্যাহতি পাওয়া জরুরি ছিল

১. প্রথমত, ৭৮ বছর বয়সে ঐ গুরুদায়িত্ব পালন করা আমার জন্য বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। ১৯৯৫ সাল থেকেই আমি সায়েটিকা রোগাক্রান্ত হওয়ায় সফর করা বেশ কঠিন মনে হয়েছে।

২. দ্বিতীয়ত, অল্প শিক্ষিতদের নিকট কুরআনের আলো পৌছানোর উদ্দেশ্যে অত্যন্ত সহজ বাংলায় এর অনুবাদ করা অত্যাবশ্যক বিবেচনা করে দায়িত্বে থাকাকালে ই'তিকাফে ১০ বছরে শেষ পাঁচ পারার অনুবাদ সম্পন্ন করেছি। ১৯৮৩ সালে আমপারা প্রকাশিত হয়। এর পাঠকপ্রিয়তা আমাকে আরো অনুবাদ করার জন্য প্রেরণা জোগায়।

আমি কুরআনের সরাসরি অনুবাদক নই। মাওলানা মওদূদী (র) রচিত তরজমায়ে কুরআন মজীদের অনুবাদ ও শেষ পাঁচ পারার অনুবাদের সাথে প্রতিটি সূরার তাফহীমুল কুরআনের সার-সংক্ষেপ রচনা করেছি। কুরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ২০০৩ সালে সমাপ্ত হয়েছে। এ কাজটিই আমার অব্যাহতি নেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের অধিকাংশই অল্পশিক্ষিত। তারা কুরআনকে সঠিকভাবে বুঝতে না পারলে আন্দোলনে অগ্রসর হতে সক্ষম হবে না। তাই এ কাজটি সম্পন্ন করতে পারায় আমার অব্যাহতি পাওয়া সার্থক হয়েছে। এ কাজটি করার জন্য আমাকে যেন সময় ও সুযোগ দেওয়া হয় সেজন্য আল্লাহ্ তাআলার নিকট অব্যাহতভাবে ধরনা দিয়েছি।

'সহজ বাংলায় আল কুরআনের অনুবাদ' শিরোনামে তিন খণ্ডে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম প্রকাশ- জুন ২০০৬; আর নভেম্বর ২০০৮-এর মধ্যেই ষষ্ঠ মুদ্রণ সম্ভব হয়েছে। (আলহামদুলিল্লাহ!) পাঠকপ্রিয়তা দেখে পরিশ্রম সার্থকবোধ করছি।'

আরো যা লেখা হয়েছে

জামায়াতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর আল্লাহ তাআলা আমাকে এ পর্যন্ত ৯ বছর হায়াতে রেখেছেন এবং দীনের কিছু খিদমতের তাওফীক দিয়েছেন বলে আরো অনেক বই লেখার সুযোগ পেলাম। অব্যাহতি নেওয়ার পূর্বে এত কিছু লেখার পরিকল্পনা ছিল না।

পরিকল্পনা না থাকলেও দায়িত্বে থাকাকালেই চিন্তা করতাম :

১. অনেক বই পড়ে অল্পশিক্ষিত লোকের পক্ষে ইসলামকে জানা সম্ভব নয়। পরিপূর্ণ ইসলাম সম্পর্কে একটি মাঝারি আকারের বই সহজ বাংলায় হলে কতই না ভালো হতো!

২. ইসলামী আন্দোলনের দীর্ঘ জীবনে ইসলাম সম্পর্কে যে জ্ঞানের আলো পেলাম তা যদি লিখে রেখে যেতে পারতাম তাহলে দীনের বিরাট খেদমত হতো।

আল্লাহর মেহেরবানিতে এ দুটো চিন্তাও বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ১৬ পৃষ্ঠা ও ৩২ পৃষ্ঠা আকারের বই-ই বেশি। চটি বই পেলে অনেকেই হাতে নেয়, পড়তে শুরু করে, ভালো লাগলে পড়ে ফেলে। বড় বই তো হাতে নিতেই অনেকে ভয় পায়। বড় বইয়ের মূল্যও কিনতে বাধা হয়। এ জাতীয় পুস্তিকার সংখ্যা পঞ্চাশেরও বেশি হয়েছে।

দৈনিক সংগ্রামে প্রতি শুক্রবার 'জীবনে যা দেখলাম' শিরোনামে ২০০১ সালের জানুয়ারি থেকে আত্মজীবনীমূলক লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। গ্রন্থাকারে এ পর্যন্ত ৭ম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। গড়ে প্রতি খণ্ডে ৩০০ পৃষ্ঠার বই। ৮ম খণ্ড ২০০৯-এর মার্চের মধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে।

তৃতীয় বেহাই সাহেবের ইন্তিকাল

জনাব মুহাম্মদ রজব আলী সরকারি শিক্ষা বিভাগের একজন সৎ ও যোগ্য উচ্চকর্মকর্তা ছিলেন। ৮৩ বছর বয়সে তিনি ২০০৮ সালের ১২ জানুয়ারি ফজরের নামাযের আযানের সময় হাসপাতালে ইন্তিকাল করেন। ঐ সময় সংগ্রামে লেখা বন্ধ ছিল বিধায় বিলম্বে লিখছি।

আমার তৃতীয় ছেলে আবদুল্লাহিল মোমিন আযামীর সাথে বেহাই সাহেবের একমাত্র কন্যা নুরুন্নাহারের বিয়ে হয়। বিয়ের পূর্বে তাঁর সাথে আমার পরিচয় ছিল না। আত্মীয়তার সম্পর্ক হওয়ার পর থেকেই দীনী ভাই হিসেবে তাঁর সাথে মহব্বতের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। ইসলামী আন্দোলনের একজন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি হিসেবে সব সময় তাঁকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখেছি। তিনি দাওয়াতে দীনের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন।

তাঁর ইন্তিকালে আমি একজন পরম মহব্বতের দীনী ভাইকে হারালাম। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে অত্যন্ত গভীর বেদনাবোধ করেছি। ইন্তিকালের কিছু দিন পূর্বে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ছিলেন। সুস্থ হওয়ার পর বাড়িতে বেশ ভালোই ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে গড়া মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করছিলেন। মৃত্যুর পূর্বদিন জুমুআর নামাজের পর মসজিদ কমিটির আজীবন সভাপতি হিসেবে এমন বক্তব্য রাখলেন, যা বিদায় ভাষণ হয়েই রইল।

জানাযার নামাযে শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে তার নেতৃত্বে নির্মাণাধীন বিশাল মসজিদে প্রথম হাজির হলাম। মিরপুরস্থ রূপনগরের গণ্যমান্য লোকদের বক্তব্য শুনে বুঝতে পারলাম যে, তিনি এলাকার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় মুরব্বির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর ছোট ভাই মাওলানা রিয়াসত আলী (দু'বার নির্বাচিত এমপি) গ্রামের বাড়ি থেকে পৌঁছতে বিলম্ব হওয়ায় আমাকেই জানাযার নামাযে ইমামতি করতে হয়।

তিনটি কারণে তাঁর ব্যাপারে আমি অত্যন্ত সান্ত্বনাবোধ করছি। প্রথমত, তিনি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে 'ইসলামের মৌলিক উপাদান' নামক পুস্তক থেকে জানা যায়। দ্বিতীয়ত, তিনি জীবনে যেখানেই অবস্থান করেছেন সেখানেই মসজিদ, মাদরাসা ও স্কুল স্থাপন করে সদকায়ে জারিয়ার ব্যবস্থা রেখে গেছেন। তৃতীয়ত, তাঁর সন্তানদেরকে আধুনিক উচ্চশিক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে খাঁটি মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন, যা সদকায়ে জারিয়া বলেই হাদীসে গণ্য। তিনি একজন আদর্শ মুসলিম, সফল পিতা, দক্ষ সমাজসেবক, জনপ্রিয় মুরব্বি ও দীনের মুখলিস খাদেম ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল নেক আমল কবুল করে জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিবাসী করুন।

৩৬০.

আমার রচনা পরিচিতি

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর (র) রচিত তাফসীর ও অন্যান্য বিপুল সাহিত্য পড়েই ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও ব্যাপক ধারণা পেলাম। মাওলানা মুহতারামের গোটা সাহিত্যই বাংলায় অনূদিত হয়েছে। তাই ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানদানের জন্য আরো লেখা দরকার নেই বলে এক সময় আমার ধারণা ছিল।

৫৫ বছর ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় থাকাকালে জনগণের মধ্যে ইসলামের জ্ঞান বিতরণ করতে গিয়ে অনুভব করলাম যে, ইসলামের সকল দিক ও বিষয় এমন সহজ বাংলায় পরিবেশন করা প্রয়োজন, যাতে অতি অল্প শিক্ষিত লোকও অনায়াসে দীনের আলো সংগ্রহ করতে পারে।

দীনের বুনিয়াদী শিক্ষা যেভাবে মাওলানা মওদূদীর (র) সাহিত্যে পরিবেশন করা হয়েছে, আমার লেখায় এর পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। বিষয়টিকে ভিন্ন আঙ্গিকে আমি পেশ করেছি। যেমন মাওলানা 'নামাযের হাকীকত' লিখেছেন। আমি 'জীবন্ত নামায' লিখেছি। আলোচ্য বিষয় এক নয়। আমার লেখা মাওলানার লেখার পরিপূরক। মাওলানা 'ঈমানের হাকীকত' লিখেছেন, আমি 'মযবুত ঈমান' লিখেছি।

যারা সংগঠনভুক্ত হয় তাদেরকে সত্যিকার মুসলিম ও মুজাহিদ হিসেবে গড়ে তোলার এমন কর্মসূচি রয়েছে, যাতে মন-মগজ-চরিত্র সমন্বিতভাবে গড়ে ওঠে। মন-মগজ-চরিত্র মানে ঈমান-ইলম-আমলের দিক দিয়ে গড়ে ওঠা। কোন্ কোন্ দিক দিয়ে গড়ে ওঠতে হয় তা চিহ্নিত করার জন্য যে বইটি লিখেছি এর নাম, 'মযবুত ঈমান সহীহ ইলম ও নেক আমল'।

তাফহীমুল কুরআনের আলোকে রচিত

আমার রচিত বইয়ের বিষয়বস্তু অধিকাংশই তাফহীমুল কুরআন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে নিম্নলিখিত বইগুলো ১৯৯২-৯৩ সালে জেলে ১৬ মাস আটক থাকাকালে রচিত :

১. কুরআন বুঝা সহজ– এতে কুরআন অধ্যয়নের কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

২. আদম সৃষ্টির হাকীকত- আদম সৃষ্টির ব্যাপারে ফেরেশতাদের মনে খটকা, আদম সৃষ্টির উদ্দেশ্য, ফেরেশতাদের আদমকে সিজদা করার তাৎপর্য, বেহেশতে শয়তানের আদম-হাওয়াকে ধোঁকা দেওয়া, বেহেশতেই আদম-হাওয়ার তাওবা কবুল হওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণার নিরসন করা হয়েছে।

৩. কুরআন ঘোষিত মুসলিম শাসকদের ৪-দফা কর্মসূচি– সূরা হাজ্জের ৪১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৪. আল্লাহর দুয়ারে ধরনা– কুরআন ও হাদীসের ঐসব দু'আর সংকলন, যা আমি প্র্যাকটিস করি। আন্দোলনের সহকর্মীদের জন্য তা বই আকারে প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করেছি। (পূর্বে বইটির নাম ছিল, 'আল্লাহর দরবারে ধরনা'।

৫. সৎলোকের এত অভাব কেন? এতে দেখানো হয়েছে যে, ইসলাম সৎলোক তৈরি করার কী পদ্ধতি দিয়েছে। ঐ পদ্ধতি ছাড়া আর কোনো পন্থায় তা সম্ভব নয়। সৎলোক এমনি এমনি তৈরি হয় না। যেমন আপনা-আপনি জঙ্গল তৈরি হতে পারে, কিন্তু বাগান তৈরি হতে পারে না।

৬. মুসলিম নেতাদের এ দশা কেন? শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচি নেই, চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা নেই। নামে মুসলিম, ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতাই যে দায়ী তা-ই আলোচনা করা হয়েছে।

৭. খাঁটি মুমিনের সহীহ জযবা– যে ৬টি জযবা মুমিনকে খাঁটি বানায়, এর বিস্তারিত আলোচনা।

৮. মুমিনের জেলখানা– যদি কোনো কারণে মুমিনকে জেলে যেতেই হয়, তাহলে তার করণীয় সম্পর্কে বাস্তব পরামর্শ এবং জেলের শিক্ষা।

৯. মনটাকে কাজ দিন– মন ঘুমায় না, ক্লান্তও হয় না, অবিরাম সক্রিয়। তাকে সচেতনভাবে কাজ না দিলে সে বেকার থাকে না, শয়তান তাকে কাজ দেয়। এ বিষয়ে পরামর্শ।

১০. বিয়ে তালাক ফারায়েয– এসব সম্পর্কে প্রচলিত কু-সংস্কার থেকে সতর্ক থাকার পরামর্শ।

১১. জেলে থাকাকালেই কুরআন মাজীদের প্রথম দশ পারার অনুবাদ সম্পন্ন হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শেষ পাঁচ পারার অনুবাদ ও তাফহীমের সারসংক্ষেপ ১০ বছরে রচনা করা হয়। আশি ও নব্বই দশকে ১০টি ই'তিকাফে তা রচিত হয়। ২০০৩ সালে ১১ থেকে ২৫ পারা অনুবাদ করা সম্ভব হয়। আমি যে গ্রন্থের অনুবাদ করেছি তাতে কুরআনের অনুবাদের সাথে এমন সংক্ষিপ্ত টিকাও রয়েছে, যা না দিলে শুধু অনুবাদ থেকে সঠিক অর্থ বুঝাই যায় না।

দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির পর তাফহীমুল কুরআন থেকে বিষয় সংগ্রহ ও পুস্তক রচনা

তাফহীমুল কুরআন থেকে বিষয় সংগ্রহ করে নিম্নলিখিত কয়েকটি বই রচনা করেছি, যা ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক মনোন্নয়নের জন্য অত্যন্ত কার্যকর হিসেবে বিবেচিত হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

১. আল্লাহর খিলাফত কায়েমের দায়িত্ব ও পদ্ধতি।
খিলাফতের দায়িত্বটা কী? এ দায়িত্ব পালনের যোগ্য লোক তৈরি করার যে পদ্ধতি জামায়াতে ইসলামীতে চালু আছে, এর কুরআনভিত্তিক ব্যাখ্যা বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

২. রাষ্ট্রক্ষমতার উত্থান-পতনে আল্লাহ তাআলার ভূমিকা।
কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, যে তিনিই ক্ষমতায় বসান এবং তিনিই ক্ষমতা থেকে সরান। এর ব্যাখ্যা কী? তিনি কেমন করে এটি করেন তা বইটিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাধারণভাবে তাঁর দেওয়া চিরন্তন নিয়মেই ক্ষমতার উত্থান-পতন হয়ে থাকে। সে নিয়মটিই এতে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু এ নিয়ম ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার কায়েমের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। এ জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন নিয়ম রয়েছে। সে নিয়ম ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা আয়ত্ত করতে পারলে বিজয় অনিবার্য।

৩. নাফস-রূহ্-কালব। এ তিনটি সম্পর্কে ব্যাপক বিভ্রান্তি রয়েছে। অথচ এ বিষয়ে সন্তোষজনক ও সহজে বোধগম্য ধারণা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। এ পুস্তিকাটিতে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে।

৪. খাঁটি মুমিন হতে হলে তাগূতের পাক্কা কাফির হতে হবে।

এ বইটি থেকে তাগূত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। দীনী মহলেও তাগূত সম্বন্ধে কমই চর্চা হয়ে থাকে। অথচ তাগূতকে চিনতে না পারলে এবং তাগূতকে সচেতনভাবে মানতে অস্বীকার করার সিদ্ধান্ত না নিলে পদে পদে ঈমানের দুর্বলতা দেখা যাবে। সত্যিকার ঈমান হাসিল করতে হলে তাগূতের কাফির হতেই হবে। ঈমানদারদের দুর্বলতার মূলেই রয়েছে তাগূতকে সঠিকভাবে না জানা।

৫. তাওহীদ শিরক ও তিন তসবীহ্র হাকীকত।

তাওহীদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে হলে শিরক সম্বন্ধে স্বচ্ছ জ্ঞান লাভ করতে হবে। কারণ শিরক না থাকাই তাওহীদ। শিরক না বুঝলে তাওহীদ বুঝে আসবে না। আল্লাহ্র সাথে অন্য সত্তাকে কোনো দিক দিয়ে শরীক করাকেই শিরক বলে। সাধারণত কোন্ কোন্ দিক দিয়ে শরীক করা হয় তা জানতে পারলেই এ থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব। তাফহীমুল কুরআনে সূরা আন'আমের ১২৮ নং টিকাতে দেখানো হয়েছে যে, চার প্রকারে শিরক করা হয়ে থাকে। এটাই এ বইতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রতি ফরয নামাযের পর সুবহানাল্লাহ, আল হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার-এ তিনটি তাসবীহ অনেকেই নিয়মিত পড়েন; কিন্তু এ তিনটি তাসবীহ যে তাওহীদেরই বলিষ্ঠ উচ্চারণ তা সকলে জানে না। এ বইতে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৬. রাসূলগণকে আল্লাহ তাআলা কী দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন? কুরআনের তিনটি সূরায় একটি আয়াতের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, দীনকে বিজয়ী করার জন্য রাসূল (স)-কে পাঠানো হয়েছে। আরেকটি সূরায় কয়েকজন রাসূলের নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে দীন কায়েম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দীন বিজয়ী বা কায়েম হলে এর সুফল কী হয় তা ঐ আয়াতগুলোতে উল্লেখ করা হয়নি। সূরা হাদীদের ২৫ নং আয়াতে সকল রাসূলকে সুস্পষ্ট নিদর্শন, কিতাব ও মীযান দিয়ে পাঠানো হয়েছে বলার পর ঘোষণা করা হয়েছে যে, কিস্ত বা ন্যায় প্রতিষ্ঠাই এর উদ্দেশ্য। রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থাও এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই দেওয়া হয়েছে। এ পুস্তিকায় এরই বাস্তব ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৭. **আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন।**

কুরআন অধ্যয়ন করলে এ কথাই স্পষ্টভাবে বুঝে আসে যে, মানুষের মনগড়া আইন ও অসৎ লোকের শাসনই মানবজাতির অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার প্রধান কারণ। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের উদ্দেশ্যেই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁদেরই পথ ধরে জামায়াতে ইসলামী ঐ মহান উদ্দেশ্যে কিভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তা-ই এ বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে।

আরো কতক বই

১. ইসলামী সভ্যতা বনাম পাশ্চাত্য সভ্যতা। প্রফেসর সেম্যুয়েল হান্টিংটনের বিখ্যাত বই 'Clash of Civilizations'-এর মধ্যে বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে আধুনিক উচ্চশিক্ষিত মুসলমানদের বিরাট বাহিনী গড়ে ওঠেছে বলে পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য ইসলামকে মহাবিপদ বলে ঘোষণা করেছেন। নব্বই-এর দশক থেকে হান্টিংটন তত্ত্বই আমেরিকার বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করছে। ইসলামী সভ্যতার পুনরুত্থান পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য বিপজ্জনক মনে করেই আমেরিকার নেতৃত্বে গোটা পাশ্চাত্য সভ্যতার পতাকাবাহীরা বিশ্বের কোনো মুসলিম দেশেই যাতে ইসলামী সরকার কায়েম না হয় সে উদ্দেশ্যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

আমার বইটিতে উভয় সভ্যতার ভিত্তি আলোচনা করে ইসলামী সভ্যতা যে মানবতার দৃষ্টিতে উন্নততর তা প্রমাণ করা হয়েছে, যাতে মুসলিম শিক্ষিত সমাজ পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ও ভোগবাদী সভ্যতার খপ্পর থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

২. দীন ইসলামের ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক ধারণা। মাত্র ১ ফর্মার এ চটি বইটিতে ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রচলিত ভুল ধারণা ও সঠিক ধারণার পার্থক্য সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

(১) আল্লাহ তাআলার সাথে মানুষের সম্পর্ক কী? (২) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (স) সাথে মুমিনের সম্পর্ক কী? (৩) কালেমায়ে তাইয়েবার মর্মকথা কী? (৪) কুরআন কোন ধরনের কিতাব? (৫) হাদীস মানে কী? (৬) দীন ইসলাম কথাটির অর্থ কী? (৭) ইবাদত বলতে কী বোঝায়? (৮) দীনদারী ও দুনিয়াদারীতে পার্থক্য কী? (৯) উন্নত মুসলিমের মানে কী? (১০) দীনের প্রতি মুমিনের দায়িত্ব কী? (১১) তাওহীদের মানে কী? (১২) নামায-রোযার হাকীকত কী? (১৩) যাকাত কী? (১৪) হজ্জ করতে হয় কেন? (১৫) জিহাদ মানে কী?

৩. আসুন আল্লাহর সৈনিক হই। কালেমায়ে তাইয়েবার মর্মকথা ব্যাখ্যা করে দেখানো হয়েছে যে, কালেমা বুঝে শুনে কবুল করা মানে আল্লাহর সৈনিক হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

৪. ইকামাতে দীন। দীন কায়েম হলে সমাজের চিত্র কেমন হয় তা প্রচলিত সমাজব্যবস্থার সাথে তুলনা করে দেখানো হয়েছে। বৃহত্তর আলেম সমাজ দীনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত থাকলেও দীন কায়েমের ব্যাপারে কেন অগ্রসর হন না তা-ও তুলে ধরা হয়েছে।

৫. ইকামাতে দীন ও খিদমতে দীন। ১৬ পৃষ্ঠার এ চটি বইটিতে আলেম সমাজ দীনের কী কী মহান খিদমতে নিয়োজিত আছেন এর উল্লেখ করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, তাদের দীনের খিদমত দীন কায়েমের জন্য সহায়ক হলেও শুধু এ খিদমত দ্বারা দীন কায়েম হতে পারে না। দীন কায়েমের জন্য কী পৃথক প্রচেষ্টা চালাতে হবে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৬. একজন মানুষ যিনি দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যাবশ্যক। রাসূল (স) আর সব মানুষের মতোই পিতার ঔরসে ও মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি মানুষই, অতিমানব নন। মানুষ হলেও তিনি মুমিনদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যাবশ্যক। তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে।

৭. সীরাতুন্নবী (স) সংকলন। এতে রাসূল (স) সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ রয়েছে। প্রবন্ধের বিষয় হলো- (১) ইসলামে নবীর মর্যাদা। (২) নবী জীবনের আদর্শ। (৩) বিশ্বনবীর চরিত্র গঠন পদ্ধতি। (৪) বিশ্বনবীর জীবনে রাজনীতি। (৫) রাহমাতাল্লিল আলামীন। (৬) রবিউল আউয়ালের পয়গাম।

এ প্রবন্ধগুলো পৃথক পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হয়েছে।

৮. কিশোর মনে ভাবনা জাগে– কিশোরদের উপযোগী ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা। মাওলানা মওদূদীর হাকীকত সিরিজের বইগুলোর বিষয় কিশোরদের উপযোগী করে পরিবেশন করা হয়েছে।

কতক বইয়ের শুধু নাম উল্লেখ করছি

(১) মুসলিম মা-বোনদের ভাবনার বিষয়। (২) ইসলাম ও দর্শন। (৩) ইসলাম ও বিজ্ঞান। (৪) ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন। (৫) ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টার ইতিহাস। (৬) আধুনিক পরিবেশে ইসলাম। (৭) মসজিদের ইমামদের মর্যাদা ও দায়িত্ব। (৮) যুক্তির কষ্ঠিপাথরে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ। (৯) প্রশান্তচিত্ত মুমিনের ভাবনা। (১০) আল্লাহ তাআলার সাথে মুমিনের সম্পর্ক। (১১) ইসলাম ও গণতন্ত্র। (১২) আলেম সমাজ ও দীনদারদের খিদমতে জরুরি প্রশ্ন। (১৩) বাইআতের হাকীকত। (১৪) ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ। (১৫) ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের প্রাথমিক পুঁজি।

দুটো গুরুত্বপূর্ণ বই

১. অল্প শিক্ষিত পাঠক-পাঠিকাদের একটি মাত্র মাঝারি আকারের বই থেকে মানবজীবনের সকল দিকে ইসলামের শিক্ষাকে সংগ্রহ করার সুযোগ দেওয়ার স্বপ্ন অবশেষে সফল হলো ২০০৫ সালে। ২০০৪-এর এপ্রিল থেকে ২০০৫-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ কিস্তিতে বইটি মাসিক পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়। ২০০৫ সালের নভেম্বরেই বই আকারে প্রথম মুদ্রণ হয়।

   মাত্র ১২০ পৃষ্ঠায় ইসলামের আলোকে ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, ধর্মীয় জীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, সাংস্কৃতিক জীবন ও আন্তর্জাতিক জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা কতটুকু সফল হয়েছে তা পাঠক-পাঠিকারাই ফায়সালা করবেন।

   যাদের উদ্দেশ্যে বইটি রচিত, তাদের বোধগম্য হওয়ার উপযোগী হয়েছে কি না এ বিষয়ে ৪ জনের সার্টিফিকেট পেয়ে আমি উৎসাহবোধ করেছি। তারা হলেন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, শাহ আবদুল হান্নান, ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক ও অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম (জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিস সেক্রেটারি)

   ২০০৮-এর জুন পর্যন্ত আড়াই বছরে নবম মুদ্রণ সম্ভব হওয়ায় বইটির পাঠকপ্রিয়তা দেখে সান্ত্বনা বোধ করছি। আল্লাহ তাআলার নিকট বিনীত আবেদন জানাচ্ছি, যেন বইটি রচনার উদ্দেশ্য সফল হয়।

   বইটির নাম : 'পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে ইসলামের সহজ পরিচয়।'

২. দ্বিতীয় বইটির নাম : 'মানবজাতির স্রষ্টা যিনি বিধানদাতাও একমাত্র তিনি'। বাংলাভাষী অমুসলিমদেরকে ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই বইটি রচিত। কভার পেজে লেখা আছে, 'অমুসলিম ভাই-বোনদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত'। আমার মহল্লার একজন সাবেক সচিব মন্তব্য করেছেন যে, আধুনিক শিক্ষিত মুসলিমদেরই এ বইটি পড়া প্রয়োজন, যাতে তারা ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়।

বইটিতে আমি প্রথমে সৃষ্টিজগতের এ মহাসত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে, বিশ্বের প্রতিটি প্রাণী ও নিষ্প্রাণ বস্তুর মধ্যেই কতক বিধি-বিধান কার্যকর দেখা যায়। কোনো প্রাণী ও বস্তু এসব বিধান তৈরি করেছে বলে বিশ্বাস করার কোনো যুক্তি নেই। এ কথা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই যে, যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন তিনিই প্রত্যেক সৃষ্টির উপযোগী বিধান দান করেছেন।

এরপর মানবদেহ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সকল মানুষই এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, মানবদেহের যাবতীয় বিধি-বিধান মানুষ রচনা করতে পারে না। একমাত্র

স্রষ্টাই সেসব বিধান রচনা করে তা কার্যকর করেছেন। সকল সৃষ্টিই তার বিধান অনুযায়ী পরিচালিত। সে বিধান অমান্য করার সাধ্য কারো নেই। এসব বিধান কোনো নবী ও রাসূলের মাধ্যমে আসেনি। স্রষ্টা স্বয়ং তা প্রতিটি সৃষ্টির উপর প্রয়োগ করেন।

মানবদেহ আসল মানুষ নয়। মানবদেহ পশুর মতোই একটি বস্তুগত জীব। আমাদের মধ্যে যে নৈতিক চেতনা বা বিবেক রয়েছে তা বস্তুসত্তার দেহের ঊর্ধ্বে এক নৈতিক সত্তা। এটাই আসল মানুষ। অন্যান্য পশুর এ সত্তা নেই। এ কারণেই মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব।

স্রষ্টা এ মানুষকে গোটা সৃষ্টিজগৎকে ব্যবহার করার অধিকার দিয়ে সে অধিকার প্রয়োগ করার উপযোগী একটি দেহ দান করেছেন। মানুষ কিভাবে তার দেহ ও বস্তুজগৎকে ব্যবহার করবে সে বিষয়ে কোনো বিধান না দিয়ে স্রষ্টা মানুষকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে হাতড়িয়ে মরতে বাধ্য করেছেন বলে মনে করার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য তিনি নিশ্চয়ই বিধান দিয়েছেন। সে বিধানের নামই হলো ইসলাম। তাই এ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। জানতে হলে কুরআন থেকেই সে জ্ঞান পেতে হবে। এ কুরআন যে রাসূলের মাধ্যমে এসেছে তার জীবন থেকেই সে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

কুরআন অধ্যয়ন করার জন্য অমুসলিমদেরকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন অনূদিত কুরআন শরীফ অধ্যয়ন করুন। এতে তিনি অনুবাদের সাথে সাথে ব্যাখ্যাও রচনা করেছেন। এ গ্রন্থটি প্রথম ১৮৮৭ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৮৭ সালে ঢাকা থেকে খোশরোজ কিতাব মহল তা প্রকাশ করে।

শিশির দাস প্রণীত 'প্রিয়তম নবী' বইটি থেকে কুরআনের বাণীবাহক মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে জানতে পরামর্শ দিয়েছি। আমার অনূদিত 'সহজ বাংলায় আল কুরআনের অনুবাদ' পড়ার পরামর্শও দিয়েছি। মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে কয়েকজন হিন্দু মনীষীসহ বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান অমুসলিমের মন্তব্য বইটিতে সন্নিবেশ করেছি।

মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে রচিত বই

১. মাওলানা মওদূদীকে যেমন দেখেছি। (১২৪ পৃষ্ঠা)
২. ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা। (১৬ পৃষ্ঠা)
৩. ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান। (৩২ পৃষ্ঠা)
৪. Political thoughts of Abul Ala Mawdodli (48 P.)
৫. Jamaate-Islami : Ideology and Movement (172 P.)
৬. জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা। (১০২ পৃষ্ঠা)
৭. বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী (৪৮ পৃষ্ঠা)

৮. বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ও জামায়াতে ইসলামী (৩১ পৃষ্ঠা)

৯. জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য (৩২ পৃষ্ঠা)

১০. জামায়াতে ইসলামীর কর্মনীতি (৪৪ পৃষ্ঠা)

১১. রুকনিয়াতের আসল চেতনা (১৬ পৃষ্ঠা)

১২. রুকনিয়াতের দায়িত্ব ও মর্যাদা (৪৭ পৃষ্ঠা)

১৩. আদর্শ রুকন (২৪ পৃষ্ঠা)

কয়েকটি রাজনৈতিক বই

১. স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রশ্ন : নির্ভুল তথ্যসহ প্রমাণ করা হয়েছে যে, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে ভারতের আধিপত্য কায়েম করতে আগ্রহী– বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী নয়।

২. শেখ হাসিনার দুঃশাসনের পাঁচ বছর।

৩. ২০০১ সালের নির্বাচনের পর শেখ হাসিনার আজব রাজনীতি।

৪. ২০০৭-এর নির্বাচন বানচালের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনার হিংস্র রাজনীতি।

৫. পলাশী থেকে বাংলাদেশ– ১৯৭১ সালে ইসলামপন্থীদের ভূমিকার ব্যাখ্যা।

৬. শেখ মুজিব কোনো বেসামরিক ব্যক্তিকে যুদ্ধাপরাধীর তালিকাভুক্ত করেননি। ৩৭ বছর পর এ ইস্যু নিয়ে মাতামাতির আসল গরজ কী?

৭. বাংলাদেশের জনগণের নিকট ১৫ আগস্ট কি শোক দিবস? শেখ মুজিব কি জাতির পিতা?

৮. রাজনৈতিক সংকটের মূলে আওয়ামী লীগের আদর্শিক অধঃপতন, অগণতান্ত্রিক আচরণ ও পরাশক্তির দালালি।

৯. কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি– উদ্ভাবনা প্রস্তাবনা আন্দোলন।

১০. জাতীয় সংসদে রাজনৈতিক দলের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতি।

১১. ভারতীয় আগ্রাসন ও বাঙালি মুসলমান।

১২. ঘটনাবহুল পঁচাত্তর সাল– আগস্ট ও নভেম্বর বিপ্লব।

কতক বড় বই

কুরআনের অনুবাদ ও জীবনে যা দেখলাম-এর খণ্ডগুলো ছাড়া আর সব বই-ই ১ থেকে ৪ ফর্মার বেশি নয়। মাত্র কয়েকটি বই তুলনামূলকভাবে একটু বড়।

১. আমার বাংলাদেশ– বাংলাদেশ সম্পর্কে আমার সকল লেখার সংকলন (১৯৮ পৃষ্ঠা)

২. প্রশ্নোত্তর– (২০৪ পৃষ্ঠা) (কয়েক বছরে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়)

৩. চিন্তাধারা (২৫৪ পৃষ্ঠা) পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন।

৪. স্টাডি সার্কেল (২২৩ পৃষ্ঠা) স্টাডি সার্কেলে আলোচ্য ৫২টি বিষয়ের সিনপসিসের সংকলন।

৩৬১.

"যে আশঙ্কায় স্বাধীনতা সংগ্রামে শরীক হতে পারলাম না দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা-ই সত্যে পরিণত হলো"

স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর প্রথম ১১ বছর পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দই কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করেন। এরপর ১২ বছর পশ্চিম পাকিস্তানি দুই সেনাপতির স্বৈরশাসন চলে। পূর্ব পাকিস্তানিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়।

এ পরিস্থিতিতে ১৯৭০ সালে প্রথম কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের নির্বাচন হয়। এ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্ব পূর্বপাকিস্তানিদের হাতে ন্যস্ত করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের প্রায় সকল আসনে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করে। ফলে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হয়।

সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী শেখ মুজিবেরই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা এবং পার্লামেন্টে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা মি. জুলফিকার আলী ভুট্টোর বিরোধী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করার কথা। কিন্তু মি. ভুট্টো অত্যন্ত অন্যায় দাবি উত্থাপন করে শেখ মুজিবের সাথে ক্ষমতায় অংশগ্রহণের জন্য সমঝোতার প্রস্তাব দেন। ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টো ষড়যন্ত্র করে পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করতে গড়িমসি করেন। শেষ পর্যন্ত ৩ মার্চ (১৯৭১ সালে) ঢাকায় অধিবেশন ডাকা হয়। ভুট্টো ঢাকা আসতে অস্বীকার করায় ইয়াহিয়া খান অধিবেশন মুলতবি করেন।

শেখ মুজিবের বিদ্রোহ

শেখ মুজিব প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা বেসরকারিভাবে হাতে নেন। সচিবগণ তাঁরই নির্দেশ মেনে চলেন। শেখ মুজিব ইচ্ছে করলে তখনই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারতেন। ইয়াহিয়ার সামরিক শাসন তখন অচল। স্বাধীনতা ঘোষণা করলে ঠেকানোর মতো সামরিক শক্তি তখন এখানে ছিল না; কিন্তু শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন বিধায় তা করেননি।

সারাদেশে বিশেষ করে ঢাকায় হরতাল ও মিছিল চলে। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ভাষণ হয়। সেখানে তিনি ঘোষণা করেন, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

স্বাধীনতার স্লোগান

নির্বাচনী ফলাফলকে গুরুত্ব না দিয়ে ইয়াহিয়া-ভুট্টো গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করলেন তাতে স্বাধীনতার দাবি করা স্বাভাবিকই ছিল। যদি শুধু গণতান্ত্রিক অধিকার হাসিল করার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা সংগ্রাম হতো তাহলে সকল রাজনৈতিক মহলই তাতে শরীক হওয়া কর্তব্য মনে করত; কিন্তু স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলনের স্লোগানে গণতন্ত্রের কোনো দাবি ছিল না। স্বাধীনতার উদ্দেশ্য হিসেবে এ দেশে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও রাশিয়ার সমাজতন্ত্র কায়েমের স্লোগানই প্রাধান্য পেল। তদুপরি নারায়ে তাকবীর ও জিন্দাবাদের বদলে জয় বাংলা উচ্চারিত হলো।

যারা উপরিউক্ত দুটো মতবাদকে সুস্পষ্টরূপে ইসলামবিরোধী বলে বিশ্বাস করে, তাদের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামে শরীক হওয়ার পথে বিরাট বাধার সৃষ্টি হলো। ঈমানের বিরোধী ভূমিকা পালন করা কি তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল?

ইয়াহিয়া-মুজিব সংলাপ

বাধ্য হয়ে শেখ মুজিবের সাথে সমঝোতার উদ্দেশ্যে ১৫ মার্চ (১৯৭১) ইয়াহিয়া খান ঢাকা আসেন। ১৭ থেকে ২১ তারিখ পর্যন্ত ইয়াহিয়া-মুজিব দ্বিপাক্ষিক সংলাপ এবং ২২ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টো ত্রিপাক্ষিক সংলাপ চলে। সংলাপ সফল হলে শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করতেন। সে আশায়ই তিনি সংলাপ করতে সম্মত হন। তা না হলে তিনি সংলাপে সম্মত না হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণা করতে পারতেন।

সংলাপ ব্যর্থ হয়ে গেল

২৫ মার্চ দিবাগত রাত ঢাকায় সেনাবাহিনীর হিংস্র তাণ্ডব শুরু হলে বোঝা গেল যে, সংলাপ ব্যর্থ হয়ে গেছে। আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সকল নেতা ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। শেখ মুজিব তাদেরকে কী নির্দেশ দিলেন জানা গেল না। তিনি যদি ভারত সরকারের সাহায্যে মুক্তিযুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিতেন তাহলে তিনিও ভারতে চলে যেতেন। তিনি তা না করে স্বেচ্ছায় ইয়াহিয়া সরকারের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন। কোনো সেনাপতি যুদ্ধ ঘোষণা করে শত্রুর হাতে স্বেচ্ছায় ধরা দিতে পারে না।

ভারত সরকারের সাহায্যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল

১৯৪৭ সালের পর থেকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের একতরফা বৈরী আচরণে যারা ভারতকে বন্ধু মনে করতে অক্ষম এমন সকল রাজনৈতিক দল নিশ্চিত ছিল যে,

আমাদেরকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং পাকিস্তানকে ভেঙে দুর্বল করা এবং বাংলাদেশকে ভারতীয় পণ্যের বাজারে পরিণত করে এদেশে তাদের পূর্ণ আধিপত্য কায়েম করার উদ্দেশ্যেই আওয়ামী লীগের ডাকে সাড়া দেবে। এ অবস্থায় বাংলাদেশ ইসলামাবাদ থেকে পৃথক হয়ে দিল্লির তল্পিবাহকে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা অত্যন্ত প্রবল। এ জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে শরীক হওয়া তাদের পক্ষে কি সম্ভব ছিল?

আমাদের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হলো

যে আশঙ্কার কারণে দেশের ভারতবিরোধী ও ইসলামী মহল স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারল না, সে আশঙ্কা বাস্তবে সত্য হয়ে দেখা দিল।

প্রথম শঙ্কা ছিল, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ইসলামবিরোধী শক্তির ক্ষমতায়ন। ১৯৭২ থেকে '৭৫ এবং ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালের আওয়ামী শাসন ইসলামের বিরুদ্ধে যে অভিযান চালাল তা সবারই জানা।

দ্বিতীয় শঙ্কা ছিল, ভারতের আধিপত্যের চাপে দেশের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হওয়া।

আওয়ামী লীগ ভারতের সাহায্যে স্বাধীনতা লাভের জন্য বাধ্য হওয়া সত্ত্বেও তারা ইচ্ছা করলে জনগণের শক্তির উপর ভরসা করে ভারতের আধিপত্য থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারত। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হলো তারা এতটা ভারতপ্রেমিক যে, বাংলাদেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সবসময় ভারতের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে আসছে।

১. দেশের সকল জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তি দেশপ্রেমের যে তাগিদে ভারতকে ট্রানজিট দেওয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার, আওয়ামী লীগ সে ট্রানজিট দেওয়ার জন্য ভারতের চেয়েও বেশি আগ্রহী।

২. বাংলাদেশ ২০০৫ সাল থেকে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমনে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে আসছে। সাউথ এশিয়ান টাস্কফোর্স গঠন করে ভারতীয় বাহিনীর হাতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সন্ত্রাস দমনের নামে আধিপত্য কায়েমের সুযোগ দেওয়ার বিরুদ্ধেও সকল দেশপ্রেমিক জনতা সোচ্চার; কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

৩. বাংলাদেশের দুটো বন্দর দেশের আমদানি-রপ্তানির জন্য যথেষ্ট না হওয়া সত্ত্বেও ভারতকে তা ব্যবহার করার সুযোগ দিতে তারা প্রচণ্ড আগ্রহী।

বাংলাদেশের সকল স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ভারতের স্বার্থ উদ্ধার করার এ প্রবণতা দেশবাসীর জন্য চরম কলঙ্কজনক। আশা করি, জনগণ তা মেনে নেবে না।

১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ঘোষণা করলেন যে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদই তার আদর্শ। অথচ তিনি যে শাসনতন্ত্রের হেফাযত করার শপথ

নিয়ে ক্ষমতায় গেলেন, তাতে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ অনুপস্থিত। ২০০৮ সালের নির্বাচনের পূর্বে আওয়ামী লীগ ঘোষণা করে যে, সংসদে তারা দু-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হলে ১৯৭২ সালের শাসনতন্ত্রকে পুনর্বহাল করবে। ঐ শাসনতন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদই প্রধান আদর্শ ছিল।

নির্বাচনে তারা যে অবিশ্বাস্য সংখ্যাগুরুত্ব অর্জন করেছে তাতে শাসনতন্ত্র সংশোধন করে আবার ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে এর অন্তর্ভুক্ত করতে সামান্য বাধাও থাকল না।

বাংলাদেশের স্বার্থের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ নীরব

১৯৭২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের সাথে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশের স্বার্থের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ বিস্ময়কর নীরবতা পালন করছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এখানে সন্নিবেশ করছি–

১. ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা প্রায়ই বাংলাদেশিদেরকে পাখির মতো গুলি করে হত্যা করে। আজ পর্যন্ত একটি বারও তারা এর প্রতিবাদ করেনি।

২. প্রতি বছর ভারতের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি বাড়ছে। তারা কোনো সময়ই এ ব্যাপারে আপত্তি তোলেনি।

৩. ভারত থেকে প্রবাহিত নদীর পানি শুকনো মৌসুমে বাঁধ দিয়ে আটকে রেখে বাংলাদেশে মরুভূমি সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং বর্ষাকালে বাঁধ ছেড়ে দিয়ে বন্যায় ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গোটা দেশবাসী এ বিষয়ে সোচ্চার। তারা কোনো দিন আপত্তি করে না; এমনকি চুক্তি অনুযায়ী পানি না দিলেও দাবি জানায় না।

   প্রথম হাসিনা সরকারের আমলে পানিমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক দাবি করতেন যে, চুক্তির অতিরিক্ত পানিই নাকি বাংলাদেশ পাচ্ছে। হাসিনার বর্তমান মন্ত্রিসভার পানিমন্ত্রী রমেশ চন্দ্র সেন ভারত যতটুকু পানি দেয় তাতেই কৃতজ্ঞ।

৪. শেখ মুজিবের সাথে চুক্তি অনুযায়ী ভারতকে বেরুবাড়ি দান করে দিলেও ভারত আজ পর্যন্ত তিন বিঘা করিডোর দেয়নি। এতে তাদের কোনো আপত্তির কথা জানা যায়নি।

৫. সীমান্ত রেখা চূড়ান্তভাবে চিহ্নিত করার ব্যাপারে ভারতের অনীহাতে তাদের কোনো আপত্তি নেই।

৬. ছিটমহলের মীমাংসার ব্যাপারে তাদের কোনো তাগিদ নেই।

৭. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৬টি জেলাকে বাংলাদেশ থেকে পৃথক করে স্বাধীন বঙ্গভূমি নামে একটি হিন্দু রাষ্ট্র কায়েমের আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে অনেকদিন থেকেই চলছে। এর কোনো প্রতিবাদ আজ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ করেনি।

৮. বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ভারত কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করেছে। আওয়ামী লীগ এ বিষয়ে চুপ।

৯. বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার অভ্যন্তরে জেগে ওঠা তালপট্টি দীপ ভারত অন্যায়ভাবে দখল করে আছে। এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের কোনো আপত্তি নেই।

১০. পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনী নামে রাষ্ট্রদ্রোহী শক্তিকে ভারত ট্রেনিং ও অস্ত্র দিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহায্য করেছে। তাদেরকে দমন করার পরিবর্তে শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হয়ে ১৯৯৮ সালে তথাকথিত শান্তিচুক্তি নামে বিদ্রোহীদের সব দাবি মেনে নিয়ে ওখানকার বাঙালিদেরকে নিজ দেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করেছেন।

উপরে বর্ণিত আচরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে একক কৃতিত্বের দাবিদার আওয়ামী লীগের দেশপ্রেমের কোনো প্রমাণ মেলে কি না তা জনগণেরই বিবেচ্য।

কারা আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনল?

২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ যে হিংস্র সন্ত্রাসী ভূমিকা পালন করেছে এর পক্ষে ইউরোপ ও আমেরিকার কূটনীতিকগণের অপতৎপরতা, নর্তন-কুর্দন বিরাট অবদান রেখেছে। জাতিসংঘকেও সে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে।

সেনাসমর্থিত ও পরিচালিত ড. ফখরুদ্দীন সরকার এবং তাদের নিযুক্ত নির্বাচন কমিশন দু বছর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ বিএনপিকে ছিন্নভিন্ন করে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে পঙ্গু করে দেয়। বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে গ্রেফতার করার মতো তেমন কোনো অভিযোগ না থাকলেও তার দলকে বিধ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে তাকে জেলে রাখা হয়। কারণ, জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তি ঐক্যবদ্ধ থাকলে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনা সম্ভব নয়। এ কথা ২০০১ সালের নির্বাচনে প্রমাণিত। ঐ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভোট বিএনপি'র সমান থাকা সত্ত্বেও ইসলামপন্থিদের ভোট না পাওয়ায় তারা শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়।

একদিকে সরকার ও নির্বাচন কমিশন এবং সরকারের পেছনের শক্তি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী শক্তিকে ক্ষমতায় আনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়; এমনকি সরকারিভাবে কারচুপি করে শতকরা ৯৫ থেকে ৮৫ ভাগ ভোট প্রদানের মতো

অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটিয়ে আওয়ামী লীগকে সংসদের ৫ ভাগের ৪ ভাগ আসনে বিজয়ী করে।

অপরদিকে ২০০১ সালে চারদলীয় জোট সরকারে জামায়াতে ইসলামীর মাত্র দু'জন মন্ত্রী থাকায় বাংলাদেশে ভবিষ্যতে তথাকথিত 'ইসলামী মৌলবাদী' শক্তি ক্ষমতাসীন হওয়ার আশঙ্কায় ইউরোপ ও আমেরিকা শঙ্কিত হয়ে পড়ে।

ইউরোপ ও আমেরিকার আতঙ্কের দুটো প্রমাণ

লন্ডনের ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউনের ২০০৫ সালের ১৬ এপ্রিল সংখ্যায় ফিলিপ ব্রাউনিং বাংলাদেশ সম্পর্কে তার লেখায় উল্লেখ করেন :

While the main parties are firmly secularist the Jamaat is using its swing position effectively to acquire more influence in government than its numbers suggest. The Jamaat has not pressed an Islamic agenda too overtly, but its ministers have acquired a reputation for being competent and uncorrupt, which could serve it well if disillusion with the major parties spreads. It is all too easy however, to overemphasize the dangers of radical Islam here.

অর্থাৎ, 'বাংলাদেশে প্রধান দলগুলো শক্ত ধর্মনিরপেক্ষ হলেও জামায়াতে ইসলামী সংখ্যার তুলনায় সরকারের উপর বেশি প্রভাবশালী হওয়ার জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। জামায়াত এখনো জোরেশোরে ইসলামী এজেন্ডার জন্য চাপ দিচ্ছে না; কিন্তু তাদের মন্ত্রীরা যোগ্য ও দুর্নীতিমুক্ত হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে। ফলে যদি প্রধান দলগুলো জনপ্রিয়তা হারায় তাহলে তা জামায়াতের কাজে লাগবে। তাই সহজেই জোর দিয়ে বলা যায় যে, বিপ্লবী ইসলামের শঙ্কা এখানে অবশ্যই রয়েছে।'

দ্বিতীয় প্রমাণ

আমেরিকার বিখ্যাত হারভার্ড ইন্টারন্যাশনাল রিভিউ'র ২৪ নভেম্বর ২০০৮ সংখ্যায় Stemming the Rise of Islamic Extremism in Bangladesh শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটি সম্পর্কে দৈনিক নয়াদিগন্তে প্রখ্যাত কলামিস্ট ফরহাদ মজহার ও দৈনিক আমার দেশে বিশিষ্ট কলামিস্ট মাহমুদুর রহমান এবং অন্যান্য পত্রিকায় আরো অনেকে বিস্তর লিখেছেন।

প্রবন্ধটির রচয়িতা হিসেবে দু'জনের নাম রয়েছে। একজন শেখ হাসিনার ছেলে সজিব এ ওয়াজেদ জয়, অপরজন আমেরিকার সন্ত্রাস প্রতিরোধ বিশেষজ্ঞ এবং ইরাক ও সৌদি আরবে এক সময় কর্মরত একজন সেনাকর্মকর্তা। তার নাম কার্ল জে সিওভাক্কো। তিনি নিরাপত্তা বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

প্রবন্ধটির শিরোনামের অর্থ হলো, 'বাংলাদেশে ইসলামী চরমপন্থিদের উত্থান প্রতিরোধ'।

প্রবন্ধের ভূমিকায় বলা হয়,

Bangladesh has been a secular Muslim state since its independence from Pakistan and founding by Shaikh Mujibur Rahman in 1971. While its short history has been full of military coup d'etats, it has always returned to its roots as a secular democratic state. There are however, new signs of a shift towards a growing Islamism that could jeopardize the sanctity of secularism in the country. While the governing construct's legitimacy is suffering politically from the past two years of emergency military rule, Islamism may be the biggest threat to the country's constitution and secular underpinnings. As elections are scheduled for December 18th and the two major political parties jostle over the country's future, each party's vision for the proper mix of Islam and government will be at forefront. Rahman's Awami League has long been the standard bearer of secularism and if elected it could roll back the growing tide of Islamism in Bangladesh. The Awami League must, however, implement certain changes to Pro-actively check this Islamism if it hopes to secure long-lasting secularism and democracy. If successful, an Awami League-led Bangladesh could be the global example of secular governance in a Muslim country.

অর্থাৎ, '১৯৭১ সাল হতে পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ও শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিম রাষ্ট্রই ছিল। এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে বারবার সামরিক অভ্যুত্থান হলেও সবসময়ই একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে এর মূল অবস্থায় ফিরে এসেছে। অবশ্য ইসলামী মতবাদের দিকে ঝুঁকে যাওয়ার নতুন ঝামেলার আলামত দেখা যাচ্ছে, যা দেশটিতে গণতান্ত্রিক পবিত্রতাকে বিপদগ্রস্ত করতে পারে। যদিও গত দু বছরের সামরিক শাসন ও জরুরি অবস্থার দরুন দেশটির শাসনকাঠামোর বৈধতা রাজনৈতিকভাবে বিপন্ন, ইসলামী মতবাদ দেশটির শাসনতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তির জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

যেহেতু ডিসেম্বরের ১৮ তারিখ নির্বাচনের জন্য ধার্য হয়েছে, দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দু প্রধান দলের ধাক্কাধাক্কি, ইসলাম ও সরকারের সংমিশ্রণের বিষয়টি প্রত্যেক দলের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাধান্য পাবে।

রহমানের আওয়ামী লীগ দীর্ঘকাল থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার পতাকাবাহী। বিজয়ী হলে এ দলটি বাংলাদেশে ইসলামী মতবাদের অগ্রসরমান স্রোতকে ঠেকাতে পারবে।

যদি আওয়ামী লীগ দীর্ঘস্থায়ী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও গণতন্ত্র নিশ্চিত করতে চায় তাহলে তাদেরকে অবশ্যই এমন কিছু পরিবর্তন আনতে হবে, যাতে ইসলামিজমকে কার্যকরভাবে প্রতিহত করা যায়। যদি এতে তারা সফল হয়, তাহলে আওয়ামী লীগ মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর জন্য পৃথিবীব্যাপী ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের আদর্শ নমুনা হতে পারে।

ঐ প্রবন্ধে বাংলাদেশে ইসলামের অগ্রগতির কতক নমুনা উল্লেখ করে শঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন– বোরকার প্রচলন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেনাবাহিনীতে বিপুল সংখ্যক মাদরাসার ছাত্র ঢুকে পড়েছে। এ তথ্য মোটেও সত্য নয়; কিন্তু তা প্রচার করা হয়েছে।

মাদরাসার ছাত্রদেরকে এত ভয় পাওয়ার কারণ এটাই যে, এরা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ কিছুতেই গ্রহণ করবে না। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদরাসা ছাত্রদেরকে ৭টি বিভাগে ভর্তি করা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এ আশঙ্কায়ই যে, এরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা নিয়ে প্রশাসনে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মৌলবাদ' বৃদ্ধি করবে। কারণ, এরা কোনো অবস্থায়ই ধর্মনিরপেক্ষ হবে না।

পাঁচ-দফা কর্মসূচি

আওয়ামী লীগ বিজয়ী হলে তাদের করণীয় পাঁচ-দফা কর্মসূচিও প্রবন্ধে ব্যাখ্যাসহ দেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধে জয়ের পরিচয় দিতে গিয়ে শেখ হাসিনার ছেলে নয়, তার উপদেষ্টা বলা হয়েছে। নিশ্চয়ই তার যোগ্য প্রিয় ছেলের দেওয়া কর্মসূচি তিনি নিষ্ঠার সাথেই পালন করবেন। কর্মসূচির শিরোনামগুলো থেকে মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়:

১. মাদরাসা পাঠ্যসূচি আধুনিকায়ন করা।

২. কার্যকর ধর্মনিরপেক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও হাসপাতাল নির্মাণ।

৩. সশস্ত্র বাহিনীতে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অধিক সংখ্যায় ভর্তি করা।

৪. ধর্মীয় চরমপন্থিদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৫. দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা কমানো।

দুর্ভাগা বাংলাদেশ

দুনিয়ার কোনো রাষ্ট্রে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সমর্থক রাজনৈতিক শক্তি দেখা যায় না। বিশেষ করে এমন প্রতিবেশী রাষ্ট্র, যে সবসময় বৈরী আচরণ করে এবং নিজের স্বার্থ ছাড়া অপর রাষ্ট্রের ন্যায়ানুগ অধিকারও দিতে সম্মত হয় না।

একমাত্র বাংলাদেশই এমন একটি দুর্ভাগা দেশ, যেখানে ভারতপন্থি হিসেবে পরিচিত একটি বিশাল রাজনৈতিক দল রয়েছে, যে দল নিজের দেশের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। ঐ রাষ্ট্র স্বাভাবিক কারণেই এমন একটি রাজনৈতিক শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করবে।

পলাশীর ময়দানে নবাব সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ের জন্য ক্লাইভকে দোষ দেওয়া চলে না। এর জন্য আসল দোষী মীর জাফর। ক্লাইভ তার জাতির নিকট হিরোর মর্যাদা পেয়েছে।

আমাদের আশঙ্কা যদি সত্যে পরিণত না হতো

ধর্মনিরপেক্ষতার কুফরী মতবাদ ও ভারতের মতো সম্প্রসারণবাদী রাষ্ট্রের আধিপত্যের যে আশঙ্কায় আমাদের বিবেক স্বাধীনতা সংগ্রামে শরীক হতে সম্মত হলো না, সে আশঙ্কা যদি সত্যে পরিণত না হতো তাহলে আমাদের সিদ্ধান্ত ভুল ছিল বলে আমরা অকপটে স্বীকার করতাম কিন্তু জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী দেশপ্রেমিক সকলেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে যে, বাংলাদেশ দিল্লির তল্পিবাহক রাষ্ট্রে পর্যবসিত হয়েছে।

বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনারগণ ও ভারত সরকারের নেতৃবৃন্দ সবসময় বলে এসেছেন যে, তারা বাংলাদেশে সেক্যুলার শক্তিকে ক্ষমতাসীন দেখতে চান। এতে তাদেরকে কোনো দোষ দিচ্ছি না। তাদের আদর্শ অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত হোক তা তারা চাইতেই পারেন; তাদের পছন্দনীয় শক্তিকে ক্ষমতাসীন করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টাও চালাতে পারেন এবং তা তারা করে থাকবেন এটাই স্বাভাবিক।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইউরোপ ও আমেরিকার সেক্যুলার শক্তি এবং আমেরিকার সাথে চুক্তিবদ্ধ ভারতের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছিল নির্বাচনে বাংলাদেশে সেক্যুলার শক্তিকে ক্ষমতাসীন করা।

আর তাদের ইচ্ছা পূরণ করেছে অনির্বাচিত সংবিধানবিরোধী সরকার, এর পৃষ্ঠপোষক শক্তিও নির্বাচন কমিশন। এ নির্বাচনে ভৌতিক ভোট প্রয়োগের ব্যাপারে কলামিস্টগণ বহু লিখেছেন। কোনো গণতান্ত্রিক দেশেই শতকরা ৬০-এর বেশি ভোট পড়ে না। বাংলাদেশেও ইতঃপূর্বে শতকরা ৭৫-এর বেশি ভোট পড়েনি। গত নির্বাচনে অবিশ্বাস্য, বিস্ময়কর, অস্বাভাবিক, অযৌক্তিক সংখ্যক ভোট প্রয়োগের ঘটনা ইতিহাসে এমন রেকর্ড হয়ে থাকবে যেখানে ভবিষ্যতে কোনো নির্বাচনই পৌঁছতে পারবে না।

সরকারের হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, বর্তমান আওয়ামী লীগের প্রধান টারগেট দুটো। যথা–

১. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নামক কুফরী মতবাদকে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করা। সকল ইসলামী রাজনৈতিক দলের মতে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি জঘন্য কুফরী মতবাদ। এ মতবাদ দীন ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে স্বীকার করে না। ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মতো কতক অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্মে পরিণত করতে চায়। মুহাম্মদ (স)-কে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নেতা বলে স্বীকার করে না। তাঁকে শুধু ধর্মনেতায় পর্যবসিত করতে চায়।

২. আওয়ামী লীগের ক্ষমতা এ দেশে স্থায়ী করার প্রয়োজনে বাংলাদেশে ভারতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। ভারতের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এ উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না।

বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলন উপরিউক্ত দুটো টারগেটের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে তারা বিবেচনা করে। শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সজিব ওয়াজেদ জয়ের প্রবন্ধে দেওয়া পরামর্শ অনুযায়ী বাংলাদেশে ইসলামী শক্তির উত্থান প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামীর অগ্রগতি রোধ করার প্রয়োজনেই তথাকথিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রহসন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৩৮ বছর পর্যন্ত কেন বিচার হয়নি?

১৯৭২ সালে শেখ মুজিব সরকার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৯৫ জন কর্মকর্তাকে যুদ্ধাপরাধীর তালিকাভুক্ত করেছে। সে তালিকায় কোনো বেসামরিক লোকের নাম ছিল না। ট্রাইব্যুনাল করে তাদের বিচার করার জন্য আইন করা হয়েছিল।

১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের মধ্যে সংঘটিত চুক্তি অনুযায়ী ঐ ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

যারা ঐ বাহিনীকে সমর্থন করেছিল তাদেরকে কলাবরেটর সাব্যস্ত করে বিচারের জন্য আইন করা হয়। আওয়ামী লীগ এখন কলাবরেটরদেরকে যুদ্ধাপরাধী আখ্যা দিচ্ছে। সেক্টর কমান্ডারগণ তখন সরকারি উচ্চপদে ছিলেন। তাঁরা এখন যাদেরকে যুদ্ধাপরাধী বলছেন তখন তাদের নাম তালিকাভুক্ত করার জন্য মুজিব সরকারকে কেন পরামর্শ দিলেন না? কলাবরেটরদেরকে যুদ্ধাপরাধী আইনে বিচার করার আইনগত বৈধতা আছে কি না আদালতে ফায়সালা হবে।

শেখ মুজিব যদি ভুল করে থাকেন তাহলে তাঁর সুযোগ্য কন্যা যখন পাঁচ বছর ক্ষমতায় ছিলেন তখন কেন বিচার করলেন না?

১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান কলাবরেটরদের পক্ষে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। এটা একটা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত (Act of State)। কলাবরেটরদের আবার বিচার করা বৈধ কি না আদালত বিবেচনা করবে।

১৯৯৪ থেকে '৯৬ পর্যন্ত বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে আন্দোলনে জামায়াত নেতাদের সাথে শেখ হাসিনা স্বয়ং বৈঠক করেছেন এবং আন্দোলনের কর্মসূচি প্রণয়নে আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে অগণিত বৈঠক হয়েছে। তখন তারা যাদেরকে যুদ্ধাপরাধী বলে দাবি করেননি, এখন কোন্ গরজে তাদেরকে যুদ্ধাপরাধী আখ্যা দেওয়া হচ্ছে তা স্বাধীন আদালত অবশ্যই বিবেচনা করবেন।

সম্প্রতি দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক মার্কিন উপ-সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিচার্ড বাউচার ঢাকা সফরে এসে মন্তব্য করেছেন, 'যদি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পেছনে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্য থাকে তাহলে তা গ্রহণীয় হবে না।' তিনিও উপলব্ধি করেছেন যে, উদ্দেশ্য ন্যায়বিচার নয়। ট্রাইব্যুনালে তো ন্যায়বিচার হতেই পারে না। কারণ, যারা বাদী তারাই ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিয়োগ করবেন। ট্রাইব্যুনাল তাদের নির্দেশমতো রায় দেবে।

আসল আসামিদেরকে ছেড়ে দিয়ে এবং তাদের সমর্থকদেরকে একবার ক্ষমা করে আবার আসামি সাব্যস্ত করা কেমন করে বিবেকসম্মত হতে পারে তা-ই বিবেচনার বিষয়।

আশা করি–

আমার সাথে সরকার যে আচরণই করুক, আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে– এ পুস্তকে যা লিখেছি তা দেশের ঐসব লোকেরই মনের কথা, যারা ভারতকে বন্ধু মনে করে না; যারা দেশে অন্য দেশের আধিপত্য চায় না এবং যারা দেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেখতে আগ্রহী।

এ সরকার যত বড় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়েই ক্ষমতাসীন হোক, তাদের সার্বভৌমত্ববিরোধী ও ভারতের আধিপত্যের পক্ষে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক জনগণ একদিন বিদ্রোহ করবেই। যারা ইসলামাবাদের আধিপত্য সহ্য করেনি তারা দিল্লির আধিপত্যও মেনে নিতে পারে না।

যে ফ্যাসিবাদী চরিত্রের কারণে শেখ মুজিবের মতো ক্যারিসম্যাটিক লিডার কয়েক বছরও জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে পারেননি, সে একই কারণে শেখ হাসিনাও অল্প সময়েই জনপ্রিয়তা হারাতে পারেন।

জনগণকে যখন ১০ টাকা সের চাল ও বিনামূল্যে সার দিতে এবং প্রতি পরিবারের একজনের কর্মসংস্থান করতে ব্যর্থ হবেন তখন গণ-অসন্তোষ শুরু হয়ে যাবে। অবাস্তব ওয়াদা দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার পরিণতি যা হওয়ার তা-ই হবে।

নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ দেশের সর্বত্র যে সন্ত্রাসী আচরণ করে চলেছে, তা শেখ মুজিবের রক্ষীবাহিনীর কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

দেশবাসীর নিকট আকুল আবেদন

১৯৭৯ সাল থেকে জামায়াতে ইসলামী আপনাদের চোখের সামনে প্রকাশ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। জামায়াত কোনো গোপন তৎপরতায় বিশ্বাসী নয়। জামায়াত সকল প্রকার সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের চরম বিরোধী। কারণ নবী-রাসূলগণ এ ভ্রান্ত পন্থা অবলম্বন করেননি।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রহসন করে সরকার জামায়াতে ইসলামীকে দমন করতে চাচ্ছে। এ দেশে কুরআনী শাসনের আন্দোলন বন্ধ করাই যে তাদের মতলব তা আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। আপনারা দু'আ করুন, যাতে তাদের কুমতলব সফল না হয়।

১৯৭৪ সালে শেখ মুজিবুর রহমান কলাবরেটরদের পক্ষে ক্ষমা ঘোষণা করেন। যাদের বিরুদ্ধে খুন, ধর্ষণ, লুট ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ রয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করেননি। বর্তমান আইনমন্ত্রী বলেছেন, তাদেরকেই যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার করা হবে।

১৯৭১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীর কারো বিরুদ্ধে কোনো থানায় এ জাতীয় কোনো মামলা হয়নি। অন্যায়ভাবে এখন নতুন মিথ্যা মামলা তৈরি করে কি বিচারের প্রহসন করা হবে?

৩৬২.

রাষ্ট্রের সংজ্ঞার একটি অপরিহার্য উপাদান হলো সার্বভৌমত্ব। এর মানে হলো, রাষ্ট্রটি বাইরের কোনো শক্তির চাপে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য নয়। সকল সিদ্ধান্ত স্বাধীনভাবে গ্রহণ করার অধিকার ভোগ করে। সে হিসেবে বাংলাদেশ সার্বভৌম রাষ্ট্র কি না এ প্রশ্নটি ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারিতে সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। কিন্তু ঐ তারিখে সেনাপ্রধান জেনারেল মঈন উ আহমদ কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তাসহ সশস্ত্র

অবস্থায় বঙ্গ-ভবনে ঢুকে অস্ত্রের মুখে প্রেসিডেন্টকে তাদের নির্দেশ মেনে নিতে বাধ্য করেন। এটুকু কর্ম তো শুধু সংবিধান লঙ্ঘন হলো। কিন্তু যে কারণে সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন উঠেছে তা হলো এই যে, জাতিসংঘের বাংলাদেশস্থ আবাসিক প্রতিনিধি জাতিসংঘের সেক্রেটারির বরাত দিয়ে হুমকি দিয়েছেন যে, ২২ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করলে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে আর কাউকে নেবে না।

বাংলাদেশের সংবিধান লঙ্ঘন করে দেশের বাইরের নির্দেশ পালন করায়ই সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে। সেদিন থেকেই বাংলাদেশ সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা হারিয়েছে।

দু বছর বাংলাদেশের কর্তৃত্ব কার হাতে ছিল?

একথা সচেতন মহলের সবাই জানে যে, প্রেসিডেন্ট ড. ফখরুদ্দীন সরকার ও নির্বাচন কমিশনসহ সকল সরকারি শক্তি সেনাপ্রধানের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। তিনি যা করতে চেয়েছেন সবই তার হুকুমে করতে বাধ্য হয়েছেন। আত্মসম্মান বোধ থাকলে প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করতে পারতেন। সে সাহস তাঁর ছিল না। ২০০৭ ও ২০০৮ সাল বাংলাদেশে সেনাপ্রধানেরই স্বৈরশাসন চলেছে। তিনি কোথাও সংবিধানের কোনো পরওয়া করেননি। তিনি সংবিধানকে তাঁর মর্জি অনুযায়ী ব্যবহার করেছেন।

সংবিধান মেনে চললে তিনি তত্ত্বধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে সর্বশেষ প্রধান বিচারপতি জে. আর মুদাসসিরকে নিয়োগের ব্যবস্থা করতেন। একজন আমলাকে এ পদে নিয়োগের কোনো বৈধতাই ছিল না।

দু বছরের স্বৈরশাসন

ড. ফখরুদ্দীন সরকারকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নাম দিলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছিল সেনাপ্রধানের স্বৈরশাসন। সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপর যে দায়িত্ব দেওয়া আছে তা হলো, ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা ও এ সময় সরকারের দৈনন্দিনের কার্যাবলি সম্পন্ন করা। কোনো নীতিগত ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কোনো ইখতিয়ার এ সরকারের নেই।

এ সরকারের একমাত্র দায়িত্ব নির্বাচন অনুষ্ঠান। বিশুদ্ধ নতুন ভোটার তালিকা তৈরি করতে কয়েক মাস লেগে যাবে বলে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব ছিল না। কিন্তু ভোটার লিস্ট তৈরির কাজ শুরুই করা হয় আট মাস পর। এ সময় আসল কাজ বাদ দিয়ে স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্তে এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকার ব্যস্ত হয়ে যায় যা করা তাদের দায়িত্ব ছিল না। এ বিষয়ে পূর্বে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে।

ক্ষমতা হাতে পেয়ে সামরিক শক্তির দাপটে দু' বছর সেনাপ্রধানের স্বৈরশাসন চলে। সংবিধান মেনে চললে নির্বাচন সম্পন্ন করতে এক বছরের বেশি সময় লাগার কোনো কারণ নেই।

সেনাপ্রধান নিরপেক্ষ ছিলেন না

বাংলাদেশে প্রধান দুটো রাজনৈতিক শক্তি রয়েছে। এর একটি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী শক্তি। অপরটি বাঙালি জাতীয়তাবাদী শক্তি। প্রথমটি বিএনপি ও দ্বিতীয়টি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পরিচালিত। ইসলামী শক্তি প্রধান না হলেও নির্বাচনে প্রথমটির সাথে মিলে দ্বিতীয়টিকে ২০০১ সালের নির্বাচনে পরাজিত করতে সক্ষম হয়।

প্রধান দুটো রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার কথা। কারণ সংবিধান অনুযায়ী এ সরকার অরাজনৈতিক ও দল-নিরপেক্ষ। কিন্তু যিনি সরকার গঠন করেন তিনি স্বয়ং নিরপেক্ষ না থাকায় তাঁর বাছাই করা লোকও নিরপেক্ষ ছিলেন না। তিনি যাদেরকে সরকার ও নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য বাছাই করেন তাদেরকেই নিয়োগ দিতে প্রেসিডেন্টকে বাধ্য করেন।

সেনাপ্রধান ২০০৭ সালের মার্চ মাসের ২৭ তারিখে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্বর্ধনা সভায় তাঁর রাজনৈতিক পরিচয় ফাঁস করে দেন। প্রধান দুটো রাজনৈতিক ধারার মধ্যে আওয়ামী লীগের ধারার পক্ষেই তার মত প্রকাশ পায়।

এদিকে শেখ হাসিনা নবগঠিত সরকারকে তারই আন্দোলনের ফসল বলে সন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার তো আওয়ামী লীগের সাথে সংলাপকালে আবেগের সাথে শেখ হাসিনার দাবি সমর্থন করে বলেন, 'আপনারাই দেশ স্বাধীন করেছেন, দেশবাসী আপনাদেরকেই ক্ষমতায় দেখতে চায়।'

দেশে ও বিদেশে সেনাপ্রধানের রাজনৈতিক বক্তব্য থেকে স্পষ্টই বুঝা গেল যে, আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারতের ইচ্ছা মোতাবেক বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকেই নির্বাচনে তিনি বিজয়ী দেখতে চান।

সেনাবাহিনীর অপব্যবহার

ইতঃপূর্বে সেনাবাহিনী জনগণের নিকট রাজনীতি নিরপেক্ষ হিসেবেই পরিচিত ছিল। সেনাবাহিনী দেশের কোনো রাজনৈতিক ধারার পক্ষের নয়। তাঁরা দেশবাসী সকলের। কিন্তু ২০০৮ সালের নির্বাচনে সেনাপ্রধান অন্যায়ভাবে সেনাবাহিনীকে বিশেষ একটি রাজনৈতিক ধারার পক্ষে ব্যবহার করেছেন। এখানে তাঁর বিরাট গরজ ছিল।

সংবিধান লঙ্ঘন করে শক্তিবলে দেশের সরকারি ক্ষমতা দখল করে তিনি দু' বছর অসাংবিধানিক যত কিছু করেছেন নির্বাচনের পর যে সরকার গঠিত হবে তারা যদি অবৈধ সবকিছুকে বৈধতা না দেয় তাহলে তাঁর জন্য মহাবিপদ হবে। একমাত্র শেখ হাসিনাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যাবতীয় কার্যাবলিকে বৈধতা দেওয়ার নিশ্চিত আশ্বাস দিয়েছেন।

সেনাপ্রধানের গঠিত সরকার ও নির্বাচন কমিশন অপর রাজনৈতিক ধারাকে বিপর্যস্ত করার উদ্দেশ্যে বিএনপি-কে দুর্বল করার সর্বাত্মক অপচেষ্টা চালিয়েছে। তাই বিএনপি'কে ক্ষমতায় আসতে দিলে বৈধতা দেওয়ার কোনো আশা করা যায় না।

আওয়ামী মহাজোটকে বিজয়ী করার জন্য নির্বাচনে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করায় নির্বাচনে কারচুপি এত নিপুণতার সাথে করা হয়েছে যে, বাইরে থেকে তা ধরার কোনো উপায় ছিল না। আওয়ামী লীগও ধারণা করেনি যে, এত বেশি আসনে এত বিপুল ভোটে বিজয়ী হবে। সেনাপ্রধানের জন্য এ বিজয় অত্যাবশ্যক ছিল। কিন্তু এত বিরাট বিজয় প্রয়োজন ছিল না।

ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বের আস্থাভাজন সরকার

শেখ হাসিনার সরকার বিশ্বের সকল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অত্যন্ত আস্থাভাজন সরকার। বিশেষ করে এ সরকারের উপর ভারত এতটা আস্থাভাজন যে, বাংলাদেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে হলেও এ সরকার ভারতের স্বার্থ ষোলোআনা পূরণ করবে। তাই সরকার গঠনের এক মাসের মধ্যেই ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি ঢাকা সফরে আসেন। ভারতের স্বার্থ রক্ষার কয়েকটি দাবি মেনে নিয়ে বাংলাদেশ সরকার চুক্তি চূড়ান্ত করবে বলে আশা নিয়েই তিনি এসেছিলেন। করিডোর, আঞ্চলিক টাস্কফোর্স ও চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করার চুক্তি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিরোধী দল ও নিরপেক্ষ সুধী মহলের ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে চুক্তি হতে পারেনি। চুক্তির পক্ষে সরকারের আগ্রহ ও উৎসাহের অভাব ছিল না।

জনগণ এ সরকারকে দিল্লির অনুগত সরকারই মনে করে। কিন্তু জনগণ ভারতকে বন্ধুরাষ্ট্র মনে করে না। এ বিষয়ে সরকার ও জনগণের মধ্যে যে দূরত্ব রয়েছে তা কতদিন ঐসব চুক্তি ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে তা ভবিষ্যৎই বলতে পারে।

আধিপত্যের পথে বাধা

বাংলাদেশের উপর ভারতের আধিপত্যের পথে এখন আরো দুটো প্রবল বাধা রয়েছে। সরকার যতই অনুকূল হোক, জনমত ও প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রবল বিরোধী হলে আধিপত্য স্থায়ী হতে পারে না।

জনমতের বাধা দূর করার যোগ্যতা ভারতের নেই। কারণ সৎ প্রতিবেশীর মতো আচরণ করা তাদের ঐতিহ্যে অনুপস্থিত। নিজের স্বার্থ সামান্যও ত্যাগ করতে অভ্যস্ত নয়। তাই বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে ভারতকে বন্ধু মনে করার আশা করা যায় না।

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়েই ভারতবিরোধী। প্রতিরক্ষা বাহিনী এ বিষয়ে সচেতন যে, যদি কোনো সময় বাংলাদেশের উপর হামলা হয় তাহলে তা প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকেই হয়ে থাকে। আর বৃহত্তর প্রতিবেশী হিসেবে ভারত থেকেই হামলার আশঙ্কা রয়েছে। কার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা– এ প্রশ্নের জবাব একটাই। তাই প্রতিরক্ষা বাহিনীর পক্ষে ভারতকে স্থায়ী বন্ধু মনে করা স্বাভাবিক নয়। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাই ভারতের আধিপত্যের পথে প্রধান বাধা।

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী

সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তির ২০০৭ ও ২০০৮ সালের দু' বছরে সর্বাত্মক ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টার ফলে নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক শক্তিকে ক্ষমতাসীন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা শক্তি স্বস্থানে বহাল থাকলে তাদের আসল উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না বলে অত্যন্ত সুচতুর কৌশলে ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারিতে বিডিআর বিদ্রোহের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা বাহিনীকে বিপর্যস্ত করতে সফল হয়।

সীমান্ত প্রহরায় নিযুক্ত বাংলাদেশ রাইফেলস-এর (বিডিআর) গোয়েন্দা বিভাগকে ভারতের 'র' নামক কুখ্যাত গোয়োন্দা সংস্থা বিভ্রান্ত করে নেয়। বিডিআর কর্মকর্তা ও সিপাহীরা সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা ও সৈনিকদের তুলনায় কম বেতন-ভাতা পাওয়ায় এবং তাদের উপর সেনা কর্মকর্তারা নেতৃত্ব দেওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই কিছু ক্ষোভ থাকার কথা। এ ক্ষোভটুকুকে পুঁজি করে 'র' বিডিআর গোয়েন্দাদের মধ্যে বিদ্রোহের উসকানি দেওয়ার সুযোগ পায়। তাদেরকে ক্ষিপ্ত করার জন্য বুঝায় যে, সীমান্ত প্রহরা তো তোমরাই দিচ্ছ। তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অফিসার রয়েছে। তাদের মধ্য থেকেই চূড়ান্ত নেতৃত্ব পর্যন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা যায়। সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদেরকে তোমাদের উপর মাতব্বরি করার কী প্রয়োজন রয়েছে। তদুপরি আসল দায়িত্ব তোমরা পালন করে থাক, অথচ তোমাদের সুযোগ-সুবিধা সেনাবাহিনী থেকে কম হওয়া অত্যন্ত অন্যায়। এভাবেই তাদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

বিডিআর বাহিনীর মধ্যে কোনো ক্ষোভ থাকলে তা তাদের গোয়েন্দাদেরই উপরে রিপোর্ট দেওয়ার কথা। তারাই যদি বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয় তাহলে গোয়েন্দাবৃত্তির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হয়। বিডিআর-এর গোয়েন্দা বাহিনী বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা পালন করার কারণেই বিদ্রোহ সফল হয়। এ বিদ্রোহের পরিণতিতে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল। এটাই 'র' চেয়েছিল। জেনারেল থেকে ক্যাপটেন পর্যন্ত ৫৭ জন উচ্চ পদস্থ সামরিক কর্তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে দেওয়া হলো।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান হাল

বাংলাদেশের সীমান্তে বিডিআরই অতন্দ্র প্রহরীর দায়িত্ব পালন করেছে। সেনা কর্মকর্তারা অবশ্যই তাদের নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেছে। সেনাবাহিনী ও বিডিআর পরস্পর আস্থাশীল থাকারই কথা। কিন্তু বিডিআর বিদ্রোহে সেনা কর্মকর্তাদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করার পর সে আস্থা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। সীমান্তে এখনো যেসব বিডিআর জোয়ানরা কর্মরত আছে তাদের মধ্য থেকে বিদ্রোহের আড়াই মাস পরও অনেকে গ্রেফতার হওয়ায় বুঝা গেল যে, আস্থা ফিরে আসেনি।

সীমান্ত অবশ্য সম্পূর্ণ অরক্ষিত বলা যায় না; কিন্তু বিডিআর যেভাবে চোরাচালান, পুশ ইন ও অনুপ্রেবেশ প্রতিরোধ করত, তা যে আগের মতো হচ্ছে না এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বিদ্রোহের তদন্ত

বিডিআর বিদ্রোহ সম্পর্কে তিনটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। একটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দ্বারা গঠিত, একটি সেনাবাহিনী কর্তৃক গঠিত, আর একটি সিআইডি পরিচালিত। ঘটনার আড়াই মাস পর সেনাবাহিনী কর্তৃক গঠিত কমিটি সেনাপ্রধানের নিকট রিপোর্ট জমা দিয়েছে। এ রিপোর্ট সরকারের নিকট হস্তান্তর করা হয়নি। পত্রিকায় এর যেটুকু প্রকাশিত হয়েছে এর কঠোর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দুজন মন্ত্রী প্রকাশ করার পর সেনাপ্রধান মন্তব্য করেছেন যে, এ রিপোর্ট একান্ত সেনাবাহিনীর। এটা সরকারকে দেওয়া হবে কি না সে সিদ্ধান্ত এখনো হয়নি। এ রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না তা অনিশ্চিত।

ঘটনার তিন মাস পর সরকারি কমিটির রিপোর্ট আংশিক প্রকাশ করা হয়েছে। এতে কারা বিদ্রোহের পরিকল্পনা করল, বিদেশি কোনো শক্তি এর সাথে জড়িত কি না– এ বিষয়টি আরো তদন্ত সাপেক্ষ। এতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, রিপোর্টটি অসমাপ্ত। এ অসমাপ্ত রিপোর্টটিও পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়নি।

নিরপেক্ষ তদন্ত হয়নি

সরকার তদন্তকারীদেরকে স্বাধীনভাবে তদন্ত করতেই দেয়নি। বিডিআর বিদ্রোহের পরিকল্পনা কারা করেছে, কোনো বিদেশি মহল এর সাথে জড়িত ছিল কি না এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের কেউ এতে সংশ্লিষ্ট ছিল কি না এসব পয়েন্ট সম্পর্কে তদন্ত করার কোনো ইখতিয়ার তদন্ত কমিটিসমূহকে দেওয়াই হয়নি। সামরিক বাহিনী নিজস্ব উদ্যোগে যে তদন্ত কমিটি করেছিল তাদের রিপোর্টের কিছু খবর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলে আওয়ামী লীগ নেতাদের প্রতিবাদে সে রিপোর্ট প্রকাশিত হতেই দেওয়া হয়নি।

পত্র-পত্রিকায় ব্যাপক আলোচনা হয়েছে যে, আওয়ামী লীগ নেতা জাহাঙ্গীর কবির নানক এমপি, মির্জা আযম এমপি ও ব্যারিস্টার ফযলে নূর তাপস এমপি'র সাথে বিদ্রোহীদের উদ্যোক্তারা যোগাযোগ করেছিল। বিদ্রোহের সময়ও এ নেতাদের মাধ্যমেই বিদ্রোহীরা প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছিল; কিন্তু তদন্ত কমিটিকে এ নেতাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার ইখতিয়ার দেওয়া হয়নি। এতে প্রমাণিত হয় যে, তদন্ত অসম্পূর্ণই রয়ে গেছে। সরকারি তদন্ত কমিটিও রিপোর্টে উল্লেখ করেছে যে, আরো তদন্ত প্রয়োজন। এ বিদ্রোহের সাথে ভারতের গোয়েন্দা বিভাগ জড়িত কি না এবং আওয়ামী লীগের কতক নেতা বিদ্রোহীদের সাথে কোনোভাবে জড়িত ছিলেন কি না– এসব বিষয় সম্পর্কে জনগণকে কিছুই জানতে দেওয়া হয়নি।

৫৭ জন সেনাকর্মকর্তা হত্যার মতো বিরাট মর্মান্তিক ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের জন্য নিরপেক্ষ তদন্ত অত্যন্ত জরুরি ছিল। ফলে তদন্তের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে গেল। বিদ্রোহের যে উদ্দেশ্য আধিপত্যবাদীদের ছিল তা সফল হলো। এতে সরকারও সন্তুষ্ট হলো।

সেনাকর্মকর্তাদের চরম বিক্ষোভ

বিদ্রোহের প্রথম দিকেই বিডিআর-এর ডিজি মেজর জেনারেল শাকিল আহমদকে হত্যা করা হয়। পিলখানায় বন্দী সেনাকর্মকর্তরা মোবাইলে বাইরে খবর পাঠানো সত্ত্বেও তাদেরকে রক্ষা করার জন্য সেনাপ্রধান কোনো ব্যবস্থা না করায় এতগুলো চৌকস ও জেনারেল হওয়ার যোগ্য সেনাকর্মকর্তা নির্মমভাবে নিহত হওয়ায় গোটা সেনাবাহিনী, বিশেষ করে সেনাকর্মকর্তারা চরমভাবে বিক্ষুব্ধ হন।

সেনাবাহিনী বিদ্রোহ দমন করার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং যথাসময় পিলখানা এলাকায় পৌঁছেছিল। এ পরিস্থিতিতে সেনাপ্রধান নিজেই নির্দেশ দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি না পাওয়ায় নির্দেশ দেননি। সাবেক সেনাপ্রধান এরশাদ বিবৃতি দিলেন যে, সেনাবাহিনীকে অনুমতি দিলে বিশ মিনিটের মধ্যে বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব ছিল।

প্রধানমন্ত্রী সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন করার জন্য রাজনৈতিক সমাধানের বাহানা করে বিদ্রোহীদেরকে পূর্ণ দুদিন সেনাকর্মকর্তাদেরকে হত্যা করার পূর্ণ সুযোগ করে দিলেন।

আওয়ামী লীগ নেতা নানক ও আযম ১৪ জনকে বিদ্রোহীদের প্রতিনিধি হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে নিয়ে গেলেন। তারা বিদ্রোহ বন্ধ করার ওয়াদা করলে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো। এ ১৪ জনের ফটো ও তালিকা সংরক্ষণ করা হলো না কেন তাও এক বিস্ময়ের ব্যাপার। ওয়াদা পালন না করার জন্য তাদেরকে দায়ী করার সুযোগও সরকার পেল না।

সেনাকুঞ্জে বিক্ষোভ প্রদর্শন

সেনানিবাসে অবস্থানরত সেনাকমকর্তাদেরকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে সেনাপ্রধান তাদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। সেখানে প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপ্রধানের সম্মুখে সেনাকর্মকর্তাদের হত্যার বিরুদ্ধে অত্যন্ত তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়। সেনাবাহিনীকে বিদ্রোহ দমনের অনুমতি না দেওয়ার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। এর শাস্তিস্বরূপ বেশ কিছু কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়। অনেককে দূরে দূরে বদলি করা হয়, যাতে তারা জোট বেঁধে কিছু করতে না পারে। ঐ বিক্ষোভের অডিও ক্যাসেট প্রকাশিত হওয়ায় অনেকেই তা জানতে পেরেছে।

বিডিআর পুনর্গঠন

সীমান্ত প্রহরার গৌরবময় ভূমিকা পালনের মাধ্যমে বিডিআর যে বিরাট খ্যাতি অর্জন করেছিল তা ধুলায় মিশে গেল। পুনর্গঠনের নামে বিডিআর নাম বদলে দিলে ইতিহাস থেকে ঐ গৌরবও মুছে যাবে। বিডিআর জনগণের যে আস্থা অর্জন করেছিল, পুনর্গঠনের পর সে আস্থা ফিরে পেতে কতদিন লাগবে তা বলা যায় না। সীমান্ত যথাযথ রক্ষিত হচ্ছে না বলে অস্ত্র, মাদক ও অবৈধ পণ্য ব্যাপকভাবে পাচার হয়ে দেশে ঢুকছে। এটা দেশের জন্য মারাত্মক হুমকি। বিডিআর-এর বিদ্রোহীদের বিচার সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে পুনর্গঠন সম্ভব নয় বলে সরকার ঘোষণা করেছে। তাই সীমান্ত কতদিন পর্যন্ত অরক্ষিত থাকবে তা অনিশ্চিত।

সশস্ত্র বাহিনী ও বিডিআর-এর মধ্যে যে চমৎকার সমন্বয় ছিল, পুনর্গঠিত বাহিনীর সাথে ঐ সম্পর্ক কতদিনে গড়ে তোলা যাবে তাও অনিশ্চিত। তাই একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, বিডিআর বিদ্রোহের পূর্বে আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনী যেমন শক্তিশালী ছিল, ঐ অবস্থান অর্জন করা সহজ হবে না। আমরা বর্তমানে অনেক দুর্বল। প্রতিবেশী দেশ বার্মা আমাদের সাথে সমুদ্রসীমা নিয়ে পূর্বে কখনো আক্রমণাত্মক আচরণ করার সাহস দেখায়নি, বিদ্রোহের পর যেমন দেখিয়েছে।

৩৬৩.

শেখ হাসিনার দ্বিতীয় দুঃশাসন

১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত শেখ হাসিনার দুঃশাসনের পাঁচ বছর সম্পর্কে ইতঃপূর্বে লিখেছি। তিনি দেশের কী কী সর্বনাশ করেছেন এর বিবরণ দিয়েছি। ২০০৯ সালে তিনি আবার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সর্বনাশের পূর্ণতা দানের জন্য যা যা করণীয় তা করে চলেছেন।

কিভাবে ক্ষমতায় এলেন?

২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমান সংখ্যক ভোট পাওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ মাত্র ৫৯টি আসনে বিজয়ী হয়। কারণ, ইসলামী দলগুলোর সকল ভোট বিএনপি পেয়েছে। ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে বিএনপি ও ইসলামী দলগুলো জোটবদ্ধ থাকায় আওয়ামী লীগের বিজয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই জেনেই শেখ হাসিনা তাঁর মহাজোট নিয়ে নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেন।

২০০১ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত চারদলীয় জোট সরকারে জামায়াতে ইসলামীর দুজন মন্ত্রীর সততা ও যোগ্যতা দেখে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বিশ্বশক্তি (আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারত) ২০০৭-এর নির্বাচনে ইসলামী শক্তির অগ্রগতির আশঙ্কা করে। শেখ হাসিনা নির্বাচন বর্জন করে ঐসব বিদেশি শক্তিকে নির্বাচন বানচাল করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালনের পরিবেশ সৃষ্টি করে। আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানি, ভারত, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতগণ নির্বাচন বর্জনকারীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ ছাড়া নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না বলে হৈচৈ শুরু করেন। শেখ হাসিনা তাঁর দলের ক্যাডারদেরকে লাঠি-লগি-বৈঠা নিয়ে হত্যা-সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এবং বারবার অবরোধের নামে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে নির্বাচন বানচাল করার হুমকি দেন।

সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মঈন উ আহমদ প্রেসিডেন্টকে জরুরি অবস্থা জারি করতে বাধ্য করে জানুয়ারির ১ তারিখে ১১ দিন পর অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন বন্ধ করার ব্যবস্থা করেন। সংবিধানের পরওয়া না করে প্রেসিডেন্টকে দিয়ে সেনাপ্রধানের বাছাই করা কতক আমলাকে নিয়ে সরকার ও নির্বাচন কমিশন গঠন করেন। এ সরকার দু বছর স্বৈরশাসন পরিচালনাকালে বিএনপিকে তছনছ করে এমন দুর্বল করেন, যাতে আর ক্ষমতায় আসতে না পারে।

শেখ হাসিনা এ অসাংবিধানিক সরকারকে তাঁর আন্দোলনের ফসল বলে ঘোষণা করেন, সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে উৎসাহের সাথে যোগদান করেন এবং এ সরকারের সকল অবৈধ কার্যাবলিকে বৈধতা দানের নিশ্চয়তা দেন।

নির্বাচন কমিশন প্রকাশ্যে এ সরকারের আজ্ঞাবহের ভূমিকা পালন করেন। ফলে সেনাপ্রধানের ইচ্ছাপূরণ করে সরকার ও নির্বাচন কমিশন শেখ হাসিনার মহাজোটকে জাতীয় সংসদে চার-পঞ্চমাংশ সংখ্যক আসনে বিজয়ী করার ব্যবস্থা করেন। জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তি বিজয়ী হলে অসাংবিধানিক সরকারের অবৈধ কার্যাবলিকে স্বীকৃতি না দিয়ে তাদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে বলে তাদের আশঙ্কা করাই স্বাভাবিক ছিল।

ক্ষমতাসীন শেখ হাসিনার ভূমিকা

জনগণের সমর্থন ও ভোট পাওয়ার জন্য নির্বাচনী ইশতেহারে শেখ হাসিনা যেসব ওয়াদা করেছিলেন এবং নির্বাচনী প্রচারাভিযানে যেসব অবাস্তব সস্তা ওয়াদা করেছিলেন, সেসব ওয়াদা পূরণ করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়াই প্রধান কর্তব্য ছিল। ১০ টাকা কেজি চাল, বিনামূল্যে সার, প্রতি পরিবারে একজনকে চাকরি দেওয়ার ওয়াদা পূরণ করার চেষ্টা তো দূরের কথা, এসব ওয়াদা করার কথা এখন তিনি অস্বীকার করছেন।

ক্ষমতাসীন হওয়ার পর শেখ হাসিনার সরকার দেশে ভারতের আধিপত্য কায়েমের প্রয়োজনে ভারত যত কিছু দাবি করছে সবই উৎসাহের সাথে দিয়ে যাচ্ছে। এ দেশে যে ইসলামী শক্তি রয়েছে তাকে দমন করে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কায়েম করার প্রয়োজনেই দেশের সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিতেও আওয়ামী লীগের আপত্তি নেই।

আওয়ামী লীগ দেশ গড়ার নয়, ভাঙারই যোগ্য

আওয়ামী লীগের দেশ শাসনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দেশ গড়ার কোনো যোগ্যতাই দান করেননি। সবকিছু ভেঙে-চুরে সর্বনাশ করার যাবতীয় গুণাবলিই তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে দান করেছেন।

২০০৯ সালের জানুয়ারিতে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে তাদের আচরণ থেকে মনে হয় তারাই দেশটির মালিক। তাদের যা ইচ্ছা তা-ই করার অধিকার রয়েছে। সর্বত্র তাদের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব কায়েম হতে হবে। তারা নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন। তাই যার তাদের বিরোধী তাদের কোথাও কোনো অধিকার নেই। বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের উপর যুলুম-নির্যাতন করা, এমনকি হত্যা করার অধিকারও তাদের রয়েছে।

কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে একমাত্র ছাত্রলীগের একচেটিয়া কর্তৃত্ব কায়েম থাকবে; অন্য কোনো ছাত্র সংগঠন সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবে না। তারা যাদেরকে ভর্তি হওয়ার অনুমতি দেবে শুধু তারাই ভর্তি হতে পারবে। ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে চাঁদা আদায় করার অধিকারও তাদের আছে। হল ও হোস্টেলে থাকতে হলে তাদের অনুগত হয়ে থাকতে হবে।

সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের একক কর্তৃত্ব কায়েমের পর ছাত্রলীগের দু গ্রুপের মধ্যে সর্বত্র মারামারি সংঘটিত হচ্ছে। চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজির প্রতিযোগিতায় এ দ্বন্দ্ব চলে। তাদেরকে দমন করার কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না বলে অবাধে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ অনুপস্থিত।

সরকার ছাত্রলীগের সোনার ছেলেদেরকে স্বেচ্ছাচারী করার লাইসেন্স দিয়ে রেখেছে। কিন্তু ইসলামী ছাত্রশিবিরের জন্য বরাদ্দ হলের সিট নিয়ে ছাত্রলীগের সাথে বিরোধের ফলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের একজন নিহত হওয়ার জের ধরে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হেলিকপ্টারে যেয়ে হুঙ্কার দিয়ে পুলিশ বাহিনীকে সারা দেশে শিবিরের বিরুদ্ধে চিরুনি অভিযান চালানোর নির্দেশ দিলেন। হত্যার তদন্ত করে দোষীর বিচারের ব্যবস্থা করলে কারো আপত্তির সুযোগ থাকে না। কিন্তু সারা দেশে শত শত ছাত্র, এমনকি রাজশাহীর অনেক জামায়াত নেতাকেও অন্যায়ভাবে জেলে আটক করে রেখেছে। প্রবীন শিক্ষাবিদ জেলা আমীর আতাউর রহমানকেও রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে। শিবিরের অনেককেই রিমান্ডে নিয়ে মিথ্যা স্বীকৃতি আদায়ের মতো অমানুষিক অন্যায় করা হচ্ছে।

আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের যারা যেখানে যা দখল করতে চায়, তাদেরকে পুলিশ বাধা দেওয়ার সাহস পায় না। তারা কোনো নির্দোষ নিরীহ ছাত্রকে শিবির করার অপরাধে মারধোর করে পুলিশের হাতে তুলে দিলে পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করে। এভাবে সারা দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রশাসনে মেধা ও যোগ্যতা মূল্যহীন

প্রশাসনের কর্মকর্তাগণকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরিচালনায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধা ও যোগ্যতার মাপকাঠিতে যাচাই করে নিয়োগ দেওয়া হয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার জনগণের ম্যান্ডেট পাওয়ায় তা বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক দলীয় সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে পরিবর্তন হতে পারে। এসব স্থায়ী নয়। প্রশাসনিক কর্মকর্তরাই স্থায়ী। তারা কোনো দলের নয়। তারা নিরপেক্ষভাবে

কাজ করবে। দলীয় আনুগত্য প্রদর্শন করা তাদের উচিত নয়। তারা অবশ্যই সরকারের আনুগত্য করবে। তাদের দলীয় আনুগত্য প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই। জনগণের ম্যান্ডেট অনুযায়ী নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন করে তারা পাবলিক সার্ভেন্টের দায়িত্ব পালন করবেন– এটাই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

শেখ হাসিনা সরকার এবার ক্ষমতাসীন হয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সাথে যে আচরণ করেছে, এতটা ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদেও করেনি। বারবার যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। দলীয় আনুগত্য নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কারো প্রতি আস্থা স্থাপন করতে পারছে না। ফলে প্রশাসনে মেধা, যোগ্যতা, সততা, অভিজ্ঞতার কোনো মূল্য নেই। দলীয় আনুগত্যই আস্থার একমাত্র মাপকাঠি। পরিণামে প্রশাসনে দক্ষতা হ্রাস পাচ্ছে। সাহারা প্রধানমন্ত্রীর আস্থাভাজন হওয়ায় নিজেদেরকে মন্ত্রী পর্যায়ের মনে করে এবং মন্ত্রীরাও তাদের প্রতি দাপট দেখাতে পারে না। এর ফলে প্রশাসনে ঢিলা-ঢালা ভাব চলছে। প্রশাসনে এ নতুন ঐতিহ্য চালু হওয়ায় সচিবালয়ের সুস্থ পরিবেশ ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

পরবর্তী নির্বাচনে অন্য কোনো দল ক্ষমতাসীন হলে তারা এ প্রশাসন নিয়ে বিপাকে পড়বে। আওয়ামী লীগের দলীয় প্রশাসনের উপর তারা কেমন করে আস্থা রাখবেন? তাদের থেকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের আশা করা যায় না। এ অবস্থায় নতুন সরকার কী করবে? হাসিনা সরকার প্রশাসনে দলীয়করণ করে এমন সমস্যা সৃষ্টি করলেন, যা যোগ্য প্রশাসন থেকে দেশকে বঞ্চিত করবে। নতুন সরকার প্রশাসনের প্রতি আস্থা স্থাপনও করতে পারবে না, হঠাৎ করে বিকল্প প্রশাসনও গড়তে পারবে না।

প্রশাসনকে দল-নিরপেক্ষ থাকতে দেওয়াই গণতন্ত্রের ঐতিহ্য। শেখ হাসিনা ঐ ঐতিহ্য ধ্বংস করে বাংলাদেশের যে সর্বনাশ করলেন, এর প্রতিকার করা সহজসাধ্য নয়। ভবিষ্যৎ সরকারের জন্য এটা মহাসংকট সৃষ্টি করবে।

সর্বোচ্চ আদালতে পর্যন্ত দলীয়করণ

সর্বোচ্চ আদালত যেকোনো দেশে নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের সর্বশেষ আশ্রয়। সকল বিচারককেই রাজনীতি নিরপেক্ষ, বিশেষ করে দলনিরপেক্ষ হওয়া অত্যাবশ্যক। কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব না করে আইনের ভিত্তিতে মামলার ন্যায়সঙ্গত রায় প্রদান করা প্রত্যেক বিচারকের নৈতিক দায়িত্ব। নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্যই আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়ে থাকে।

নিম্ন আদালতে তো সরকারের চাপ পূর্ব থেকেই চালু আছে। জেনারেল মঈন-ফখরুদ্দীনের অসাংবিধানিক সরকারের সময় হাই কোর্টকেও সরকারের আজ্ঞাবহ

করা হয়। ঐ ধারা এখনো অব্যাহত আছে। অথচ আইনগতভাবে বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে স্বাধীন বলে স্বীকৃত।

সরকারি সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা এটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম হাইকোর্টের বিচারপতিদের উপর এমন চাপ প্রয়োগ করেন যে, জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদকে এক মামলায় বিচারপতি বললেন, 'আমাদের হাত-পা বাঁধা, আপনারা আল্লাহর আদালতে যান'।

হাইকোর্টের অপর একটি মামলায় জামিন না দেওয়ার জন্য এটর্নি জেনারেল এমন চাপ সৃষ্টি করেন যে, বিরক্তি প্রকাশ করে বিচারপতি বলেন, 'এসব আদালত উঠিয়ে দিন, আমাদেরকেও রিমান্ডে নিয়ে যান'।

বিচারপতি নিয়োগের জন্য সুপ্রিমকোর্টে কমপক্ষে ১০ বছর আইনজীবী হিসেবে দায়িত্ব পালনের শর্ত রয়েছে। পূর্বে সরকারি দলের সমর্থকদেরকেই নিয়োগ দেওয়া হতো। বর্তমান সরকার দলের পদাধিকারী সংগঠকদেরকেও নিয়োগ দিয়েছে। এমনকি খুনের মামলায় চার্জসিটভুক্ত এক নম্বর আসামি প্রধান বিচারপতির অফিসে হামলার অপরাধে ফৌজদারি মামলার আসামিকেও নিয়োগ দেওয়া হয়। সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশন আপত্তি করায় প্রধান বিচারপতি এ দুজনকে শপথ নেওয়ার সুযোগ দেননি। সরকার এ নিয়োগ বাতিল না করে প্রধান বিচারপতির উপর শপথ নেওয়ার জন্য চাপ দিয়ে চলেছে। এখন পর্যন্ত (মে, ২০১০) প্রধান বিচারপতি নতি স্বীকার করেননি।

কেউ মামলার চার্জসিটভুক্ত আসামি হলে আদালতে বিচারের মাধ্যমে ফায়সালা হয়ে থাকে যে, আসামি দোষী সাব্যস্ত হয় কি না। কিন্তু সরকার কোনো আসামিকে মামলা থেকে অব্যাহতি দিতে পারে না। বর্তমান হাসিনা সরকার এ রকম আসামিদেরকেও বিচারপতি নিয়োগ দিল।

এ জাতীয় দলীয় ক্যাডারভুক্ত বিচারপতিরা কোনো রাজনৈতিক মামলায় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে রায় দেবেন না। তারা নিরপেক্ষ হয়ে বিচার করবেন না। এ জাতীয় বিচারকগণ রাজনৈতিক মামলায় পক্ষপাতিত্ব করার ফলে তাদের যে নৈতিক অধঃপতন হবে তা অন্যান্য মামলায়ও প্রতিফলিত হবে। এমনকি তাদের মধ্যে ঘুষের প্রবণতাও সৃষ্টি হতে পারে।

বিচারপতিগণকে দলীয়করণের মাধ্যমে সরকার বাংলাদেশের যে বিরাট সর্বনাশ করেছে, এর পরিণাম অত্যন্ত মারাত্মক। জনগণের মানবাধিকার স্থায়ীভাবে বিপন্ন হয়ে গেল। সরকারের যুলুম থেকে আত্মরক্ষার শেষ আশ্রয়টুকুও কেড়ে নেওয়া হলো।

জাতীয় সংসদ মল্লযুদ্ধের আখড়া

জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের শুরুতেই বিরোধী দল উপস্থিত ছিল। বিরোধী দলকে আসন বন্টনে সম্মানজনক আচরণ না করায় এবং আরো কয়েকটি কারণে বিরোধী দল সংসদে অধিবেশন বর্জন করতে বাধ্য হয়। বিরোধী দলের দাবি না মানা সত্ত্বেও গণতন্ত্রের দাবি পূরণের উদ্দেশ্যে তারা সংসদে গেলেন।

সরকারি দল গায়েপড়ে ঝগড়া বাঁধানোর আয়োজন করলে জাতীয় সংসদ মল্লযুদ্ধের আখড়ায় পরিণত হয়। কোনো সভ্য দেশের ইতিহাসে এর নজির নেই। স্পিকার বিরক্ত হয়ে উভয়পক্ষকে পল্টন ময়দানে গিয়ে কুস্তি লড়তে বললেন।

জাতীয় সংসদে জনগণের সমস্যা নিয়ে কোনো বিতর্ক হয় না। ভারতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী কী চুক্তি করলেন, সে বিষয়ে আলোচনা হয়নি। দেশের উন্নয়নের জন্য করণীয় সম্পর্কে মতামত প্রকাশের প্রবণতা দেখা যায় না। অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ ভাষায় গালাগালি হয়। আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদকে যে নিম্ন মানে নামিয়েছে, তা দেশের জন্য কলঙ্কজনক।

সরকারি দলের এমপিগণ জননেতা হিসেবে জাতীয় সংসদে যে ভূমিকা পালন করছেন তা জনগণ বিশেষ করে শিক্ষিত মহল চরম লজ্জাবোধ করছে। নতুন প্রজন্ম তাদের থেকে কী শিক্ষা পাচ্ছে?

শেখ হাসিনার দুঃশাসনে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ

শেখ হাসিনা সরকার যা করছেন, তাতে কোনো দিক দিয়েই দেশের কল্যাণ ও উন্নয়নের সামান্য আশাও করা যায়নি। তাঁর আমলে ছাত্রলীগের মাধ্যমে যে উচ্ছৃঙ্খল নেতৃত্ব গড়ে উঠছে, তা দেশের অধঃপতনই নিশ্চিত করবে। গোটা শিক্ষাঙ্গনে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে, এর ফল মারাত্মক হতে বাধ্য। সরকারের নির্বাহী বিভাগ স্বেচ্ছাচারীদের হাতে। পুলিশ বিভাগ সরকারি সন্ত্রাসীদের দোসর। বিচার বিভাগ সরকারের আজ্ঞাবহ। নির্বাচন কমিশন সরকারের অনুগত।

দেশে আইনের শাসন, সুশাসন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার দুয়ার বন্ধ হয়ে গেল। ভারতের আধিপত্য যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে ভবিষ্যতে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হতে বাধ্য। বাংলাদেশ ইসলামাবাদের আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে এখন দিল্লির আধিপত্য মেনে নিয়েছে। আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা অব্যাহত থাকলে এ আধিপত্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে এবং শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রও বিপন্ন হয়ে পড়বে।

৩৬৪.

'জীবনে যা দেখলাম'-এর সমাপনী বক্তব্য

'জীবনে যা দেখলাম' নামে আমার আত্মজীবনী ২০০১ সালের জানুয়ারি মাসে লেখা শুরু করি। আজ ২০১০ সালের মে মাসের ১৯ তারিখে সমাপনী বক্তব্য লেখা শুরু করেছি। অর্থাৎ ২০১০ সালের মে মাসে আত্মজীবনী লেখা সমাপ্ত হয়।

২০০৯ সালের এপ্রিলে অষ্টম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এ লেখাটি নিয়ে নবম খণ্ড প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এর মাধ্যমেই আত্মজীবনী লেখা সমাপ্ত হচ্ছে।

প্রত্যেক খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঐ খণ্ডটিতে কোন সাল থেকে কোন সালের ঘটনাবলি লেখা হয়েছে। নবম খণ্ডে লেখা হলো যে, এ খণ্ডটি ১৯৯৬ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ঘটনাবলির বিবরণ রয়েছে। নয় খণ্ডে সমাপ্ত এ আত্মজীবনী ২০০১ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে রচিত হয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ২০০১ থেকে ২০১০ পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত ঘটনাবলি কি লেখা হবে না? এ দশ বছরে যখন অতীতের ঘটনাবলি লেখা হয় তখন চলতি সময়ের ঘটনাবলি লেখা জরুরি মনে করি। সে হিসেবে এ দশ বছরের ঘটনাবলিও লেখা হয়ে গেল।

প্রতিটি খণ্ডে উল্লেখিত সময়ের অতীত ঘটনাবলি আলোচনার সাথে সাথে লেখার সময়ে সংঘটিত তাজা ঘটনাবলি সম্পর্কেও লেখা হয়েছে। তাই ২০০১ থেকে ২০১০ পর্যন্ত সময়ের ঘটনাবলি আবার লেখার প্রয়োজন নেই।

আমার দেখা ঘটনাবলিই এ আত্মজীবনীর প্রধান উপাদান। কিন্তু যেহেতু এটা আত্মজীবনী, সেহেতু আমার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অনেক ঘটনা এতে শামিল হয়ে গেছে। আমি প্রকাশককে পরামর্শ দিয়েছি, যেন আমার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ঘটনাবলি সমগ্র লেখা থেকে পৃথক করে সংকলিত করা হয়। সাধারণ পাঠকের নিকট এসব অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে।

এ সংকলনটি ১০ম খণ্ড হিসেবে গণ্য হতে পারে। এভাবে 'জীবনে যা দেখলাম' সর্বমোট দশম খণ্ডে সমাপ্ত বলে বলা যাবে।

আমার লেখা অব্যাহত নেই

২০০০ সালের ডিসেম্বরে জামায়াতে ইসলামীর আমীরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করার পর থেকেই লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করি। বলতে গেলে, লেখার

প্রয়োজনেই অনেক চেষ্টা করে আন্দোলন ও সংগঠনের সাথীদেরকে বুঝাতে সক্ষম হই যে, আমাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত।

আল্লাহর রহমতে ২০০১ সালের জানুয়ারি থেকেই লেখা শুরু করি। যা লেখা প্রয়োজন মনে করেছি সবই লেখা সম্পন্ন হয়েছে। আল হামদুলিল্লাহ, বইয়ের সংখ্যা শ' খানিকেরও বেশি। অবশ্য ৭৫টিই চটি বই। এর মধ্যে ২৫টি রাজনৈতিক বিষয়ে লেখা।

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের অবিশ্বাস্য, অসম্ভব ও রহস্যজনক ফলাফলে আধিপত্যবাদী শক্তির দালালদের হাতে দেশের পূর্ণ ক্ষমতা চলে গেল। আমাদের সশস্ত্রবাহিনী ও বিডিআর বাহিনী নিয়ে গঠিত প্রতিরক্ষা বাহিনী আধিপত্য বিরোধী শক্তি হিসেবে গণ্য। তাই আধিপত্যবাদীরা এ শক্তিকে পঙ্গু করে নিরাপদে আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিডিআর বিদ্রোহ ঘটিয়ে সেনাবাহিনীর ৫৭ জন চৌকস উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে হত্যা করে। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক প্রতিরক্ষা বাহিনী দুর্বল হওয়ায় দেশের সীমান্ত অরক্ষিত হয়ে গেল। দেশ দিল্লির বাজারে পরিণত হলো।

নির্বাচনী ফলাফল ও বিডিআর বিদ্রোহের পর দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার মনে চরম হতাশার সৃষ্টি হলো। সারা জীবন যে দেশটিকে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করলাম এর ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলে আশঙ্কা হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে আমার কলম স্তব্ধ হয়ে গেছে। ২০০৯ সালে মাত্র দুটো চটি বই লেখা হয়েছে।

দেশের জন্য শুধু দু'আ করছি

২০০৯ সালের নভেম্বরে আমার বয়স ৮৭ পূর্ণ হলো। এ বয়সে নতুন কোনো কর্মসূচি নিয়ে ময়দানে নেমে কিছু করার হিম্মত পাচ্ছি না। কিন্তু আল্লাহ থেকে তো নিরাশ হওয়া চলে না। তাই তাঁরই দুয়ারে ধরনা দিয়ে আছি।

বাংলাদেশে কোটি কোটি মানুষ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, আল্লাহর রাসূল (স)-কে ভালোবাসে এবং কুরআনকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। দু'আ করছি, আল্লাহ তাআলা যেন বেদীনদের শাসন থেকে তাদেরকে উদ্ধার করেন। সকল আলেম ও ইসলামী সংগঠনকে যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে দীন বিজয়ী করার চেষ্টা করার তাওফীক দান করেন।

বাংলাদেশে ইসলামের বিরাট শক্তি রয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এ শক্তি বিচ্ছিন্ন থাকায় যথার্থ ভূমিকা পালনে অক্ষম। ১৯৭৮ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত ২০ বছর ইসলামী ঐক্যের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। এ বিষয়ে 'বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টার ইতিহাস' শিরোনামে একটি বই লিখেছি।

বায়তুল মুকাররম মসজিদের খতীব মরহুম মাওলানা ওবায়দুল হকের নেতৃত্বে 'জাতীয় শরী'আ কাউন্সিল' নামে একটি সংগঠনের মাধ্যমে ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর এ প্রচেষ্টাও বন্ধ হয়ে গেছে।

আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, ১০/১২ জন নেতৃস্থানীয় আলেম এক মঞ্চে আসলেই ইসলামী ঐক্য হয়ে যায়। তাদের কয়েকজনের কারণেই ঐক্য সৃষ্টি হচ্ছে না। তাদের কেউ কেউ এমন আছেন, যারা প্রধান নেতৃত্বে নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কারো নেতৃত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত নন। কেউ কেউ এমন আছেন, যারা ঐক্যমঞ্চে জামায়াতে ইসলামীকে শরীক করতে সম্মত নন। মরহুম মাওলানা ওবায়দুল হক সকলকে নিয়েই ঐক্যের পক্ষে ছিলেন। তিনি বলতেন, কোনো কোনো দলকে ঐক্য থেকে বাইরে রাখলে ঐক্য হতে পারে না।

ইসলামের উপর সকল ইসলামবিরোধী দেশি ও বিদেশি শক্তির সম্মিলিত হামলা সত্ত্বেও ইসলামী দলগুলো আত্মরক্ষার প্রয়োজনেও ঐক্যবদ্ধ হতে অক্ষম হওয়া চরম দুর্ভাগ্যজনক। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাওফীক দান করুন।

সমাপ্ত

কামিয়াব প্রকাশন। ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।